যক্তিবাদীর

চ্যালেঞ্জাররা

প্রথম খন্ড



প্রবীর ঘোষ

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

যুক্তিবাদীদের শুরুর চ্যালেঞ্জাররা ছিল অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার ও জ্যোতিষী নামের বুজরুকরা। সময় এগিয়েছে। যুক্তিবাদীরা সোচ্চার হয়েছে সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক জগতের বুজরুকদের বিরুদ্ধে। যুক্তিবাদীদের লক্ষ্য — শোষণহীন দুর্নীতিহীন এক সুন্দর সাম্যের সমাজ গড়ে তোলা। এই লক্ষ্য প্রকাশিত হতেই যুক্তিবাদীরা দেখল তাদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জার হিসেবে ময়দানে হাজির শোষক-শাসক-প্রচারমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীদের এক ফ্রন্ট।

এই খণ্ডে হাজির করা হয়েছে আন্দোলনের প্রথম যুগের চ্যালেঞ্জারদের। এরা প্রত্যেকেই অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার। যে-সব ঘটনা এখানে হাজির করেছি, তার কোনওটিই প্রবীরের লেখা কোনও বইতে নেই।

শেষ অংশের ঠিক আগে একটি আলোচনা আছে 'বিশ্বাসের ব্যবসায়ীরা ও নপুংসক আইন'। আলোচনাটিতে বে-আব্রু করে দেখান হয়েছে অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার বুজরুকদের সঙ্গে রাজনীতিক-রাজনৈতিক দল-পুলিশ-প্রশাসনের কাঁঠালের আঠার সম্পর্ককে।

শেষ অধ্যায়ে আছে 'The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954'। অলৌকিক উপায়ে বা পাথর পরিয়ে কিছু পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি যারা দেয় এবং যারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে আইনে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এ-বিষয়ে জন-চেতনা বৃদ্ধির প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই এই অধ্যায়টির সংযোজন।

যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা

প্রবীর ঘোষ

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

YUKTIBADIR CHALLENGERRAA
(The Challengers of Rationalists) by Prabir Ghosh
Published by Subhas Chandra Dey, Dey's Publishing,
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073
Rs. 60.00

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৮, মাঘ ১৪০৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, আশ্বিন ১৪০৬

প্রচ্ছদ : পিনাকী ঘোষ

দাম : ৬০ টাকা

ISBN-81-7612-253-X

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-গ্রন্থন : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মেঘলা দিনে মেঘ ওড়াবার লড়াইতে শামিল
প্রতিটি যুক্তিমনস্ক মানুষকে

সূচিপত্র

কিছু কথা/৯

মার্কিন গডম্যান মরিস সেরুলো : একটি ইতিহাস/১৫

যোগী জ্যোতিষী হরেকৃষ্ণবাবা/৩১

পঁয়ত্রিশ বছর আগের বালক ব্রহ্মচারী এবং...../৩৬

মেঠাইবাবার রহস্যভেদ/৪৩

হাড়ভাঙার দৈব চিকিৎসা/৫৭

কাকদ্বীপের দৈব পুকুর/৬২

আগরপাড়ায় ভুতুড়ে আগুন/৭০

প্রদীপ আগরওয়ালের সম্মোহনে 'পূর্বজন্ম' যাত্রা/৭৫

কামধেনু নিয়ে ধর্মব্যবসা/৮২

বরানগরের হানাবাড়ি : গ্রেপ্তার মানুষ ভূত/ ৮৪

এফিডেভিট করে ডাক্তারের প্রশংসাপত্র নিয়ে ওঝাগিরি/৯১

গ্যারান্টি চিকিৎসার নামে হত্যাকারীর ভূমিকায় সর্পবিদ হীরেন রায়/৯৪

চলো যাই ফকিরবাড়ি/ ৯৯

সাঁইবাবার চ্যালেঞ্জ : পেটে হবে মোহর/১০৬

হুজুর সাইদাবাদী : মন্তরে সন্তান লাভ / ১১৯

জলাতঙ্ক ও দৈব চিকিৎসা/১৩৩

বিশ্বাসের ব্যবসায়ীরা ও নপুংসক আইন/১৩৯

The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954/১৭০

কিছু কথা

আমি লেখক বলছি

অবশেষে 'যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা' প্রকাশিত হল। পাঠক-পাঠিকাদের প্রবল উৎসাহ ও প্রচুর তাগাদা সত্ত্বেও গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশে দীর্ঘ সময় টাল-বাহানা করে কাটাবার জন্য নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইছি। আমার পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থে মুদ্রিত প্রতিশ্রুতি ছিল এই গ্রন্থটি প্রকাশের। প্রথম প্রতিশ্রুতি-- এক যুগ আগে ছাপার অক্ষর দেখেছে। শুরুর চ্যালেঞ্জাররা ছিল অলৌকিক ক্ষমতার দাবীদার ও জ্যোতিষী নামের বুজরুকরা। তারপর সময় যতই এগিয়েছে ততই হরেক রকম বুজরুকদের দেখা মিলেছে পথের বাঁকে বাঁকে।

প্রকাশিত হল যুক্তিবাদী সমিতির 'ম্যানিফেস্টো' 'সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ'। 'দেশপ্রেম' থেকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' জলে ভেজানো শব্দগুলো নতুন রোদে তাজা হল, স্পষ্ট হল। সেই সঙ্গে জড়তার মেঘ কাটিয়ে স্পষ্ট হল যুক্তিবাদী সমিতির লক্ষ্য-- আমরা নিছক বাবাজী-মাতাজীদের বুজরুকি ধরার উত্তেজনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে রাজি নই। আমরা চাই, আমজনতা বুঝুক-- তাদের বঞ্চনার কারণ আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র অথবা ঈশ্বরের বিধান নয়। ঈশ্বর, নিয়তি, পূর্বজন্মের মত অলীক ধারণাগুলো বঞ্চিতদের ক্ষোভকে নিরস্ত্র করার এক সুন্দর নিরামিষ ও কার্যকর অস্ত্র। বঞ্চনার প্রতিটি কারণ লুকিয়ে রয়েছে এই অসাম্যের সমাজব্যবস্থার মধ্যেই। লুকোনোর প্রয়োজনেই তৈরি হয়েছে এইসব অলীক চিন্তার ভাইরাস।

আমরা চেয়েছি শোষণহীন, দুর্নীতিহীন একটা সুন্দর সমাজ গড়ার আবশ্যিক ও প্রাথমিক শর্ত হিসেবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ও গতিশীল রাখতে। আমরা চেয়েছি অসাম্যের সমাজ কাঠামোর ভিত্তিমূলগুলোকে আমজনতার সামনে বে-আব্রু করতে। অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে ঠিক মত চিনলে তবেই সম্ভব এই কাঠামোকে আঘাত করা।

আমাদের শেষ লক্ষ্য গোটা পৃথিবীকে একটাই খামার করা। সাম্যের এক সুন্দর খামার, যেখানে জাত-ধর্ম-লিঙ্গের কোনও বৈষম্য নেই। 'দুর্নীতি' নামক শব্দটির অর্থ বুঝতে অভিধান খুলে বসতে হবে।

লক্ষ্য প্রকাশিত হতে অনিবার্যভাবেই আমাদের লড়াইয়ের ক্ষেত্র বিস্তৃত হল। আমরা সোচ্চার হলাম সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক জগতের বুজরুকি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে। এই সরবতা, এই লড়াই, আন্তরিক ও সঠিক পথে চললে যা হবার তাই হল। যুক্তিবাদীরা দেখল তাদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জার হিসেবে ময়দানে হাজির শোষক-শাসক-পুলিশ-প্রশাসন-প্রচারমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীদের এক ফ্রন্ট।

মুক্ত-বাণিজ্যের হাওয়ায় এদেশে 'বিপ্লব' থেকে 'বেশ্যাবৃত্তি' সবই এখন পণ্য। আন্দোলনকে পণ্য করে যশ, অর্থ, সরকারি দাক্ষিণ্য, প্রচারের আলো, সল্টলেকে জমি, সাংস্কৃতিক বিনিময়ে বিদেশ ভ্রমণ, পুরস্কার ইত্যাদি ছড়ানো সুযোগগুলো খুঁটে খুঁটে তুলে নেওয়াটাই চলতি হাওয়া। দীক্ষিত যুক্তিবাদীরা আন্দোলন করেন আদর্শকে সামনে রেখে, এটা পেতে নয়, ওটা এড়াতে নয়। আন্দোলন তাদের কাছে দাঁড়িপাল্লায় চাপাবার সামগ্রী নয়, বেঁচে থাকার শ্বাস-প্রশ্বাস।

আটের দশকের মাঝামাঝি প্রবল শোরগোল তুলে শহর কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত জুড়ে যুক্তিবাদীদের বিশাল উত্থান আপনারা প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা দেখেছেন। আমাদের একের পর এক জয়ের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে পত্রিকাগুলো। এই সময় কিছু কিছু সংবাদপত্র নিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে একটা মোহ, একটা বিভ্রান্তি তৈরির অবকাশ আছে বুঝে আমার লেখায় বার-বার একটি কথা ঘুরে ফিরে এসেছে-- আমাদের ততদিন পর্যন্তই প্রচার-মাধ্যমগুলো প্রচারের আলোয় আনবে, যতদিন পর্যন্ত না আমাদের কাজ-কর্ম বর্তমান সমাজের স্থিতাবস্থার পক্ষে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। একথা ভুললে চলবে না, মিডিয়ার মালিকরা আর যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ী, কোটি কোটি টাকা পুঁজি বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ী। এই স্থিতিশীল অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থাই ওদের কাছে

পরম কাম্য।

আমরা এই সমাজ কাঠামো ভাঙবো, আর ওরা আমাদের ওপর প্রচারের আলো ফেলে নিজেদের চিতা সাজাবে-- একি হয়? হয় না।

গত একটা যুগে যুক্তিবাদী সমিতি শিশু-বৃক্ষ থেকে মহা-বৃক্ষ হয়েছে সাপলুডোর অনেক ভাঙচুর পেরিয়ে। কাজের ব্যপ্তি যত বেড়েছে, শিরা-ধমনী ফাটিয়ে যত কঠিন-জয় আমরা ছিনিয়ে এনেছি, ততই হারাতে শুরু করেছি মিডিয়ার জমি। এটাই মূল স্রোত। ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই।

মুষ্ঠিবদ্ধ হাত একটু একটু করে নিচে নামতে নামতে ভিক্ষে দেওয়া মানুষগুলোর পায়ে কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে দেশের মানুষদের ভিখারী বানাবার কুড়ি হাজার নথিভুক্ত সেবা-বিক্রির ব্যবসায়ীদের ভিড় জমে উঠল। আমরা আতঙ্কিত হলাম। বঞ্চিত-শোষিত মানুষগুলো ভিখারী হয়ে গেলে সাম্যের যে ছবিটা আমরা ঝুলিয়ে রেখেছি বুকের গভীরে, তা জলের রেখার মতই মুছে যাবে। ভিখারী দিয়ে কোনও দিনই বিপ্লব হয়নি, হবে না। আমরা মুখর হলাম অর্থ সাহায্যপুষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (যাদের চলতি নাম 'এন জি ও') বিরুদ্ধে। এন জি ও-দের অর্থ সাহায্যকারী ট্রাস্ট ভ্যাটিকান মিশনারিজ, রোমান ক্যাথলিক মিশনারিজ, ফোর্ড, রকফেলার, কার্নেগি, হাভার্ড ইত্যাদি ঔপনিবেশিক শক্তির পৃষ্ঠপোষকরা এমনি এমনি টাকা দেয় না। টাকা দেয় মানুষকে পরনির্ভর করতে, ভিখারী করতে। কারণ ওরা জানে ভিখারীরা কোনও দিনই বিপ্লবী হয় না।

যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে এন জি ও দর্শনের বিরোধিতা উত্তরোত্তর তীব্রতর হতে আমরা নতুন চ্যালেঞ্জার হিসেবে পেলাম স্বেচ্ছাসেবী ব্যবসায়ী ও তাদের নিয়োগ কর্তা ট্রাস্টগুলোকে। অর্থাৎ মোদ্দা কথায় এই প্রথম সরাসরি চ্যালেঞ্জার হিসেবে পেলাম ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে। আমাদের আন্দোলনের কিছু সহযোদ্ধাকে ওরা এন জি ও-র মালিক করে দিল, এন জি ও-তে চাকরি করে দিল। চ্যালেঞ্জার হিসেবে আমরা পেলাম কিছু নব্য-মিরজাফর। নীতির মুখোশ টেনে, সেবার মহান বাণী আউড়ে ওরা শেষ পর্যন্ত যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে গোটা যুক্তিবাদী সমিতিকেই সেবা-বিক্রির ব্যবসায়ী করতে চাইল।

আমরা আঘাত করলে চ্যালেঞ্জাররা সর্বশক্তি দিয়ে পাল্টা আঘাত হানবে-- এটাই প্রত্যাশিত। যুক্তিবাদী আন্দোলন, সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে মনন তৈরির

আন্দোলন আন্তরিক ও সঠিক হলে চ্যালেঞ্জাররা সর্বশক্তি দিয়ে আন্দোলনকে ভাঙতে চাইবেই– জানি। জানি রাষ্ট্রশক্তি ও ওদের সহায়ক শক্তির ব্যাপকতা। তবু গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বিশ্বাস করি-- এই পৃথিবীকে মানুষ একদিন সকলের বাসযোগ্য সুন্দর একটি খামারে পরিণত করবেই। কারণ-- শেষ কথা বলেন জনগণ।

রাষ্ট্রশক্তি বলছি

সমাজে চিরকালই কিছু পাগল থাকে যারা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ায়। এক যুগ আগে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ছেলে-মেয়েদের তেমনই কিছু নিরীহ আবেগপ্রবণ মানুষ বলে ভুল করেছিলাম।

'রাষ্ট্রশক্তি'– বিমূর্ত কিছু নয়। কংগ্রেস যায়, বিজেপি আসে। বিজেপি যায় ফ্রন্ট আসে। সরকার যায় সরকার আসে। আমি 'রাষ্ট্রশক্তি' ছিলাম-আছি-থাকব। 'রাষ্ট্রশক্তি' মানে পুঁজিপতি-সরকার-রাজনৈতিক দল-পুলিশ-প্রশাসন-প্রচার মাধ্যম-বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত সুসংবদ্ধ এক শক্তি। এখানে 'ব্যক্তি' অকিঞ্চিৎকর। এই শক্তি বিশ্বাস করে প্রকৃতির আইনে। শক্তিমানেরা অক্ষমকে গ্রাস করবে। প্রকৃতির এই আইনকে মেনেই আমাদের সমাজ-কাঠামো।

মাঝে-মধ্যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো কিছু মানুষ স্বপ্ন-টপ্ন দেখে স্থিতিশীল এই প্রকৃতির নিয়মে গড়া সমাজকে ভেঙে সাম্যের সমাজ গড়বে। পাগল? ওরা আমার ক্ষমতাকে কমিয়ে দেখে জনগণের ক্ষমতার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে। কোন্ জনগণের উপর নির্ভর করে? না, যাদের আমরা অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তি জাত-পাতের ভিত্তিতে, ভাষার ভিত্তিতে, বর্ণের ভিত্তিতে, লিঙ্গের ভিত্তিতে, প্রাদেশিকতা ও দেশের ভৌগোলিক সীমানার ভিত্তিতে ছোট্ট-ছোট্ট দুর্গম দ্বীপে বিভক্ত করে রেখেছি?

আমরা জনগণের একাংশকে আটকে রেখেছি অধ্যাত্মবাদের প্রোডাক্ট আত্মা-পরমাত্মা-পরলোক-পাপ-পুণ্য-কর্মফল-নিয়তি-ভাগ্য ইত্যাদি অলীক চিন্তা দিয়ে। জনগণের বড় অংশই এ-সবে এখনও বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে, তাদের বঞ্চনার কারণ পূর্বজন্মের কর্মফল-ভাগ্য ইত্যাদি। বিশ্বাস করে এ-জন্মে দারিদ্র্যকে 'সুন্দর' হিসেবে গ্রহণ করলে পরজন্মে তার পুরস্কার মিলবে। ফলে শোষণের কারণ হিসেবে শোষক ও তার সহায়ক শক্তি থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

জনগণের বাকি অংশকে প্রকৃতির অসাম্যের নিয়মটা বুঝিয়ে দিয়ে বলি– নিজের আখের গুছিয়ে নাও। এই অংশকে ক্যারিয়ারিস্ট করে দিলে এরা হয়ে ওঠে এই স্থিতিশীল সমাজের সহায়ক শক্তি।

সুতরাং জনগণ জনগণের স্বার্থ নিয়ে ভাববে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামবে, তার সুযোগ কোথায়? বাঘের খাঁচার রিং মাস্টার আমরা। বাঘেরা সংখ্যায় বেশি হলেও একসঙ্গে আক্রমণ চালাবে না জানে বলেই রিং মাস্টার প্রতিটি শো-তে নিশ্চিন্তে নামে। যারা জন-জাগরণের স্বপ্ন দেখে, জনগণের উপর ভরসা রাখে, তারা নেহাতই পাগল!

যুক্তিবাদীদের আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির যে খবরা-খবর আমরা সংগ্রহ করেছি, তাতে অবশ্য যুক্তিবাদী সমিতির ছেলে-মেয়েদের ঠিক পাগল বলে উড়িয়ে দিতে পারছি না। বরং ওরা আমাদের এই স্থিতিশীল সমাজের পক্ষে বিশাল এক চ্যালেঞ্জ। যে কোনও মিথ্যাচারিতা, দুর্নীতি, ডাকাতি-প্রতারণা-ধর্ষনের সাজানো মামলা, বিশ্বাস-ঘাতকতা দিয়ে এই আন্দোলনের চালিকাশক্তি যুক্তিবাদী সমিতিকে ভাঙতেই হবে। নয় তো প্রকৃতির নিয়মে আমরাই না শেষ হয়ে যাই।

পুনশ্চ : আমি লেখক বলছি

'যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটিতে হাজির করেছি আন্দোলনের প্রথম যুগের চ্যালেঞ্জারদের। এরা প্রত্যেকেই আলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার। যে-সব ঘটনা এখানে হাজির করেছি, তার কোনওটিই আমার আগের লেখা কোনও বইতে নেই। এখনও পর্যন্ত যেহেতু কয়েক শো চ্যালেঞ্জারের মুখোমুখি হয়েছি, তাই এই গ্রন্থটি কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশের ইচ্ছে রয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই আকর্ষণীয় কিছু ঘটনা অবশ্যই আনবো। এটা বোধহয় বলার অবকাশ রাখে না– প্রতিটি চ্যালেঞ্জেই চ্যালেঞ্জাররা পরাজিত হয়েছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি আজও প্রতিজ্ঞায় অটল-- যেদিন কোনও চ্যালেঞ্জার তার অলৌকিক ক্ষমতা বা জ্যোতিষ ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, সেদিন থেকে যুক্তিবাদী সমিতি অলৌকিকতা ও জ্যোতিষ-এর বিরুদ্ধে সমস্ত রকম প্রচার থেকে বিরত থাকতে। প্রণামীর দেড় লাখ অবশ্যই তুলে দেবে জয়ীর হাতে।

এই গ্রন্থটির প্রায় শেষ লগ্নে একটি আলোচনা আছে, 'বিশ্বাসের ব্যবসায়ীরা ও নপুংসক আইন'। আলোচনাটিতে স্পষ্ট করে দেখিয়েছি-- অলৌকিক ক্ষমতার দাবীদার-বুজরুকদের সঙ্গে রাজনীতিক-রাজনৈতিকদল-পুলিশ-প্রশাসনের কাঁঠালের

আঠার সম্পর্ককে।

শেষ অধ্যায়ে এনেছি 'The Drugs and Megic Remedies (objectionable Advertisement) Act 1954'। অলৌকিক উপায়ে বা পাথর পরিয়ে যারা অনেক কিছু করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাদের বিরুদ্ধে এবং যারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের আইনে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এ বিষয়ে জনচেতনা বৃদ্ধির প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই অধ্যায়টির সংযোজন।

সূর্য-ঢাকা আকাশের মেঘ এ-কথাই বুঝিয়ে দেয়-- আমরা ঠিক রাস্তায় আছি। 'ধর্ম-সেবা-সম্মোহন'-এর 'কিছু কথা'র শেষ চারটে লাইন এখানেও টেনে আনছি:

এইসব নোংরা মেঘ ওড়াতে কামান লাগে না
লাগে যুক্তি-বুদ্ধির এক কণা সাহসী আগুন।
ওরা পুড়তে পুড়তে ছাই হবে,
আমরা দেখতে দেখতে আকাশে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে চেঁচাবো হু...র...রে....

আন্দোলনের সঙ্গী হতে উদাত্ত আহ্বান, প্রিয় পাঠক-পাঠিকা।

প্রবীর ঘোষ
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড
কলকাতা- ৭০০ ০৭৪

আট জানুয়ারি
(মিরজাফর-বিজয় দিবস)
উনিশ শো আটানব্বই

মার্কিন গডম্যান মরিস সেরুলো : একটি ইতিহাস

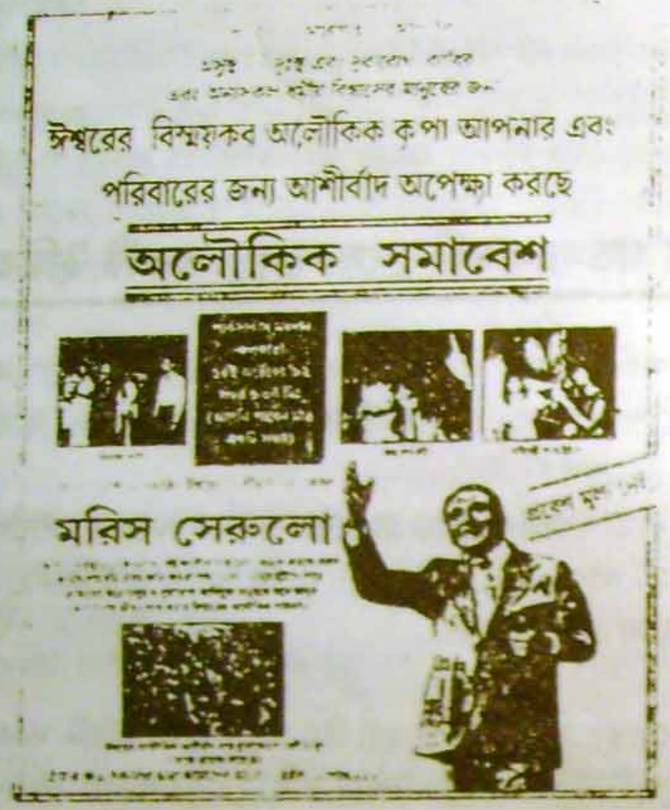
'পোপের পর সবচেয়ে জনপ্রিয়, প্রভাবশালী খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতা মরিস সেরুলো সব দেশ জয় করে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় এসে ডুবল! ভাবা যায় না! এটাই বোধহয় মিরাকল!'

কথাগুলো রবার্ট ঈগলের। রবার্ট ইংলন্ডের চ্যানেল ফোরের জনপ্রিয় ডিরেক্টর-প্রডিউসার। রবার্ট আরও বলেছিলেন, 'এটা যে কি বিশাল কাজ করেছ, তা তোমরা ভাবতেই পারছ না।''

হয়তো বিশালত্বর পরিমাপটা আমরা ঠিক মত করতে পারিনি, কারণ পরিমাপ করতে বসিনি। দুটি নীতিতে আমি বিশ্বাস করি। (এক) শত্রুকে কোনও কারণেই ছোট ভাববে না। ছোট ভাবলে নিজের কাজে ছোট-খাট ফাঁক-ফোকর থেকে যায়। (দুই) যুদ্ধে নেমে শত্রুকে কোনও কারণেই নিজের চেয়ে বড় ভাববে না। এমন কি নিজের সমকক্ষও ভাববে না।

'৯২-এর ১৩, ১৪ ও ১৫ অক্টোবরের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী দৈনিক পত্রিকায় আমরা মরিস সেরুলোর দেওয়া বিজ্ঞাপন দেখেছি। ১৩ তারিখ বিজ্ঞাপন ছিল সিকি পাতা জুড়ে, ১৪ তারিখ আধ পাতা এবং ১৫ তারিখ পুরো পাতা জুড়ে।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন প্রকাশেরও দিন দশেক আগেই কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় এমন কি মহাকরণে মন্ত্রীদের যাতায়াতের সদর ফটকের ডান দিকের দেওয়ালে রঙিন পোস্টার পড়েছিল মরিস সেরুলোর অলৌকিক সমাবেশের। সমাবেশের দিন তিনেক আগে কলকাতা ও শহরতলি জুড়ে পোস্টার পড়েছে, বিলি হয়েছে লিফলেট। বক্তব্য এক — সেরুলোর অলৌকিক সমাবেশ, পার্কসার্কাস ময়দান, ১৫ অক্টোবর '৯২, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে। অলৌকিক আরোগ্য সমাবেশে ইতিপূর্বে বধির শোনার শক্তি ফিরে পেয়েছে, অন্ধ ফিরে পেয়েছে দৃষ্টি, প্রতিবন্ধী সুস্থ হয়েছে — বিজ্ঞাপনে এই দাবির সমর্থনে তিনটি ছবিও ব্যবহৃত হয়েছে।



দৈনিক বাংলা পত্রিকায় দেওয়া অলৌকিক সমাবেশ-এর বিজ্ঞাপন।

এ-ভাবে ভয়ংকর বিজ্ঞাপন দিয়ে হেঁকে-ডেকে প্রতারণা কলকাতার ইতিহাসে প্রথম। আমাদের দেশে একটি আইন আছে — 'ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশনাবেল অ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪'। সেই অনুসারে এই ধরনের অলৌকিক উপায়ে রোগ আরোগ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া ও প্রকাশ করা স্পষ্টতই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ-ছাড়াও এই অদ্ভুতুড়ে দাবির মধ্যে রয়েছে একটি বড়-সড় পরিকল্পিত প্রতারণার গন্ধ। কোনও বিদেশী নাগরিক কোন জনসভা বা ধর্মীয় সভা করতে গেলেও লাগে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও সিকিউরিটি কন্ট্রোলের রিপোর্ট। এই দুই রিপোর্ট পাবার পরই পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সভার অনুমতি দিতে পারে। কলকাতার পুলিশ সূত্রে খবর পেলাম, কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের স্ত্রী ও এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর প্রভাবশালী পুত্র মরিস সেরুলোর এই অলৌকিক সমাবেশে 'আগ্রহী' হওয়ায় স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও সিকিউরিটি কন্ট্রোলের রিপোর্ট ছাড়াই কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ট্রাফিক তড়িঘড়ি এই

অলৌকিক সমাবেশের অনুমতি দিয়েছেন। মরিস সেরুলোর এই অলৌকিক সমাবেশের আবেদন অফিসিয়ালি জানিয়েছিলেন স্যামুয়েল রাজ। স্যামুয়েল রাজ হলেন অ্যাসেমব্লি অফ গড চার্চের প্রিন্সিপাল, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রল চার্চের অন্যতম পুরোহিত এবং ইস্ট ইন্ডিয়া স্কুল অফ মিনিস্ট্রি ইন ইভানজেলিসম-এর চেয়ারম্যান। ১৩ অক্টোবর স্যামুয়েল রাজের গুরুসদয় দত্ত রোডের কুসুম অ্যাপার্টমেন্টের ফ্ল্যাটে ফোন করেছি। দ্বিধাহীন ভাষায় জানালেন, 'মরিস সেরুলোর প্রার্থনায় সত্যিই বোবা কথা বলে, অন্ধ দেখে। এর মধ্যে কোনও অতিরঞ্জন নেই।' জানালেন, মরিস সেরুলো 'ঈশ্বরের শেষ অবতার', 'স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিলেন'। মরিস সেরুলো ওয়ার্ল্ড ইভানজেলিসমের চেয়ারম্যান। সেরুলোর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই বলে সেরুলোকে কোথায় পাব জানতে চাওয়ায় জানালেন, তিনি কোথায় উঠেছেন কোনও সাংবাদিককেই আমরা জানাচ্ছি না।



ইংরেজি দৈনিকে দেওয়া সেরুলোর বিজ্ঞাপন।

একটি বিশেষ সূত্রে খবর পেলাম মরিস সেরুলো তাজ বেঙ্গল হোটেলে উঠেছেন। ১৪ অক্টোবর ফোনে কথা হল। মুখোমুখি সাক্ষাতে রাজি হলেন না। জানালেন, 'ঈশ্বর দর্শন পনেরো বছর বয়সে স্বর্গে। ঈশ্বরই স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে সরাসরি অনেক কিছু শিখলাম। ঈশ্বর চাইলেন আমার মধ্য

দিয়ে আর্তের সেবা করতে, জনগণকে ঈশ্বর বিশ্বাসী করতে। সেদিন থেকে আমি ঈশ্বরের দূত। পেলাম অলৌকিক ক্ষমতা।'

'কেউ কেউ বলছেন, গোটা ব্যাপারটাই ভাঁওতাবাজি।' সেরুলোকে একটু খুঁচিয়ে দিতে কথাটা বললাম।

'কেউ কেউ মানে তো র‍্যাশানালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রবীর ঘোষ। জানি ও আমার 'মিরাকেল ক্রসেইড'-এ আসবে। কিন্তু কিছু বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। ও আর যাই হোক ঈশ্বরের ইচ্ছের চেয়ে বড় নয়।'

১৪ অক্টোবর পার্কসার্কাস ময়দানে স্টেজের ও আশে-পাশের একটা পরিষ্কার চিত্র পেলাম একাধিক সূত্র থেকে। সন্ধ্যায় যুক্তিবাদী সমিতির জনা পঞ্চাশ ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বসলাম। কি আমার পরিকল্পনা, স্পষ্ট করে বোঝালাম। জানালাম প্রত্যেকে যেন সারা-মাঠের দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। মরিস সেরুলো তাঁর বিজ্ঞাপনে জানিয়েছেন মাদ্রাজে লোক হয়েছিল দু-লক্ষ। ওখানে রোগমুক্তি ঘটাবার জন্য এই ধরনের প্রার্থনা সভার একটা রেওয়াজ তৈরি হয়েছে। আমাদের এখানে অত না হলেও তিরিশ থেকে ষাট হাজার লোক হবে বলে জানালাম। ব্ল্যাক বোর্ডে স্টেজের অবস্থান বুঝিয়ে কে কোথায় থাকবে তার একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে নিলাম। প্রায় সকলেই জনতার ভিড়ে মিশে আশে-পাশের মানুষদের কাছ থেকে জেনে নেবে নাম, ঠিকানা, কি অসুখ-ইত্যাদি। জানালাম, খবর পেয়েছি সভায় ইস্ট ইন্ডিয়া স্কুল অফ ইন ইভানজেলিসমের দু-হাজার ট্রেনড্ লাঠিধারী স্বেচ্ছাসেবক মাঠে থাকবে। তাদের জানানো হয়েছে, আমরা যুক্তিবাদীরা গণ্ডগোল করতে পারি। ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা থাকবে। এমন হতে পারে, আমরা কেউ কোনও ভাবেই যাতে মঞ্চে উঠে মাইক্রোফোনের দখল না নিতে পারি, তার জন্য স্টেজ ঘিরে ঢালধারী পুলিশবাহিনী মোতায়েন থাকবে। খবর আছে পার্কসার্কাসের কিছু বিখ্যাত সমাজ-বিরোধীদের ভাড়া করা হয়েছে এই দিনটির জন্য। সেরুলো তাঁর প্রার্থনা শেষে আহ্বান জানাবেন — যারা রোগ মুক্ত হয়েছ তারা স্টেজে উঠে এসো। মরিসের স্বেচ্ছাসেবকরা তখন উঠতে চাওয়া মানুষদের মধ্য থেকে বাছাই করে লোক তুলতে থাকবে।

মরিস সেরুলোর বুজরুকি ফাঁস করতে আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। কেউ কোনও প্ররোচনায় পা দেবে না। কোনও বিজ্ঞান সংগঠন যদি কিছু পোস্টার-টোস্টার নিয়ে স্টেজের দিকে এগুতে থাকে, তাদের সহযোগিতা করা

উচিত ভেবে, নিজের ডিউটি ভুলে এগুবে না। আমাদের উদ্দেশ্য খান-কয়েক পোস্টার তুলে ধরা নয়। আমরা চাইছি কাল মরিস সেরুলোর বুজরুকি ফাঁস করে একটা ইতিহাস তৈরি করতে। আর সবচেয়ে জরুরী কথাটা হলো, আমি স্টেজে উঠবই। আমাকে স্টেজে উঠতে দেখলেই তোমরা তৈরি হবে। আমি মাউথপিস দখলের চেষ্টা করব। করতে পারি বা না পারি, স্টেজের সামনের সাংবাদিকদের অন্তত বোঝাতে পারবই স্টেজে তোলা হয়েছে সাজানো রোগীদের। এই সময় তোমরা আকাশের দিকে ছুড়ে দেবে পাঁজা-পাঁজা লিফলেট। মরিসের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে প্রত্যেকে দৌড়তে থাকবে স্টেজের দিকে। স্টেজ দখল নিতেই হবে। খুব দ্রুততার সঙ্গে ঘটনাটা ঘটাতে হবে। একই সঙ্গে স্টেজে গোলমাল, সাংবাদিকদের ক্ষোভ, আকাশ জুড়ে লিফলেট ওড়া ও দৌড়ে আসা মানুষ দেখে পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকরা ঘাবড়াতে বাধ্য। আর মাইকে একবার বলার সুযোগ পেলে গণহিস্টিরিয়ার এক দারুণ নিদর্শন কালই দেখতে পাবে। শেষ কথাটি হল— আমাদের এই পরিকল্পনার একটি কথাও তোমার প্রিয় বন্ধু, মা-বোন, বউ — কাউকেই বলবে না। তোমাদের গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা ও নিষ্ঠাই কাল এক ইতিহাস তৈরি করতে পারে।

১৪ তারিখ সারা দিন রাতই ফোন এসেছে বিভিন্ন পত্রিকা দপ্তর থেকে। জানতে চেয়েছেন, মরিসের অলৌকিক সমাবেশে যাচ্ছি কি না। প্রত্যেককেই জানিয়েছি, যাচ্ছি। বিশেষ কোনও পরিকল্পনা ছকেছেন? উত্তরে জানিয়েছি, না না। যাচ্ছি, এটুকু বলতে পারি। তারপর দেখি।

ফোন পেয়েছি কলকাতা পুলিশের এক ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে। জানতে চেয়েছেন আমরা যাচ্ছি কি না। যাচ্ছি জেনে শুভার্থী হিসেবে অনুরোধ করেছেন যেন না যাই। ফোন পেয়েছি রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছ থেকে। একই প্রশ্ন। একই অনুরোধ।

১৫ অক্টোবর সকাল থেকেই অনেক ফোন পেয়েছি আমাদের বিভিন্ন শাখা থেকে। তাদের প্রত্যেককে দুপুরের মধ্যে আমার ফ্ল্যাটে আসতে বলেছি। হালিশহর শাখাকে বলেছি 'গো ব্যাক মরিস সেরুলো' ইত্যাদি কয়েকটা পোস্টার করে আনতে। হালিশহর শাখাদের বোঝালাম, তারা থাকবে স্টেজের বাঁয়ে রাস্তার কাছে। কোনও বিজ্ঞান সংগঠন বিক্ষোভ জানাতে চাইলে স্টেজের বাঁয়ের রাস্তার দিক দিয়ে মঞ্চের দিকে এগুতে চাইবে। সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে এটাই ওরা

করবে। তেমনটা ঘটলে তোমরা চার-পাঁচজন ওদের সঙ্গে মিশে হাতের পোস্টার তুলে বিক্ষেভে শামিল হবে। পুলিশ বাধা দেবেই। পড়ে পড়ে লাঠি খেতে হবে না। পুলিশ তাড়া করলে পালাবে।

প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে বেশ কয়েকটা ফোন এসেছে। ফোন এসেছে পুলিশ দপ্তর থেকে — সেই একই অনুরোধ। ফোন এসেছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে।

আজ এমন পরিস্থিতি ঘটতে পারে 'আজকাল' পত্রিকার হয়ে লেখার মত সময় ও সুযোগই মিলবে না। সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তকে বিষয়টা জানালাম। তখনই জানলাম আজকাল-এর চারজন সাংবাদিক ও তিনজন চিত্র-সাংবাদিক যাচ্ছেন। জানালেন তিনি নিজেও যাবেন ভাবছেন। ভিডিও ক্যামেরা থাকবে।

ইতিমধ্যে বিশেষ সূত্র থেকে খবর পেলাম পেশাদার খুনী লাগানো হয়েছে আমার পিছনে। দুপুরের আগেই আমার পাড়ায় সশস্ত্র রাজ্য পুলিশ বাহিনী টহল দেওয়া শুরু করলেন। আমার ফ্ল্যাট আক্রান্ত হতে পারে শঙ্কা থেকেই বোধহয় এই মোতায়েন।

পাঁচটা তিরিশ নাগাদ পার্কসার্কাস ময়দানে পৌঁছলাম। ইতিমধ্যেই কুড়ি-পঁচিশ হাজার মানুষ জমায়েত হয়েছেন। এদের মধ্যে বহু মানুষ অসুস্থ, বিকলাঙ্গ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। দ্রুত মাঠে একটা চক্কর দিলাম। যুক্তিবাদী সমিতির ছেলে-মেয়েরা লোকেদের সঙ্গে কথা বলে নোট নিচ্ছে। মরিসের বেশ কয়েকজন ব্যাজধারী স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে কথা হলো। এদের অনেকেই এসেছেন বিভিন্ন প্রদেশ থেকে। না, সমিতির কারও সঙ্গেই আমার কথা হয়নি। আমার সামনেই মেটাডোর ভ্যান, টেম্পো, অ্যাম্বুল্যান্স থেকে রোগী নামানো হয়েছে। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। নোটবুকে নোট নিয়েছি। আমার ছায়াসঙ্গী শুধু একজন— সুব্রত। ওর কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ। ঝলমলে স্টেজে জোরাল বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে কোট-টাই পরা একগাদা দেশি সাহেব কোরাসে গাইছেন যিশু বন্দনা — বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে।

ছ'টা দশ। সাংবাদিকদের জন্য সংরক্ষিত স্টেজের সামনেই ঘেরা জায়গায় ঢুকলাম। আমি ঢুকতেই একজন পুলিশ অফিসার আমার গায়ে সেঁটে গেলেন। মঞ্চ ঘিরে বিশাল পুলিশ বাহিনী, বেতের ঢাল নিয়ে তৈরি। রয়েছে কাঁদুনে গ্যাস নিয়ে তৈরি পুলিশ। মঞ্চের কাছেই কলকাতা পুলিশের দু-জন ডেপুটি কমিশনার, চয়ন মুখার্জি ও কে. আর সেনগুপ্ত। সাংবাদিকদের কেউ কেউ জানতে চাইলেন — কখন অ্যাকশনে নামছি। জানালাম, 'তেমন সুনির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা বা

হোমওয়ার্ক করে আসিনি। আগে ব্যাপারটা দেখি, তারপর সেটা বোঝার চেষ্টা করি, তারপর তো — কিন্তু আপনারা কি একটা জিনিস লক্ষ্য করছেন, পুলিশের ইউনিফর্ম পরেই কিছু পুলিশ সেরুলোর লিফলেট বিলোচ্ছে। পুলিশের অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার আর মুখার্জি স্টেজে দৌড়-ঝাঁপ করে একজন সংগঠকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন। একজন আই. পি. এস.-এর স্ত্রী অন্যতম ব্যবস্থাপক হিসেবে মঞ্চ আলো করে বসে আচ্ছেন! অলৌকিক চিকিৎসা বে-আইনি হওয়া সত্ত্বেও সেরুলোর অলৌকিক চিকিৎসার এই সমাবেশকে প্রোটেকশন দিতে হাজির দুজন ডেপুটি কমিশনার, দু-জন অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার ও পাকসার্কাস ও তার আশে-পাশের তিনটি থানার ও. সি আর বিশাল পুলিশ বাহিনী! সত্যি বিচিত্র!'

ঠিক সাড়ে ছ'টায় মরিস সেরুলো মঞ্চে এলেন। প্রবল হাততালি। পরনে কালো কোট প্যান্ট, লাল টাই। বুক পকেটে লাল রুমাল। হাতে বাইবেল। সেরুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর অনুবাদক। সেরুলো চেঁচালেন, 'হালে লুইয়া' অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রশংসা করুন। অনুবাদক বাংলা করে বললেন। অনুবাদের অনুরোধে হাজার পঞ্চাশেক মানুষ চেঁচালেন, 'হালে লুইয়া'।



মরিস সেরুলো মঞ্চে।

সেরলু গোটা মঞ্চ জুড়ে প্রায় নেচে নেচে পা ঠুকে ঠুকে একটু লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তার হতে ধরা মাউথ-পিসটিকে একবার ডানহাতে একবার বাঁ হাতে নিয়ে যাত্রার অভিনেতার মত চড়া ঢঙে বলে চলেছেন, কে বলেছে আমরা বাঁদরের বংশধর? আমাদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষটিও মানুষই ছিল। কারণ ঈশ্বর আমাদের মানুষ করেই সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট প্রথম মানব-মানবী আদম ও ঈভ গড়েছিলেন নিজের আদলে। তখন মানুষের অসুস্থতা ছিল না, মৃত্যু ছিল না। ঈশ্বর বলেছিল নিষিদ্ধ ফল যদি কখনও খায় তবে পাপের ফল হিসেবে মানুষের জীবনে আসবে অসুস্থতা, মৃত্যু। শয়তানের প্ররোচনায় আদমের পাপ — আর তারই ফল ভোগ করে চলেছি আমরা বংশপরম্পরায়।

ইতিমধ্যে মঞ্চের বাঁ পাশে রাস্তার দিক থেকে একটা গুঞ্জন। হাতে পোস্টার নিয়ে জনা পনেরো ছেলে-মেয়ে। ওদের মধ্যে আমাদের হালিশহর শাখার কয়েকজনকে দেখতে পেলাম। ওরা স্লোগান দিচ্ছিলেন মাইকের আওয়াজ ভেদ করে স্লোগান আমাদের কানে গুঞ্জন ঠেকেছে। এ-বার ওঁরা একটু কাছে এসেছেন। চিনলাম — ওঁরা গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের ছেলে-মেয়ে। মুহূর্তে লাঠি নিয়ে তেড়ে গেল কয়েকজন পুলিশ। লাঠি-চার্জ শুরু হতেই ওঁরা মাঠ ছেড়ে পালালেন। পোস্টার হাতে ছেলে-মেয়েদের এগোতে দেখে আমার পাশে দু-জন বাড়তি পুলিশ অফিসার হাজির হয়েছিলেন। পোস্টারওয়ালারা বিদায় নিতে বাড়তি দু-জন বিদায় নিলেন।

আমাদের এই অবস্থান থেকে ঘটনাটা দেখা গেলেও সভার অন্য প্রান্তগুলো ঘটনার টেরই পেল না।

মরিসের বক্তব্য এতে বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত হয়নি। তিনি তাঁর নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে চলেছেন, 'ঈশ্বর প্রেরিত দূত আসে মানুষের পাপ দূর করতে। শয়তানের পরাজয়, ঈশ্বরের জয় প্রতিষ্ঠা করতে। এ-ভাবেই যিশু এসেছিলেন, আমি এসেছি।'

'আজ কলকাতা শহরের এই ময়দানের ওপর ঈশ্বরের আত্মা নেমে আসবেন। ঈশ্বরের দূতেরা আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? দু-হাত তুলে সমস্ত আবেগ দিয়ে তাঁকে আহ্বান করুন। ওই তো তিনি আসছেন .... তিনি এসে পড়েছেন, আপনারা প্রত্যেকে তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ান।'

কান্নায় ভেঙে পড়ে মরিস সেরুলো বললেন, 'হা-লে-লু-ই-য়া'। হাজার পঞ্চাশকে মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের কান্না ভেজা কাঁপা-কাঁপা গলায় ধ্বনিত হল 'হা-লে-লু-ই-য়া।' সে এক ভয়ংকর গণ-উন্মাদনা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে চোখ বুজে দু-হাত ওপরে তুলে কাঁদছেন আর বলছেন, 'হা-লে-লু-ই-য়া'।



নারী-পুরুষ নির্বিশেষে চোখ বুজে দু-হাত ওপরে তুলে কাঁদছেন।

কয়েকজন সাংবাদিক তাঁদের ক্ষোভ চেপে না রেখে তাঁদের সময়ের অপচয়ের জন্য আমাকে দুষলেন। জানালেন — এরপর সেরুলোর বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে গেলে পাবলিকই আমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে। জনা কয়েকের পোস্টার দেখানোর মধ্যে দিয়েই আমার খেলা শেষ হয়ে গেছে — এমনও কেউ কেউ ভাবলেন। কি আর করি। আমার তখন শুধু শোনার পালা।

সেরুলো শুরু করলেন দ্বিতীয় পর্ব। বললেন, এক এক করে বিভিন্ন রোগীকে আরোগ্য করবেন। প্রথমে বধিরদের পালা। নির্দেশ দিলেন এক কানে না শুনলে সেই কানে আঙুল দিতে হবে, দু-কানে না শুনলে দু-কানে নিজের আঙুল দিতে হবে। জন্ম কালারাই জন্ম বোবা। বোবা কালাদেরও দু-কানে নিজের আঙুল দিতে হবে। যাঁরা রোগী এনেছেন, তাঁরা তো শুনতে পাচ্ছেন, তাঁদের এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অনুরোধ করছি, বোবা-কালাদের সাহায্য করতে। এবার বাকি প্রত্যেকে দু-হাত সামনে বাড়িয়ে দিন। যাঁরা শুনতে পাচ্ছেন, তাঁরা বলুন — ইন দি নেমে অফ যেসাস, কাম আউট ....। অনুবাদক হিন্দি ও বাংলাতে অনুবাদ করে যাচ্ছেন চিৎকার করে।

প্রার্থনা শেষে সেরুলো বললেন, 'শোনা যাচ্ছে? কি আগের চেয়ে ভাল মত শোনা যাচ্ছে? বলুন? মঞ্চে এগিয়ে এসে প্রমাণ দিন, নাম বলুন, উত্তর দিন। যারা বধিরতা মুক্ত হয়েছে তাদের মঞ্চে নিয়ে আসতে ভলেন্টিয়ারদের বলছি।' ঘড়িতে রাত সাতটা পঁয়তাল্লিশ। সেরুলো দাবি করলেন, 'ময়দানের প্রতিটি বোবা-কালা সুস্থ হয়ে গেছে। এখন আপনাদের সামনে ভলেন্টিয়াররা হাজির করছে প্রমাণ।'

ভলেন্টিয়াররা একে একে বেছে বেছে রোগী তুলে আনতে লাগলো স্টেজে। একে একে নাম ঠিকানা বলে তারা জানাচ্ছে প্রার্থনার পরই প্রথম শুনতে পাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে স্টেজ আলো করে রাখা সরকারি অফিসার, তাঁদের বউ আর সাদা চামড়ার একগাদা নারী-পুরুষ তুমুল হাততালি দিয়ে উঠছেন। অভিনন্দনের ঢেউ মাইক থেকে পৌঁছে যাচ্ছে ময়দানের হাজার পঞ্চাশেক মানুষের মস্তিষ্ক-কোষে।

সাদা চামড়ার খাঁটি আমেরিকান চেহারার সুট-টাই পরিহিত সেরুলোকে অন্যান্য দেশি গুরুজীদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। তাই মনে সন্দেহ অবিশ্বাস থাকলেও শহরের মানুষ বিদেশী সাদা চামড়ার প্রতি অযৌক্তিক সমীহ বশতই প্রতিবাদে সোচ্চার হ'তে পারবে না জানতাম। এই জড়তা কাটাতে, নিজেদের যুক্তি-বুদ্ধির প্রতি আস্থা রেখে প্রতিবাদে যোগ দিতে সাহায্য করেছিল মাঠে ছড়িয়ে থাকা যুক্তিবাদী সদস্য সদস্যারা।



সংগঠক স্যামুয়েল রাজ।

তারা নিজেরা সঙ্গে করে মূক বধির ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সত্যি সত্যিই চেষ্টা করছিল মঞ্চের দিকে এগিয়ে যেতে — কিন্তু কেউই কাছে এগোতে পারেনি — সরাসরি বাধা পেয়েছিল ভলান্টিয়ারদের কাছ থেকে। তাছাড়া প্রথম প্রার্থনা পর্বের শেষে যখন সেরুলো জিজ্ঞেস করছিলেন দর্শকদের 'শুনতে পাচ্ছেন? বলতে পারছেন?' ইত্যাদি। তখন এই যুক্তিবাদী ভলান্টিয়াররা ঘুরে ঘুরে জিজ্ঞেস করছিলেন দর্শকদের — তাদের সঙ্গের রোগীদের। কারুর কাছেই ইতিবাচক উত্তর পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন তারা নিজেদের সঙ্গের রোগীদের দেখিয়ে জোরের সঙ্গেই বলছিলেন 'কই সারেনি তো? যেমন ছিল তেমনি আছে।' যারা জোরে বলছে, 'হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি' যেটা মাইকে শোনা যাচ্ছে। তারা তো মঞ্চের সামনে আলাদা বাঁশ দিয়ে ঘেরা জায়গায় বসা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সঙ্গে। চার্চের প্রধান অতিথিরা আর কিছু সাদা চামড়াধারী। 'কই আমাদের উত্তর তো শোনাই যাচ্ছে না — আমাদের এগোতে দিল না কেন?' প্রশ্ন বহুর।



মরিস সেরুলোর ভাঁওতায় এঁরা প্রত্যেকেই এসেছিলেন আরোগ্যের আশায় — আজকাল পত্রিকায় ১৬ অক্টোবর এ ছবি প্রকাশিত হয়।

মাঠের পঞ্চাশ হাজারের মত আমজনতার ভিড়ে এমন একজনও প্রতিবন্ধীকে খুঁজে পাওয়া গেল না — যিশুর কৃপায় যার জন্মগত রোগ সেরে গেছে এইমাত্র। অনেকেই গলা মেলালো — 'সত্যিই তো— আমাদের কথা শুনছেই না কেউ।' শেষ পর্যন্ত দেখা গেল — মজা দেখতে আসা বাদামওয়ালা থেকে শুরু করে চন্দননগরের বিকলাঙ্গ মেয়েটির হতাশ মা-বাবা পর্যন্ত সবাই নিজের চোখে দেখতে পেল এই প্রার্থণাসভার অসারতা, সাজানো আসরের ভয়ঙ্কর অমানবিক প্রতারণা। পরে এ-সবই জেনেছি সমিতির সভ্য-সভ্যাদের কাছ থেকে। কিন্তু প্রতিবাদ করবে কে? কি ভাবে? তারা কি হতাশায় ভেঙে পড়ে বাড়ি ফিরে যাবে নিজেদের ভাগ্যকে দুষতে দুষতে? অন্ধ শিশুকে কোলে নিয়ে তার দিদিমা ভিড়ের চাপ থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরতে পারলে বাঁচেন।

এই দোদুল্যমান বিস্ফোরক সম্ভাবনার মুহূর্তে আমি এগোলাম স্টেজের দিকে। সবকিছু প্ল্যানমাফিকই এগোচ্ছে। সিঁড়ির কাছে বাধা পেলাম। পুলিশ ও সেরুলোর 'মাসলম্যান'-দের কাছ থেকে প্রত্যাশিত বাধা। সাংবাদিকদের নজর ও সমর্থন আমাকে মঞ্চে উঠতে সাহায্য করল। একাধিক ভিডিও ক্যামেরা এখন আমাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু মঞ্চে উঠতেই পরিস্থিতি একটু অন্যরকম হল। সেরুলোর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা আমাকে টানতে লাগলেন মঞ্চের পিছন দিকে নিয়ে যেতে। মঞ্চ আট ফুটের মত উঁচু। গভীরতা প্রায় তিরিশ ফুট। পিছনে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা ছুরি বসিয়ে দিলেও সামনের সারির সাংবাদিকদের নজর পড়ার কথা নয়। মঞ্চের সামনের বাঁশ ধরে রইলাম শক্ত হাতে। রাণাঘাটের ফুল বিক্রেতা পরিচয়ে জয়ন্তী দে তখন মাইকে দাবি জানাচ্ছেন — বেশ কিছুদিন বধির ছিলেন। আজ সন্ধ্যা থেকে আবার শুনতে পাচ্ছেন। উল্টোডাঙার কল্যাণকুমার নাথ সদ্য কিশোর। সঙ্গে অভিভাবক। কল্যাণ জন্ম থেকেই বোবা-কালা। সেরুলো ছেলেটির পিছনে হাত নিয়ে হাত তালি দিলেন তিনবার। কল্যাণ শুনে থাকলে ততবার হাত-তালি দিক, ঈশারায় বোঝালেন কল্যাণের অভিভাবক। কল্যাণ তিনবার হাত তালি দিল। কল্যাণের পিছনে এবার চারবার হাততালি দিলেন সেরুলো। কল্যাণ চারবার হাততালি দিল। মাউথপিস এখন স্বেচ্ছাসেবকের হাতে। সেটা হাত বদল করে সেরুলোর হাতে যাওয়ার আগেই আমি মুঠো বন্দি করে ঘোষণা করলাম, 'এখনও পর্যন্ত যারা মঞ্চে উঠে সেরে গেছে বলে গল্প শোনাল, তারা প্রত্যেকেই সেরুলোর সাজানো লোক। আমি ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির তরফ থেকে মরিস সেরুলোকে চ্যালেঞ্জ করছি। এতক্ষণ পর্যন্ত যাদের স্টেজে তুলেছে, তারা এখনও

স্টেজের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। ওরা আবার এক এক করে ওদের ডিটেল ঠিকানা ও নাম বলুন। তারপর আপনারা, সাংবাদিক বন্ধুরা খোঁজ নিলেই দেখতে পাবেন, হয় ঠিকানা মিথ্যে, নতুবা পড়শীরাই জানিয়ে দেবেন — ওরা বধির ছিল না।

চ্যালেঞ্জ জানাবার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকরা এক সঙ্গে দাবি করলেন, সেরে যাওয়া রোগীদের তাঁদের সামনে হাজির করতে হবে। তাঁরা প্রশ্ন করতে চান। ওদিকে সারা মাঠ জুড়ে তখন রাশি রাশি কাগজ উড়ছে। চিৎকার উঠছে, 'গো ব্যাক, মরিস সেরুলো, গো ব্যাক, গো ব্যাক'। কল্যাণ যথেষ্ট ঘাবড়ে গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সেরুলো ও তার স্টেজের সঙ্গীরাও কিছুটা বিহ্বল। আমার হাত থেকে মাউথপিসটা কেড়ে নেবার অক্ষম চেষ্টা করছেন তাঁরা। দ্রুত উঠে আসতে দেখলাম দুই ডেপুটি পুলিশ কমিশনারকে।

মঞ্চের সামনে থেকে আজকাল পত্রিকার সাংবাদিক দেবাশিস ভট্টাচার্য চিৎকার করে কল্যাণকে প্রশ্ন করলেন, 'দুর্গার ক'টা হাত?'

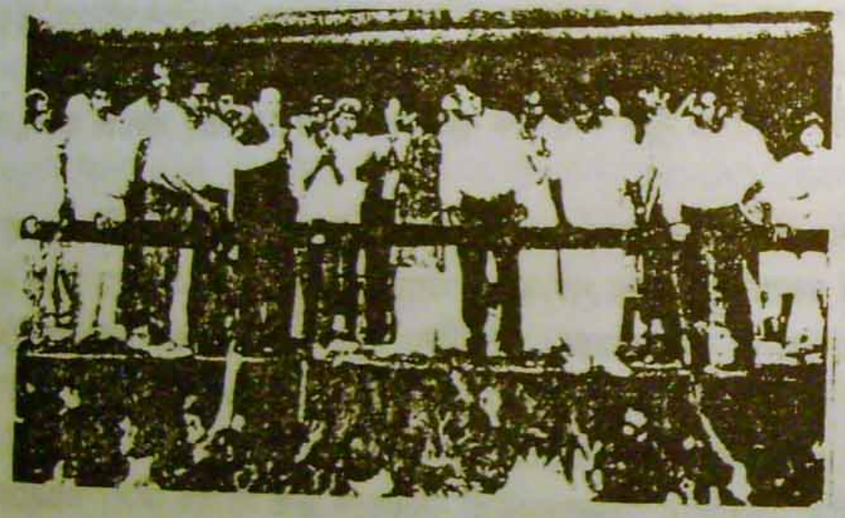
আমি আদেশের সুরে কল্যাণকে বললাম, 'বল দুটো হাত।' কল্যাণ বলল, 'দুটো হাত।'

'জন্ম বোবা-কালা কল্যাণ, যে কোনও ভাষাই জানে না, সে আমার বাংলা শুনে কতটুকু বলতে হবে বুঝে পরিষ্কার বাংলায় দিব্বি কথা বলে বুঝিয়ে দিল, ওকেও সাজিয়ে হাজির করা হয়েছে। সাংবাদিক কল্যাণকে নিয়ে ওর ঠিকানায় গেলেই বুঝতে পারবেন প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কত বড় প্রতারণা এখানে হচ্ছে।' মাঠ জুড়ে মাইকে আমার কথাগুলো ছড়িয়ে পড়ল।

মরিস সেরুলোর স্বেচ্ছাসেবকরা কল্যাণকে দ্রুত সরিয়ে নিল। আমাকে ধরে টানছে সেরুলোর কয়েকজন দেহরক্ষী।

সাংবাদিকরা তখন ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। তাঁরা সেরুলোকে সরাসরি বললেন, আপনি ভাঁওতা দিচ্ছেন। কলকাতার বুকে আমরা বুজরুকি চলতে দেব না। সেরুলো হাত-পা ছুড়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'ভগবান তোমাদের ওপর অভিশাপ দেবেন।' সেরুলোর সঙ্গীরাও গাল-পাড়ছেন সাংবাদিকদের। আমি তখন আক্রান্ত সেরুলো বাহিনীর হাতে। ক্রুদ্ধ সাংবাদিকরা আমাকে আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। সেরুলোর সাঙ্গোপাঙ্গোরা তখন পুলিশ ডাকছেন উদ্ধার পেতে। যুক্তিবাদী সমিতির ছেলে-মেয়েরা পুলিশ ও সেরুলো বাহিনীর ব্যারিকেড ভেঙে মঞ্চ দখল করতে উঠে আসছে। আকাশে উড়ছে যুক্তিবাদী সমিতির প্রচারপত্র।

অবস্থা পুলিশ ও সেরুলোর আয়ত্তের বাইরে। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে আমজনতা। ডেপুটি কমিশনার চয়ন মুখার্জি আমার হাত থেকে মাউথপিস কেড়ে নিয়ে আমাকে স্টেজ থেকে নেমে যেতে বললেন। পুলিশ তখন লাঠি চালাচ্ছে। আবার এক গণহিস্টিরিয়া দেখলাম। ময়দানের পঞ্চাশ হাজার মানুষ ধিক্কার দিচ্ছেন সেরুলোর নামে। সেরুলোকে গ্রেপ্তারের দাবি জানালেন। দাবি জানালেন সাংবাদিক বন্ধুরা, সাধারণ মানুষ। পুলিশ ও সেরুলো বাহিনীর প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে যুক্তিবাদী সমিতির ছেলে-মেয়েরা মঞ্চ দখল করেছে। মঞ্চে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ব্যানার। সেরুলো ও তার কয়েকজন সাথীকে পুলিশ লালবাজারে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় সেরুলোকে লক্ষ্য করে উড়ে এলো অনেক জুতো।



সেরুলোর পাশে ভাষাবোধহীন 'জন্মবধির-মূক' কিশোর — যে যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষের বাংলায় করা প্রশ্নের উত্তর দিল সরাসরি বাংলাতেই।

এই বুজরুকদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন নীরব থাকলে আমরা পরবর্তী কি কি পদক্ষেপ নেব, সে বিষয়ে সমিতির ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে জরুরী আলোচনা সেরে যখন 'আজকাল' পত্রিকা দপ্তরে পৌঁছলাম, তখন রাত এগারোটা পঞ্চাশ। সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত খবর দিলেন, লালবাজার থেকে আমার খোঁজ করা হচ্ছে। দৌড়লাম লালবাজার। ওখানে দেখা পেলাম সেরুলো ও তিন ব্যবস্থাপকের। ব্যবস্থাপকরা হলেন স্যামুয়েল রাজ, ইস্ট ইন্ডিয়া স্কুল অফ মিনিস্ট্রির অন্যতম প্রশাসক নির্মল বারুই ও স্বেচ্ছাসেবকদের অন্যতম প্রসাসক কে. ই. জেকভ।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার দীনেশ বাজপেয়ী ও পাঁচজন ডেপুটি কমিশনারের একটি দল আমার সঙ্গে আলোচনায় বসলেন।

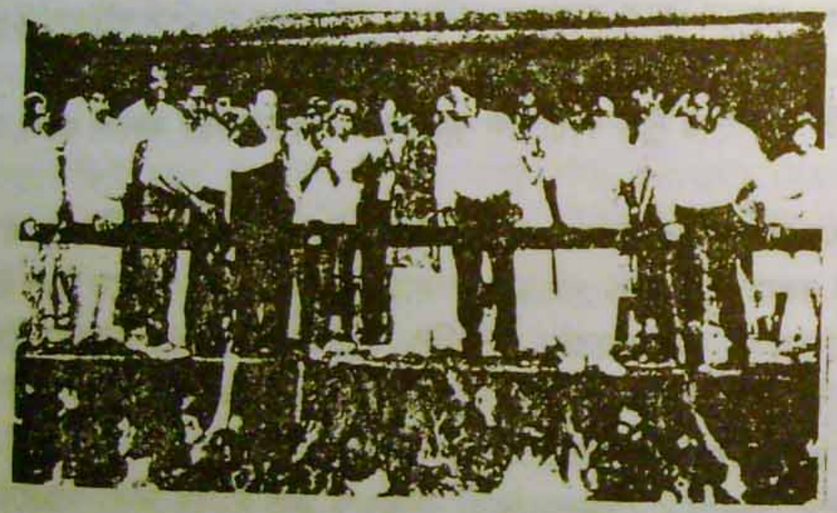
সেরুলোর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অভিযোগ দায়ের করলাম ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্যাডে। জমা দিলাম একাধিক প্রতিবন্ধীর অভিযোগপত্র। জানালাম, বেনেপুকুর থানাতেও এক প্রতিবন্ধীর অভিযোগপত্র ইতিমধ্যে জমা পড়েছে।



মঞ্চে মাইক হাতে পুলিশ অফিসার অলৌকিক সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করছেন।

'অলৌকিক উপায়ে রোগ সারাবার বিজ্ঞাপন দেওয়াটাই বে-আইনি। এই বে-আইনি বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর পুলিশ তো বে-আইনি সমাবেশ বন্ধ করতে উদ্যোগ নেয়নি, বরং ব্যবস্থাপকদের সমস্ত রকম সহযোগিতা সহ বে-আইনি লিফলেট পর্যন্ত বিলি করেছে।' আমাদের এই সমিতির তরফ থেকে আমার এই বক্তব্য রাখার পরও পুলিশ অবশ্য তাঁদের ত্রুটি স্বীকার করেননি। 'উদ্যোক্তারা একটি চিঠিতে ধর্মীয় প্রার্থনা সভার অনুমতি চেয়েছিল, কোথাও 'অলৌকিক সমাবেশ' বা 'অলৌকিক আরোগ্যদান'-এর কথা ছিল না। বিষয়টি পরে সেদিনই বিজ্ঞাপনে

অবস্থা পুলিশ ও সেরুলোর আয়ত্তের বাইরে। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে আমজনতা। ডেপুটি কমিশনার চয়ন মুখার্জি আমার হাত থেকে মাউথপিস কেড়ে নিয়ে আমাকে স্টেজ থেকে নেমে যেতে বললেন। পুলিশ তখন লাঠি চালাচ্ছে। আবার এক গণহিস্টিরিয়া দেখলাম। ময়দানের পঞ্চাশ হাজার মানুষ ধিক্কার দিচ্ছেন সেরুলোর নামে। সেরুলোকে গ্রেপ্তারের দাবি জানালেন। দাবি জানালেন সাংবাদিক বন্ধুরা, সাধারণ মানুষ। পুলিশ ও সেরুলো বাহিনীর প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে যুক্তিবাদী সমিতির ছেলে-মেয়েরা মঞ্চ দখল করেছে। মঞ্চে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ব্যানার। সেরুলো ও তার কয়েকজন সাথীকে পুলিশ লালবাজারে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় সেরুলোকে লক্ষ্য করে উড়ে এলো অনেক জুতো।



সেরুলোর পাশে ভাষাবোধহীন 'জন্মবধির-মূক' কিশোর — যে যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষের বাংলায় করা প্রশ্নের উত্তর দিল সরাসরি বাংলাতেই।

এই বুজরুকদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন নীরব থাকলে আমরা পরবর্তী কি কি পদক্ষেপ নেব, সে বিষয়ে সমিতির ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে জরুরী আলোচনা সেরে যখন 'আজকাল' পত্রিকা দপ্তরে পৌঁছলাম, তখন রাত এগারোটা পঞ্চাশ। সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত খবর দিলেন, লালবাজার থেকে আমার খোঁজ করা হচ্ছে। দৌড়লাম লালবাজার। ওখানে দেখা পেলাম সেরুলো ও তিন ব্যবস্থাপকের। ব্যবস্থাপকরা হলেন স্যামুয়েল রাজ, ইস্ট ইন্ডিয়া স্কুল অফ মিনিস্ট্রির অন্যতম প্রশাসক নির্মল বারুই ও স্বেচ্ছাসেবকদের অন্যতম প্রসাসক কে. ই. জেকভ।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার দীনেশ বাজপেয়ী ও পাঁচজন ডেপুটি কমিশনারের একটি দল আমার সঙ্গে আলোচনায় বসলেন।

সেরুলোর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অভিযোগ দায়ের করলাম ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্যাডে। জমা দিলাম একাধিক প্রতিবন্ধীর অভিযোগপত্র। জানালাম, বেনেপুকুর থানাতেও এক প্রতিবন্ধীর অভিযোগপত্র ইতিমধ্যে জমা পড়েছে।



মঞ্চে মাইক হাতে পুলিশ অফিসার অলৌকিক সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করছেন।

'অলৌকিক উপায়ে রোগ সারাবার বিজ্ঞাপন দেওয়াটাই বে-আইনি। এই বে-আইনি বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর পুলিশ তো বে-আইনি সমাবেশ বন্ধ করতে উদ্যোগ নেয়নি, বরং ব্যবস্থাপকদের সমস্ত রকম সহযোগিতা সহ বে-আইনি লিফলেট পর্যন্ত বিলি করেছে।' আমাদের এই সমিতির তরফ থেকে আমার এই বক্তব্য রাখার পরও পুলিশ অবশ্য তাঁদের ত্রুটি স্বীকার করেননি। 'উদ্যোক্তারা একটি চিঠিতে ধর্মীয় প্রার্থনা সভার অনুমতি চেয়েছিল, কোথাও 'অলৌকিক সমাবেশ' বা 'অলৌকিক আরোগ্যদান'-এর কথা ছিল না। বিষয়টি পরে সেদিনই বিজ্ঞাপনে

আমরা দেখি।' ডেপুটি কমিশনার দেবেনবাবু এ-কথা জানান। দিন দশেক আগেই সারা কলকাতা জুড়ে এমনকি মহাকরণে সেরুমেলার ছবিসহ বড় বড় রঙিন পোস্টারে 'অলৌকিক সমাবেশ'-এর কথা জানানো সত্ত্বেও এ বিষয়ে তারা কিছু জানতেন না, এটা মেনে নেওয়া যে সম্ভব নয় তাও জানাই। এটা মেনে নিলে আরও মানতে হয় — পুলিশ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাইনে নেয়।

আমাদের আলোচনার গতি-প্রকৃতি মাঝে মাঝেই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছিল পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদার ও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে।

মরিস সেরুলো একে বিশাল মাপের ধর্মগুরু, তায় আবার আমেরিকান। তাই সেরুলোকে আদালতে পাঠালে নানা ধরনের জটিলতা তৈরি হতে পারে ভেবেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে সেরুলোকে আদালতে পাঠানোর ব্যাপারটা খুবই স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত সেরুলোকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঘোষণা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে ভোর না হতেই ব্যাঙ্ককের বিমানে সেরুলোকে চাপিয়ে দিয়ে এলো পুলিশ।

সেরুলো অবাঞ্ছিত

স্টাফ রিপোর্টার : গভীর রাতে জানা যায় ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির অভিযোগ পাওয়ার পর সেরুলোকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ব্যাপারে রাতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর সেরুলোকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঘোষণা করা হয়। লালবাজারে সেরুলোকে আনা হয়। পুলিশের বড়কর্তারা সকলেই ছিলেন। ক্যাথিড্রাল চার্চের বিশপের পরিবারের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সকালে বিমানে সেরুলোকে তুলে দেওয়া হবে।

'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকায় ১৬ অক্টোবর প্রথম পৃষ্ঠাতেই খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল।

পশ্চিমবাংলার সাংবাদিকরা ও যুক্তিবাদী মানুষরা সে-দিন এমন একটা ঘটনা ঘটিয়েছেন, যা ইতিহাস হয়ে থাকবেই। ঘটনার আগের পরের কয়েকটি দিনের প্রতিটি ভাষা-ভাষী দৈনিক পত্রিকা ভবিষ্যতের গবেষকদের কাজে লাগবেই। ইতিহাসকে খুঁজে পেতেই কাজে লাগবে।

যোগী-জ্যোতিষী হরেকৃষ্ণবাবা!

এই ঘটনার সূত্রপাত '৮৭-র ২২ আগস্ট, শনিবার বিকেল চারটে। এলেন এক আগন্তুক। ছেলে পিনাকীই দরজা খুলেছিল। আগন্তুককে জানিয়েছিল, 'বাবা কাজে ব্যস্ত আছেন। কাল সকাল দশটায় আসুন, দেখা হবে।'

আগন্তুক নাছোড়বান্দা। বহুদূর থেকে নাকি অনেক কষ্ট করে এসেছেন। খুবই জরুরি প্রয়োজন।

অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না, গিলতেই হল। পিনাকী দরজা খুলে তাঁকে বসতে অনুরাধ করল। আমি বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতেই সোফায় হেলান দেওয়া মানুষটি উঠে দাঁড়িয়ে উঁচু ও সাদা একরাশ দাঁত ছড়িয়ে একগাল হেসে আমাকেই অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁকে বসতে বলে আমিও বসলাম। সাধারণ চেহারার, সাধারণ উচ্চতার টেলিফোন কালো মানুষটির কাঁচা-পাকা চুল আর খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেখে অনুমান করেছিলাম বয়স পঞ্চান্ন পেরিয়েছে, পরে জেনেছিলাম, আমার অনুমান ভুল। বিয়াল্লিশ চলছে। নাম জানালেন হরেকৃষ্ণবাবা। এক সময় ছিল সুনীলকুমার সাধুখাঁ। থাকেন হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার কাছে 'বেলুন' গ্রামে। কৈশোর থেকেই রাস্তায় ঘাটে চলতে ফিরতে হরিনাম গাইতেন। তাই থেকেই 'হরেকৃষ্ণবাবা' নামটা চালু হয়ে যায়। একসময় মগরায় 'ম্যাজিক শো' দেখিয়েছেন। ম্যাজিকের প্রতি এখনও আগ্রহ আছে। '৭০ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের কাছে দীক্ষা নেন। ওঙ্করনাথজির খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। ওঙ্কারনাথজির একমাত্র পুত্র রঘুনাথজি খুবই ভালোবাসেন। '৭৪ থেকে জ্যোতিষচর্চার শুরু। বর্তমানে যোগী জ্যোতিষী হিসেবে খ্যাত। নিজেকে একজন খাঁটি যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে দাবি করলেন। বহু পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর সিদ্ধান্তে এসেছেন জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান। হাতের রেখা দেখে তিনি গত কয়েক বছরে যেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন, তার প্রতিটিই নাকি সত্যে পরিণত হয়েছে। আমার যুক্তিবাদী মানসিকতার পরিচয় পেয়ে হরেকৃষ্ণবাবাজির

খুব ভাল লেগেছে, তাই সত্যের সন্ধান দিতে এখানে এসেছেন। নিজের অভ্রান্ত জ্যোতিষ গণনার দাবির সমর্থনে আমার হাতে তুলে দিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রশংসাপত্র। তার মধ্যে মোহনবাগান ক্লাবের গোবিন্দ দে'র দেওয়া প্রশংসাপত্র যেমন দেখলাম, তেমনই দেখলাম মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সাংসদ অজিত বাগের দেওয়া প্রশংসাপত্র।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার প্রশংসাপত্রের ফটোকপিগুলো রাখতে পারি?'

'সানন্দে।' স্বভাবসিদ্ধ দু'পাটি চকচকে সাদা দাঁত ছড়িয়ে হাসলেন।

একটু পরেই আসল প্রসঙ্গে এলেন। জানালেন, আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চান। '৮৭-র রিলায়েন্স কাপ ক্রিকেট প্রতিয়োগিতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতবে, লিখিতভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করে প্রমাণ করতে চান জ্যোতিষশাস্ত্র অভ্রান্ত ও বিজ্ঞান। চ্যালেঞ্জ হেরে গেলে তিনি যে কোনও শাস্তি মাথা পেতে নিতে রাজি আছেন।

বললাম, 'রিলায়েন্স কাপ বিজয়ীর নাম অনুমানের উপর একাধিক সংস্থা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। প্রতিযোগিতার ফল ঘোষিত হলে দেখবেন সঠিক অনুমানকারীর সংখ্যাই কয়েক হাজার। এই সঠিক অনুমানকারীদের মধ্যে আপনিও একজন হতে পারেন। কিন্তু এর দ্বারা আপনার জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা বা জ্যোতিষী হিসেবে সফলতা, কোনওটাই প্রমাণিত হয় না। আপনার এই ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে আমার অতীত সম্বন্ধে দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হলে আমরা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারি।'

বাবাজি বললেন, 'আনন্দের সঙ্গে রাজি আছি। আসলে আপনি ১৯৮৫-র রেডিও প্রোগ্রামে যে চারজন নামী দামী জ্যোতিষীকে হারিয়ে ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই প্রচারের জোরে এক একটি বাঘ হলেও বাস্তবে ছিলেন কাগুজে বাঘ। জ্যোতিষী হতে গেলে যে জ্যোতি দর্শনের প্রয়োজন তা এঁদের কারুরই হয়নি। এই জ্যোতি দর্শনের জন্যেই দরকার যোগের। যোগী ছাড়া কেউ সত্যদ্রষ্টা জ্যোতিষী হতে পারে না। আমি একজন যোগী-জ্যোতিষী। তাই তো আপনার কাছে এসেছি সত্যের সন্ধান দিতে, পরীক্ষা দিতে এবং আমারই পথের পথিক করতে।'

এমন সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারার ক্ষমতাধারী বাবাজিটি এখনও কেন তেমন নাম করতে পারেননি, তার কারণ সম্ভবত বিজ্ঞাপনে বিনিয়োগ করার মত অর্থের অভাব। প্রচারের জন্যে নিশ্চয়ই আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণকেই সেরা উপায় ভেবে নিয়েছেন। বাবাজিকে আরও একটু নাড়াচাড়া করার ইচ্ছেয় জিজ্ঞেস

করলাম, 'আমাদের এই চ্যালেঞ্জের ব্যাপারটা কি শুধুমাত্র দু-জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমকেও তা জানাতে চান?' বাবাজি আরও বিগলিত হলেন, 'নিশ্চয়ই জানাতে চাই। আমি চাই যা সত্য তা সবাই জানুক। দেশের প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি পত্রিকা এমনকি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্স, লন্ডনকেও এই চ্যালেঞ্জের কথা জানাতে চাই।'

এমন এক জবরদস্ত আত্মবিশ্বাসে ভরপুর চ্যালেঞ্জারটির কথায় মনে যাই হোক, দাঁত বের করে হাসতে হল আমাকে। বললাম, 'বেশ তাই হবে। আপনার যাদের জানাতে মন চায়, জানাবেন। যদি আপনি আপনার দাবি প্রমাণ করতে পারেন, খোলা মনের মানুষ হিসেবে নিশ্চয়ই মেনে নেব জ্যোতিষশাস্ত্র ও যোগের ক্ষমতা। সঙ্গে প্রণামী হিসেবে পঞ্চাশ হাজার টাকা তো পাবেনই। এ-বার আসা যাক আমার জীবনের অতীতের প্রশ্নে। আপনি কি '৮৫-তে প্রচারিত 'জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান' শিরোনামের বেতার অনুষ্ঠানটি শুনেছিলেন?'

'হ্যা শুনেছি। আপনার 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটাও পড়েছি।'

বললাম, 'তবে তো জানেনই আমি বিবাহিত। তবু আমার বিয়ের বিষয়েই প্রশ্ন রাখছি। এক, আমার কটা বিয়ে? দুই, দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে থাকলে প্রথমা কি মৃত? অথবা ডিভোর্স নিয়েছি?'

দীর্ঘ সময় আমার হাত উল্টে-পাল্টে দেখে হাতের রেখার নানা মাপজোক করে শেষ পর্যন্ত বললেন, 'কাল বিকেলে আসব। আমার নাম-লেখা রাইটিং প্যাড তাড়াহুড়োতে আনিনি। কাল উত্তরগুলো আমার নাম ছাপানো রাইটিং প্যাডে লিখে স্বাক্ষর করে দেব। তারপরই সুর পাল্টে হালকা চালে বললেন, 'সেই সকালে বেরিয়েছি। গিয়েছিলাম আপনার 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির প্রকাশকের কাছে। তাঁদের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে গেলাম আমার অফিসে। শুনলাম আপনি বেরিয়ে গেছেন। সেখান থেকে আপনার পিছু ধাওয়া করে এখানে। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াবেন?'

'নিশ্চয়। তারপর চা খাবেন না কফি, বলুন।'

'যা হোক একটা হলেই হল।'

জল ও চায়ের ব্যবস্থা করতে ভিতরে গেলাম। আমি একটু ভিতরে কাজে ব্যস্ত ছিলাম। স্ত্রী সীমা বাড়িতে ছিলেন না। ছেলে পিনাকীই জল দিল, পরে চা। আমি ঘরে ঢুকলাম পিনাকীর কথায়, 'বাবা, উনি যাবেন বলছেন।'

বললাম, 'দুঃখিত। একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম।'

বাবাজি উদারভাবে হাসলেন, 'না না দুঃখের কি আছে। আপনারা কাজের মানুষ। এই তো আপনার ছেলের সঙ্গে দিব্যি আলাপ হয়ে গেল। খুব ভাল ছেলে। কাল তাহলে বিকেল পাঁচটা নাগাদ আসছি।'

২৩ আগস্ট হরেকৃষ্ণবাবা এলেন বিকেল পার করে। তখন ঘরে আমার প্রচুর বন্ধু-বান্ধব ও মধ্যপ্রদেশের এক বিশিষ্ট সন্ন্যাসী। বাবাজির সঙ্গে প্রত্যেকেরই আলাপ করিয়ে দিলাম। বাবাজি আমার হাতে একটা বই তুলে দিয়ে বললেন, 'বইটা আপনাকে উপহার দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজি'র ছেলে রঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।'

বইটার নাম 'শ্রীশ্রীসীতারাম লীলাবিলাস'। হরেকৃষ্ণবাবা এবার ঝোলা থেকে তাঁর রাইটিং প্যাড বের করে সকলের সামনেই তিনটি বিষয়ে লিখিত মতামত প্রকাশ করলেন। এক : প্রবীর ঘোষের দুটি বিয়ে। দুই : প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর ২৬ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে প্রবীরবাবু দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। তিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজ রিলায়েন্স কাপ বিজয়ী হবে।

আমার বিয়ে নিয়ে যা লিখেছেন, ঠিক হয়েছে কি না, হরেকৃষ্ণবাবা জিজ্ঞেস করায় বিস্ময়ে প্রায় হতবাক্ আমি প্রায় তোতলাতে তোতলাতে বললাম, 'সত্যিই আপনার অতীত বলার ক্ষমতার যে পরিচয় পেলাম, তাতে অবাক হয়ে গেছি।'

বাবাজি বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন, আমার মতামত যেন আমার নাম ছাপানো প্যাডে লিখিতভাবে দিই। বললাম, 'এখুনি লিখে দিয়ে লাভ কি? শর্ত অনুসারে তিনটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর না দিতে পারলে আপনি পরাজিত হবেন। রিলায়েন্স কাপ ফাইনালের দিন সন্ধ্যায় আমার বাড়িতেই আমরা মিলিত হব। সেই দিনই ঘোষিত হবে জয়-পরাজয়।'

হরেকৃষ্ণবাবাজি তবু নাছোড়বান্দা, 'যে দুটো প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, সেই উত্তর দুটির বিষয়ে আপনার মতামত লিখে দিন।'

অতএব লিখে দিলাম 'আমার বিবাহ সংক্রান্ত আপনার বিচার দুটি আমাকে বিস্মিত করেছে।' বাবাজি পরম তৃপ্তি ও চূড়ান্ত খুশির সঙ্গে বিদায় নিলেন, তাঁর এই খুশি ও তৃপ্তি মুহূর্তে আতঙ্কে পরিবর্তিত হত, যদি যোগ + জ্যোতিষী ক্ষমতার সাহায্যে জানতে পারতেন আমার বিস্ময়ের কারণ! এত বোল-চাল, এত হাম্বা রবের পর হরেকৃষ্ণবাবার এই ক্ষমতা প্রকাশিত হল? আর সব বাবাজি-মাতাজিদের মত ওঁর ক্ষমতাও যে ভণ্ডামি বই কিছুই নয়।

আমি বিয়ে করেছি একবারই। স্ত্রী জীবিত। আমার বয়স তখন চল্লিশ

অতিক্রান্ত। অর্থাৎ হরেকৃষ্ণবাবা-কথিত দ্বিতীয় বিয়ের সময় পেরিয়ে এসেছি। হায়, এই নাকি বাবাজির জ্যোতিদর্শন?

বাস্তবিকই আমি বিস্মিত!

হরেকৃষ্ণবাবা আমাকে পরাজিত করেছেন — এই বক্তব্য নিয়ে একাধিক পত্রিকা দপ্তরে যোগাযোগ করেছেন। প্রমাণ হিসেবে দেখিয়েছেন আমার লেখা চিরকুট। পত্রিকা দপ্তর থেকে বলেছেন, উনি লিখেছেন বিস্মিত হয়েছেন। আপনি ঠিক বলেছেন, এ-কথা লিখিয়ে আনুন। তখন নিশ্চয়ই এটা একটা বড় খবর হবে। হরেকৃষ্ণবাবা আমার সঙ্গে দেখা করে আমার বক্তব্য স্পষ্ট করে লিখে দিতে অনুরোধ করেছেন। এবং আমার বিস্ময়ের কারণ শুনে মুখ হাঁড়ি ও রঙ বেগুনি করে দ্রুত বিদায় নিয়েছেন।

হরেকৃষ্ণ বাবার ভুল করার কারণ, তিনিও প্রতিটি সফল জ্যোতিষীর মতই কৌশলে কথা বলে কথা বের করে নিতে সচেষ্ট ছিলেন। সুযোগ পেতেই পিনাকীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি চা নিয়ে এলে? তোমার মা'কে দেখছি না? তিনি কি চাকরি করেন?'

পিনাকী ন্যাকা-খোকাটি সেজে উত্তর দিয়েছিল, 'ছোট মা গেছেন গান শেখাতে।'

পিনাকীর ওই 'ছোট মা' কথাটিতেই বধ হলেন যোগী-জ্যোতিষী হরেকৃষ্ণবাবা।



পঁয়তিরিশ বছর আগের বালক ব্রহ্মচারী এবং....

সাধু-সন্তদের প্রতি আমার টান নিতান্তই শৈশব থেকে। সেই টানে অবশ্য এখনও আছে। তবে সময় ও মানসিকতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকারভেদ ঘটেছে। শুরুতে যেতুম সাধু-সন্তদের অলৌকিক ক্ষমতা দেখতে পাওয়ার আশায়। কৈশোর ও যৌবনে সদ্য পা রাখা সময়ে আন্দোলনের কথা, যুক্তিবাদের প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথাটা তেমনভাবে মনে দানা বাঁধেনি। রহস্যভেদের নেশায় সত্যকে জানার নেশায় মেতে ছিলাম। অধ্যাত্মবাদ ও অলৌকিকতার পুরনো লোকঠকানো ভাঁওতাবাজি এভাবেই ক্রমশ উপলব্ধি করেছি।



তিরিশ বছর পরে বালক ব্রহ্মচারীর নির্বিকল্প সমাধি চলাকালীন যুক্তিবাদী সমিতির ২০ জন সদস্য সুখচরে সন্তান দলের আশ্রমের সামনে নাড়ির গতি বন্ধ করে দেখালেন 'নির্বকল্প সমাধি'।

যখনকার কথা বলছি, তখন কলেজে পড়ি, সালটা বোধহয় ১৯৬৩। তখন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিল গোরা। পুরো নাম গোরাচাঁদ দত্ত। থাকত বরাহনগরের শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেনে। জানি না গোরা এখনও সেখানে থাকে কি না। সাধু-সন্তদের প্রতি আমার আকর্ষণের কথা গোরার অজানা ছিল না। ও একদিন বললো, ওদের পারিবারিক, গুরুদেব বালক ব্রহ্মচারীবাবার অলৌকিক ক্ষমতার কথা। বালক ব্রহ্মচারীর নাম আগেই শুনেছি। এও শুনেছি বাবার নাকি ভারত জুড়ে সত্তর লক্ষ শিষ্য-শিষ্যা। গোরা বললো 'সে-বার বরানগরের একটি স্কুলে গুরুদেবের জন্মদিন পালনের ব্যবস্থা করা' হয়েছিল। গুরুদেব আসবেন সন্ধেতে। কিন্তু বিকেল থেকেই কাতারে কাতারে লোক আসা শুরু হয়ে গেল। আমরা কিছু তরুণ শিষ্য ভলেন্টিয়ার হয়েছিলুম। বিকেলে এক ভদ্রলোক এলেন, সঙ্গে দশ-বার বছরের দুটি ছেলে। ওঁকে খুবই অস্থির দেখাচ্ছিল। জনে জনে ভলেন্টিয়ার ধরে ধরে একই প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন, ব্রহ্মচারীবাবা কখন আসবেন? আমাকেও প্রশ্ন করতে বললুম, সন্ধে নাগাদ এসে পড়বেন। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো? এতো অস্থির হয়ে পড়েছেন কেন?

'ভদ্রলোক বললেন, বহু দূর থেকে এসেছি অনেক আশা নিয়ে। শুনেছি, যাঁরাই বাবার কাছে দীক্ষা নিতে চান, তাঁদের বাবা সঙ্গে সঙ্গে জপ মন্ত্র দেন। এই আমার দুটি মাত্র সন্তান। বোবা-কালা। নিয়ে এসেছি দীক্ষা দেওয়াতে। দেখি বাবা কেমন করে বোবা-কালাদের জপমন্ত্র শোনান!

'দারুণ ইনটারেসটিং একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে পড়লুম। ভদ্রলোক ও তাঁর ছেলেদুটিকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে আমার চেনা-অচেনা অনেকের কাছেই ওঁদের আসার উদ্দেশ্য জানালুম। খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। দলে দলে ভক্তেরা ওঁদেরই দেখতে এলেন। ভক্তেরা প্রচণ্ড ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন — কী হয়! কী হয়! সত্যিই কী বাবার দেওয়া জপ-মন্ত্র ওরা শুনতে পাবে এবং জপ করতে পারবে? আজ কী গুরুদেবের এক অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশের সাক্ষ্য হয়ে জীবনকে সার্থক করার সুযোগ মিলবে? সুযোগ মিলবে গুরুদেবের লীলামাহাত্ম দেখার?

'শেষ পর্যন্ত শুভ মুহূর্তটি এলো। ভদ্রলোক তাঁর দুই ছেলের হাত ধরে স্টেজে উঠে এলেন। গুরুদেবের চরণে তিনজনেই প্রণাম জানালেন। ভদ্রলোক এবার দুই ছেলেকে দীক্ষা দিতে অনুরোধ করলেন। গুরুদেব প্রশান্ত হাসি ছড়িয়ে ছেলে দুটিকে দু'হাতে কাছে টেনে নিলেন। একে একে দুজনের কানেই দিলেন জপ-মন্ত্র। তারপর

বললেন, শুনতে পেয়েছিস তো?

'আমার প্রেসার তখন এক লাফে চড়ে গেছে। নিজের বুকের টিপ্ টিপ্ আওয়াজ একটু চেষ্টা করলেই বোধহয় নিজেই শুনতে পাব। অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, প্রতিটি ভক্তের অবস্থাই আমার মতো।

'ছেলে দুটি পরিষ্কার গলায় বললো, হ্যাঁ, শুনতে পেয়েছি। তারপরই ছেলেদুটি আর তাদের বাবা হাউ-মাউ করে কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন বাবার পায়ে। ঘটনার আকস্মিকতায় ভক্তেরা হৃদয়াবেগ সংযত করতে পারলেন না। অনেকেরই দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো জলের ধারা। স্কুলের হল-ঘর গুরুদেবের জয়ধ্বনিতে বরে গেল।'

গোরার কাছে এই ঘটনা শোনার পর একদিন ওর সঙ্গে গেলাম গুরুদেব বালক ব্রহ্মচারীর দর্শনে। কলকাতার এক অভিজাত এলাকায় তখন তিনি থাকতেন। একতলার একটা বড়-সড় হল-ঘরে ভক্তেরা অপেক্ষা করছিলেন। আমি আর গোরা ওই ঘরেই বসলাম। শুনলাম, গুরুদেব দোতলায় দর্শন দেন। সময় মত আমাদের ডাকা হবে। ওখানে বসে থাকতে থাকতে অনেকের সঙ্গেই আলাপ হল। এঁদের অনেকের কাছেই গুরুদেবের অনেক অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনলাম। একজন ভারত-বিখ্যাত শিক্ষাবেত্তা গুরুদেবের অলৌকিক ক্ষমতার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যে কাহিনী বললেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। উনি একবার গুরুদেবকে ক্ষিদে পেয়েছে জানাতে গুরুদেব নাকি বলেছিলেন, 'দাঁড়া তোর খাবার আনার ব্যবস্থা করছি।" গুরুদেব ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলেন, একটা আলো হয়ে গেলেন। তারপর আলোর ভিতর থেকে ভেসে এলো সোনার থালায় সাজানো নানা রকমের মিষ্টি। কী তার স্বাদ! কী তার গন্ধ!

একসময়ে আমাদের ডাক পড়ল। সকলের সঙ্গে দোতলায় গেলাম। তলার হলটার মতই একটা বড় হল ঘরে সিল্কের গেরুয়া পোশাক পরে বাঘছালের উপর বসে ছিলেন বালক ব্রহ্মচারী। জানালায় ও দরজায় দামী ভারী পরদা। ঘরে দশমীর জ্যোৎস্নার মত হালকা আলো। ভক্তেরা একে একে গুরুদেবকে প্রণাম করছিলেন। কেউ পায়ে নিবেদন করছিলেন ফুল। কেউ হাতে তুলে দিচ্ছিলেন মিষ্টির প্যাকেট। কেউবা শিশি বা বোতলে আনা জল গুরুদেবের পায়ের বুড়ো আঙুল ডুবিয়ে পবিত্র পাদোদক তৈরি করে নিচ্ছিলেন।

ভক্তদের প্রণামের ব্যাপারটা দেখাশুনো করছিলেন এক ফুলটাইমার শিষ্য। তিনি একসময় আমাকে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতে বললেন। আমি এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু প্রণাম না জানিয়ে বালক ব্রহ্মচারীকে বললাম, 'শ্রদ্ধার প্রকাশ প্রণামে। শ্রদ্ধাহীন প্রণামের অভিনয় আমি করতে পারব না। শুনেছি আপনি জন্মসিদ্ধ পুরুষ, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। আমার একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে আপনার অলৌকিক ক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে প্রণাম জানাব।'

বালক ব্রহ্মচারীবাবা আমাকে ঈশারায় ঘরের কোনায় দাঁড়াতে বললেন। দাঁড়ালাম। শেষ ভক্তটিও প্রণাম জানিয়ে বিদায় নেওয়ার পর বালক ব্রহ্মচারী আমার দিকে তাকালেন। আমার পাশে তখন গোরা ও ফুলটাইমার শিষ্যটি। বালক ব্রহ্মচারী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন 'তোমার প্রশ্নটা কী?'

বললাম, 'গতকাল সন্ধে সাতটার সময় আমি কোথায় ছিলাম?'

বালক ব্রহ্মচারী এবার গোরাকে বললেন, 'ও বুঝি তোর বন্ধু? তা, তুই নীচে গিয়ে বোস, আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলব।'

গোরা বেরিয়ে যেতেই শিষ্যটিকে বললেন, 'তুই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যা, কেউ যেন এখন এ-ঘরে না আসে।'

শিষ্যটি চলে যেতেই বালক ব্রহ্মচারীবাবা তাঁর মুখোমুখি আমাকে বসিয়ে অনেক গল্প-সল্প করলেন। আমার বাড়িতে কে কে আছেন? তাঁরা কে কী করেন? আমি কী করছি? এ-সব খবর নিলেন। সত্যি কথাই বললাম। এরই মধ্যে এক সময় ফুলটাইমার শিষ্যটি দরজা খুলে জানালেন, 'দুই ভদ্রলোক এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে এসেছেন আপনার আশীর্বাদ নিতে। মহিলাটির গল-ব্লাডার অপারেশন হবে আজ। নার্সিহোমে ভর্তি হওয়ার আগে তাই আপনার.....'

কথা শেষ করার আগেই রাগতস্বরে বাবা বললেন, 'তোরা কি একটু শান্তিতে কথা বলতেও দিবি না! অপেক্ষা করতে বল, দেরি হবে।'

আমরা দু'জনে আবার আমাদের গল্পে ফিরে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার ঘরের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকলেন শিষ্যটি। 'গুরুদেব, পেসেন্ট যন্ত্রণায় ছটফট করছে। যদি অনুমতি করেন তো....'

বিরক্ত গুরুদেব বললেন, 'যা নিয়ে আয়।'

একটু পরেই শিষ্যটি দুই ভদ্রলোকের সাহায্যে এক মহিলাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মহিলাটির মুখে তীব্র যন্ত্রণার ছাপ। বালক ব্রহ্মচারীর পায়ের তলায় তাঁকে সষ্টাঙ্গ-প্রণামের ভঙ্গিতে শুইয়ে দেওয়া হল। গুরুদেব মহিলার সঙ্গী লোকদুটিকে বললেন, 'তোরা নীচে গিয়ে অপেক্ষা কর।' শিষ্যটিকে বললেন, 'যা কুশীতে একটু জল নিয়ে আয়।'

শিষ্য তামার কুশীতে জল নিয়ে এলেন। তারপর গুরুদেবের আদেশে কুশীটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন। বালক ব্রহ্মচারী কুশীটি মহিলাটির পিঠের উপর বসিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন মন্ত্র পড়লেন ও কুশীর জলে বার কয়েক ফুল ছিঁড়ে পাপড়ি ছুড়লেন। এটা চললো আধ মিনিটের মত সময় ধরে। তারপর আমাকে বললেন, 'দেখো তো জলটা গরম হয়েছে কি না?'

কুশীর জলে আঙুল ডোবালাম। জল গরম। বললাম, 'জল গরম।'

বালক ব্রহ্মচারী বললেন, 'এ-বার কুশীটা ওর পিঠ থেকে নামিয়ে ওকে তুলে দাঁড় করা।' বালক ব্রহ্মচারী এই প্রথম আমাকে 'তুই' সম্বোধন করলেন।

দাঁড় করালাম। বালক ব্রহ্মচারী আদেশ দিলেন, 'এ-বার ওকে জোর করে দৌড় করা।'

তাই করালাম। মহিলাটি 'পারব না, পারব না' করে ভেঙে পড়তে পড়তেও আমার জন্যে পড়তে পারলেন না। বরং আমার জন্য দৌড়তে বাধ্য হলেন। এবং তারপরই আমার হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে গুরুদেবের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে বললেন, 'বাবা আমি ভাল হয়ে গেছি।'

গুরুদেব প্রশান্ত হাসি হেসে বললেন, 'যা, আর তোকে নার্সিং হোমে যেতে হবে না। বাড়ি ফিরে যা। সত্যিই ভাল হয়ে গেছিস।'

মহিলাটি নিজেই হেঁটে চলে গেলেন। বালক ব্রহ্মচারী এবার আমাকে বললেন, 'তুই মাঝে মাঝে এখানে এলে এমনি আরও অনেক কিছুই দেখতে পাবি। এ-বার আমার উপর তোর বিশ্বাস জন্মেছে তো?'

বললাম, 'আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি। আর তা পেলেই বিশ্বাস জন্মাবে।

বালক ব্রহ্মচারীরবাবার একটু আগের কার্যকলাপগুলো সাজানো ব্যাপার হতেই পারে। রাস্তার কবজ বিক্রেতা থেকে স্টেজের জাদুকরেরা যেমন দর্শকদের মধ্যে নিজেদের সাজানো-লোক রেখে সাজানো ঘটনা ঘটিয়ে দর্শকদের অবাক করে দেন, অনেক গুরুদেবই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলে এই ধরনের নানা রকমের সাজানো ঘটনা দেখিয়ে চ্যালেঞ্জকারীকে তাক্ লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই পারেন।

আমি নিজেও ওই বয়সে কিছু ম্যাজিকের খেলা জানতাম। সেই মুহূর্তে আমাকে দিয়ে বিচার করে দেখলাম, এই ঘটনা আমিও দেখাতে পারি আমার সাজানো লোকদের সাহায্যে। কুশীতে আমি যে জল গরম হতে দেখেছি, সেটা কেমনভাবে ঘটাব, এটা অনেকেই হয়তো ভাবছেন। সেই দিনের সেই মুহূর্তগুলোতে আমি

ভেবেছিলাম, বালক-ব্রহ্মচারীকে কুশীতে জল আনতে বলেছিলেন। জল এসেছিল। কুশীটা ব্রহ্মচারী নিজেই মহিলার পিঠের উপর বসিয়ে ছিলেন। আমাকে যখন বলেছিলেন, 'দেখ তো জলটা গরম হয়েছে কিনা? আমি দেখেছিলাম জল গরম। ব্রহ্মচারীর কথায় সাধারণভাবে শতকরা প্রায় এক'শ জনেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক, জলটা ঠাণ্ডা ছিল। এখন গরম কি না দেখতে হবে। কিন্তু জলটা যে ঠাণ্ডাই আনা হয়েছিল তার প্রমাণ কী? এই ঘটনা কৌশলে ঘটাতে আমি কুশীতে গরমজল আনিয়ে একইভাবে কারুকে জলটা গরম হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করলে তিনিও ভুল করতেন এবং আমাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ধরে নিতেন।

এই ধরনের একটা জব্বর হতভম্বকর ঘটনা দেখানোর পরও আমার কাছ থেকে এই ধরনের উত্তর নিশ্চয়ই বালক ব্রহ্মচারীর কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। অন্তত তাঁর আচরণে আমার তাই মনে হয়েছিল। হয় তো বা ছিল কিছুটা দ্বিধাও।

এক সময় দ্বিধা কাটিয়ে বললেন, 'যা দরজাটা ভেজিয়ে দে।' দিয়ে এলাম।

ব্রহ্মচারীবাবা এবার নিজেই উঠে গিয়ে দেওয়াল-আলমারি খুলে একটা রাইটিং প্যাড ও পেনসিল নিয়ে এলেন। প্যাড আর পেনসিলটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আমাকে না দেখিয়ে এতে লেখ, কাল সন্ধে সাতটার সময় কোথায় ছিলি।'

লিখলাম — মধ্যমগ্রামে বিপুলদের বাড়িতে।

বালক ব্রহ্মচারী বললেন, 'প্যাডের কাগজটা ছিঁড়ে তোর হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রাখ।'

ধরে রাখলাম। তবে শক্ত করে নয়, আলতো করে। ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, 'এবার প্যাডটা নামিয়ে রেখে আমার দিকে পেছন ফিরে চোখ বুজে বোস।'

বসলাম।

ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, 'ভাবতে থাক, একটা সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে আছিস। একটু একটু করে সূর্য-উঠছে। গোটা আকাশ আর জলে প্রতিটি মুহূর্তে রঙের বৈচিত্র্য।'

আমি ভাবতে লাগলাম।

ব্রহ্মচারীবাবার একটি হাত আমার মাথার উপর দিয়ে এসে কপাল ছুঁল। কিছুক্ষণ পরে বাবা বলতে শুরু করলেন, 'দেখতে পাচ্ছি, তুই ছিলি একটা গ্রাম-গ্রাম জায়গায়। জায়গাটা মধ্যমগ্রাম। বাড়িটাও দেখতে পাচ্ছি। ঠাণ্ডা, শান্ত, খুব সুন্দর পরিবেশ।'

বললাম, 'সত্যিই সুন্দর, সত্যিই সুন্দর। মুলিবাঁশের দেওয়াল, মাটির মেঝে, টালির চাল। অদ্ভুত রকমের শীতল-শান্ত পরিবেশ।'

বাবাজী বললেন, 'হ্যাঁ, তাই দেখতে পাচ্ছি। একটা লাউ না কুমড়ো গাছ যেন ওদের বাঁশের দেওয়াল বেয়ে উঠেছে।'

আরও অনেক কিছুই বলে গেলেন উনি। কিন্তু ততক্ষণে গোরার গুরুর দৌড় আমার জানা হয়ে গেছে। কারণ, গতকাল দুপুর দুটো থেকে সন্ধে আটটা পর্যন্ত ছিলাম কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে। তারপর বাস ধরে নিজেদের দমদম পার্কের বাড়িতে। সে-বাড়িও বাবাজীর বর্ণনার ধারে-কাছে যায় না।

আমি কী লিখেছি বাবাজীর তা অজানা ছিল না। তাইতেই খুব সতর্কতার সঙ্গে একটু একটু করে বর্ণনা দিয়ে লক্ষ্য করছিলেন। কারণ জানা কথা, বর্ণনার সঙ্গে সামান্য মিলে গেলেই আমি আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠব এবং হুড়মুড় করে আরও অনেক তথ্যই তাঁকে যুগিয়ে যাব, যেমন জ্যোতিষীদের কাছে ভাগ্য জানতে আসা মানুষেরা করেন।

অনেকে হয় তো ভাবছেন, আমি কী লিখেছি, সেটা জানতে পারাও অলৌকিক ক্ষমতারই পরিচয়। না, আদৌ তা নয়। জাদুকরেরা অনেক সময় কার্বন পেস্টেড কাগজের প্যাডে দর্শকদের দিয়ে কিছু লিখিয়ে তলার কাগজে কার্বনের ছাপ দেখে বলে দেন কী লেখা হয়েছিল। আবার অনেক সময় সাধারণ প্যাডে হার্ড পেন্সিল দিয়ে কিছু লিখিয়ে তলার পাতাটায় পেন্সিলের সীসের গুঁড়ো ঘষেও বলে দেওয়া হয়, কী লেখা হয়েছিল। এ-ছাড়াও আছে অনেক পদ্ধতি।

আমি কফি হাউসে থেকেও ইচ্ছে করে লিখেছিলাম, মধ্যমগ্রামে; বিপুলদের বাড়িতে। কারণ, অলৌকিক ক্ষমতার বদলে কৌশলের আশ্রয় নিতে গেলে গুরুদেব ভুল করতে বাধ্য। আমার ফাঁদে পড়ে ভুল করতে বাধ্য হলেনও। আমি সামান্য একটু চালাকির আশ্রয় নিয়ে বিপুলদের বাড়ির যে বর্ণনা দিলাম, বালক ব্রহ্মচারীবাবাও সেই বর্ণনাতেই সায় দিয়ে গেলেন। অথচ বিপুলদের বাড়ি দস্তুরমতো পেল্লাই পাকা বাড়ি। সে সময়কার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ দেবজ্যোতি বর্মণের বাড়ির খুব কাছেই ছিল ওদের বাড়ি। অতএব বালক ব্রহ্মচারীবাবা যে কতবড় সিদ্ধপুরুষ এটুকু বুঝতে সেদিন আমার একটুও অসুবিধে হয়নি।

মেঠাইবাবার রহস্যভেদ

গত ৩ ও ৪ মে ১৯৯২ কলকাতার পত্রিকাগুলোয় 'মেঠাইবাবা'কে নিয়ে তোলপাড় করা খবর প্রকাশিত হল। খবরটা নানাভাবে প্রকাশিত হলেও মূল কথা ছিল একই। পুনে জেলার বারামতির এক সাধারণ কৃষক ভানুদাস গাইকোয়াড় সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞানীদের চোখে হয়ে উঠেছেন এক বিরাট বিস্ময়। তিনি যা ছুঁচ্ছেন তাই মিষ্টি হয়ে যাচ্ছে। বাঘা বাঘা বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা নানাভাবে পরীক্ষা করেও রহস্য উদ্ধার করতে না পেরে হতভম্ব। ব্যাপারটা নেহাতই বুজরুকি কি না তা দেখার জন্য সাবান এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দিয়ে হাত ধুইয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানী, চিকিৎসক এবং সাংবাদিকরা। কিন্তু তারপরও দেখা গেছে ভানুদাসের হাতের ছোঁয়ায় অতি ঝাল কাঁচালঙ্কাও নিমেষে যেন গুড়! সাবান দিয়ে হাত ধুইয়ে ভানুদাসের হাতে দেওয়া হয়েছিল স্টেনলেস স্টিলের একটি কলম। ভানুদাসের পরশ পাওয়ার পর কলমটিতে জিব ঠেকাতেই দেখা গেল কলমও মিষ্টি। এক গ্লাস জলে হাত ডোবালেই হয়ে যাচ্ছে সরবত।

ভারতবর্ষের বহু পত্র-পত্রিকায় মেঠাইবাবার এই অলৌকিক ক্ষমতার খবর প্রকাশিত হয়েছে। আর সেই সুবাদে তিরিশটির ওপর চিঠি পেয়েছিলাম বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে। এঁদের প্রত্যেকেরই চিঠির মূল সুর ছিল— এই রহস্য ভেদ করুন।

তথাকথিত অলৌকিক রহস্যের উন্মোচনের ক্ষেত্রে আমাদের সমিতির কাছে প্রত্যাশা আকাশছোঁয়া। তখন 'আজকাল' পত্রিকার সঙ্গে আমাদের সমিতির যুগলবন্দি দস্তুর মতো সাড়া ফেলে দিয়েছিল।

'আজকাল' পত্রিকার হয়ে সত্যানুসন্ধানে নামলাম। ২১ জুন হাওড়া থেকে গীতাঞ্জলি ধরলাম। ২২ জুন রাত ন'টা পঁয়তাল্লিশের গাড়ি পৌঁছল রাত ঠিক বারোটায়। বোম্বাইয়ের ভি টি স্টেশনে যুক্তিবাদী সমিতির বিধান নিয়োগী ছিলেন। বিধানের বাড়ি রাত্রিবাস করে পরের দিন সকাল বেলায় দাদার থেকে পুনের বাস

ধরলাম। পুনে পৌঁছতে লাগল পাক্কা পৌনে পাঁচ ঘণ্টা। সন্ধে ছ'টার আগে বারামতি যাওয়ার বাস নেই। অতএব তারই টিকিট কেটে হাতের ঘণ্টা দু'য়েক সময় খরচ করলুম একটা অটো রিকশায় শহর চষে। ছ'টার বাস ঠিক ছ'টাতেই ছাড়ল, অর্ধেক সিটের প্যাসেঞ্জার নিয়ে।

সময় নষ্ট না করে বারামতি শহরের ঠিক কোথায় মেঠাইবাবাকে পেতে পারি হদিশ পেতে বাসেই অনুসন্ধানের কাজ শুরু করে দিলাম। মেঠাইবাবার ঠিকানা জানেন কি না, আমার পাশের সীটের সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করতেই পিছনের সীট থেকে উত্তর পেলাম, 'গোরবাবার কাছে যাচ্ছেন? পত্রকার?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

সহযাত্রীর পরিচয় পেলাম। বসন্ত তুলপুলে। থাকেন 'গোরবাবা' অর্থাৎ মেঠাইবাবার ক্ষেতির কাছে, অবদুত নগরে।

বাস থেকে নেমে অটো রিক্সো নিলাম। মিস্টার তুলপুলেকে তুলে নিলাম অটোতে।

শহরের প্রান্তে একটা ছোট মুদির দোকানের কাছে এসে তুলপুলে ড্রাইভারকে বললেন অটো থামাতে। 'এখানেই আমার বাড়ি, তাই নামছি। আপনার সঙ্গে লোক দিয়ে দিচ্ছি, পৌঁছে দেবে।' বলে তুলপুলে দোকানে দাঁড়ানো একটি তরুণকে বলেন, 'ওঁরা সাংবাদিক। গোড়বাবা ভানুদাসের বাড়িটা ওঁদের দেখিয়ে দে।'

অটো ড্রাইভারের নাম বালু। আমাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা যা হচ্ছিল তাই শুনেই বালু খুব উৎসাহিত হয়ে গল্প জুড়ে দিলেন। নতুন সঙ্গীটির নাম শরদ গাইকোয়াড়। শরদের মুখে সব সময় কথার খই ফুটছে। কলেজে পড়েন। জানালেন, এক সময় এই এলাকার বহু মানুষই চুরি, ছিনতাই, প্রতারণা এমনি নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল। বর্তমানে অবশ্য অবস্থা অনেক পাল্টেছে। ভানুদাস গাইকোয়াড় হঠাৎ প্রচুর নাম-টাম করেছে, অনেকে এসে ভিড় জমাচ্ছে, এটাতে শরদ উত্তেজনা অনুভব করেন, গর্বও হয়। কিন্তু এই হঠাৎ করে গোড়বাবা হয়ে ওঠার পিছনে 'চমৎকার' বা অলৌকিক ক্ষমতার বদলে কোনও গভীর ধান্ধা আছে বলে শরদ সন্দেহ করেন। ভানুদাসের পরিবারের অতীত নিয়ে শরদের শ্রদ্ধার যথেষ্ট অভাব যে আছে, তা ওঁর কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠছিল বারবার।

ভানুদাস গাইকোয়াড়ের ক্ষেতের সামনে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত সাড়ে ন'টা। শক্ত পাথুরে রাস্তায় অটো রেখে আমরা এগোলাম। চষে ফেলা বিশাল ক্ষেতের মাঝখানে একটা ছোট বাড়ি। ঘরে ও ঘরের বাইরে ইলেকট্রিকের আলো।

বাইরের আলোটা জ্বলছে একটা ন-দশ ফুট উঁচু বাঁশের মাথায়। একটা খাটিয়ায় দু-একটি মানুষের ছায়া, দু-একজন আলোর সামনে ঘোরাঘুরি করছেন। এতদূর থেকে ঠিক দৃষ্টি চলে না। যে রাস্তায় অটোরিকশ দাঁড় করিয়েছি, তার আশেপাশে কোন আলোর পোস্ট নেই। শরদ বললেন, 'ভানুদাস আছে কি না জিজ্ঞেস করছি হাঁক পেড়ে।'

বললাম, আপনাকে হাঁকা-হাঁকি করতে হবে না। এতদূর যখন এসেছি তখন ভানুদাসকে না পেলেও ওঁর বাড়ি না দেখে, ওঁর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা না বলে আমরা যাচ্ছি না।'

তবু হাঁক পাড়লেন শরদ, 'ভানুদাস বাড়ি আছ? আমরা ক্ষেত ভেঙে এগোচ্ছিলুম। তারই মাঝে উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছিলেন শারদ। এক সময় সাড়া পাওয়া গেল, 'আছি। তোমরা কে?'

'আমি শরদ। কলকাতা থেকে সাংবাদিকরা এসেছেন তোমার অলৌকিক ক্ষমতা দেখতে।' আমরা ক্ষেত ভেঙে এগোচ্ছি। ছায়া-ছায়া মানুষগুলো নড়া-চড়া করছে, ঘরে ঢুকল কেউ কেউ। বেরিয়েও এল এক সময়। শরদ যাঁকে ভানুদাস বলে পরিচয় করালেন, তাঁর শরীর ও পোশাকের ওপর একবার চোখ বোলালুম। সদ্য পাট ভাঙা দুধ-সাদা টেরিনের প্যান্ট ও ধবধবে সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি। গায়ের রঙ কালো। সুঠাম মতই চেহারা। ঘন কালো তৈল চিক্কন চুল। ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটোর তীক্ষ্ণতা ও সতর্কতা আমাকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য করল — ভানুদাসকে 'ভোলা-ভালা আনপড়' কিষান ভাবলে এক ফুৎকারে উড়ে যাব। টেপরেকর্ডার চালু করে ভানুদাসের মুখের সামনে ধরে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলাম, ''আপনার নাম?'

— ভানুদাস মারুতি গাইকোয়াড়, গোড়বাবা।

— বয়স?

— একত্রিশ বছর। হিন্দি বলতে আমার একটু অসুবিধে হয়। মারাঠি ভাষায় বললে চলবে?

বিধানের মারাঠি ভাষায় জ্ঞান বাংলার মতই সাবলীল। বললাম, হ্যাঁ চলবে।

এমন একটা ভাষাগত সমস্যা হতে পারে অনুমান করে বিধানের হাতে একটা প্রশ্ন তালিকা ধরিয়ে দিয়েছিলাম পুনে থেকে বারামতি আসার পথেই।

প্রশ্ন শুরু করলেন বিধান, বাবার নাম?

— মারুতি সমঝ গাইকোয়াড়।

— মায়ের নাম?

— সত্যভামা মারুতি গাইকোয়াড়।

— আপনার পোস্টাল অ্যাড্রেস?

— ফল্টন রোড, কাসবা, পোস্ট - বারামতি, জেলা-পুনে।

— আপনি যে কোনও জিনিসে হাত লাগালে তা মিষ্টি হয়?

— হ্যাঁ, তা হয়।

— এই সময় আমি কিছু ছবি তুলে নিলাম মেঠাইবাবা, তাঁর স্ত্রী, ছেলে মেয়ে এবং মায়ের।

বিধান আবার প্রশ্ন শুরু করলেন, আপনার কাছে রোগীরা রোগ সারাতে আসে?

— হ্যাঁ, অনেকেই আসে।

— রোগীদের আপনি নিরোগ করতে পারেন?

— কেউ যদি মনে আশা নিয়ে আসে, তবে আমি রোগীর শরীরে হাত বুলিয়ে দিলে ভাল হয়ে যায়।

— কবে থেকে আপনি এমন ক্ষমতা পেলেন?

— ১৯৮১ সাল থেকে এই অবস্থা হচ্ছে।

— বিয়ে করেছেন কত বছর?

— দশ বছর।

— ছেলে-মেয়ে ক'টি?

— এক মেয়ে, দুই ছেলে।

— সংসার চলে কিভাবে?

— ক্ষেতি আছে। চাষ-বাস করি। তাতেই সংসার চলে।

— যারা রোগ সারাতে আসে, তাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা কিছু নেন?

— কোনও লোকের কাছ থেকেই পয়সা নিই না।

— পত্রিকার লোকেরা এই নিয়ে কতবার এলেন?

— অত মনে নেই। তবে, পত্রিকার লোকেরা বেশ কয়েকবার এসেছে। 'চিত্রলেখা' গুজরাটি ও মারাঠি দুটো ভাষায় বের হয়। দু'ভাষাতেই আমার সম্বন্ধে লিখেছে। এছাড়া 'ইন্ডিয়া টু ডে' 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' ও আমার সম্বন্ধে লিখছে। বালা-সাহেব ঠাকরের (শিবসেনা প্রধান) সঙ্গে আমার ছবিও বেরিয়েছে 'চিত্রলেখা'র মারাঠি সংস্করণে।

পত্রিকাগুলো দেখতে চাইলাম আমি। ওঁর বউ ঘর থেকে সেগুলো এনে

দেখালেন।

বিধান আবার প্রশ্ন শুরু করলেন, আপনার জন্মস্থান কোথায়?

— পুনে জেলার কাঁরোটিতে।

— দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে কখনও অংশ নিয়েছেন?

— না।

বললাম, জলে হাত ধুয়ে মিষ্টি করে দেখাবেন? ঘরের বাইরের উঠোনে একটা চৌবাচ্চার ভেতর মগ ডুবিয়ে জল তুললেন মেঠাইবাবা। মগের জল থেকে কয়েক ফোঁটা তুলে জিভে ঠেকালাম। সাদা জল। মেঠাইবাবা মগের জলে বার কয়েক হাত ঘসলেন। তারপর বললেন, 'এই জল নিয়ে জিভে রাখ।' রাখলাম। আমরা অনেকেই রাখলাম, আমি, বিধান। জল মিষ্ট হয়ে গেছে। আমরা বোম্বাই থেকেই লঙ্কা নিয়ে গিয়েছিলাম। লঙ্কাগুলো কলকাতার লঙ্কার তুলনায় খুবই নরম-ঝালের। একটা লঙ্কা মেঠাইবাবার হাতে তুলে দিলাম। মেঠাইবাবা লঙ্কায় বারকয়েক হাতের আঙুল ঘষলেন। তারপর আমার হাতে ফেরত দিয়ে বলেন, 'দেখুন, মিষ্টি হয়ে গেছে।' লঙ্কা চেটে দেখলাম, কড়া মিষ্টি, লঙ্কায় কামড় বসাতেই বুঝলাম লঙ্কা যেমন ঝাল ছিল, তেমনই আছে।

কয়েকজনকে লঙ্কায় কামড় বসিয়ে পরীক্ষা করতে বললাম। প্রত্যেকেই সহমত হলেন— লঙ্কা ঝালই রয়েছে। এবার মেঠাইবাবা আর একটা লঙ্কা চেয়ে নিয়ে সেটা ভেঙে তার শাঁসের ওপর হাতের আঙুল ঘসলেন বার কয়েক। তারপর লঙ্কাটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'এটা আগে মিষ্টি ও পরে ঝাল লাগবে।' আমি ও বিধান দুজনেই লঙ্কাটি ছিঁড়ে স্বাদ পরীক্ষায় রত হলাম। ও হরি, এ যে সামান্যক্ষণ মিষ্টি লাগার পরে, জিভের জলের ধাক্কাতেই মিষ্টত্ব বিদায় নিয়ে আবার ঝাল হয়ে গেল। মেঠাইবাবার শরীরের বিভিন্ন অংশে জিভ ঠেকালাম। কিন্তু প্রতিটি প্রতিবেদনে যা পড়েছি, তেমনটি তো নয়! মিষ্টি শুধু দু'হাতের আঙুল থেকে কনুই পর্যন্ত। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সারা শরীরই মিষ্টি থাকে বলে পত্রিকাগুলোয় পড়েছি, তাই তো? মেঠাই বাবা বললেন, 'হ্যাঁ'।

— তবে এখন কেন শুধু আঙুল থেকে কনুই পর্যন্ত মিষ্টি?

— সে আমি বলতে পারব না। মেঠাইবাবার জবাব।

একটা নিম সাবান নিয়ে গিয়েছিলাম। মেঠাইবাবার হাত ধোয়ার জন্যেই। সেটা বার করে বললাম, এটা দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন। মেঠাইবাবা দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ালেন। হাতে নিম সাবান। আমি জল ঢেলে দিতে লাগলাম। মেঠাইবাবা দু'হাত

কচলে সাবান মাখলেন হাতে। সাবানটা ছুড়ে, ফেললেন মাটিতে। তারপর আমার ঢালা শেষ জলটুকুতে হাতের তালু দুটি ধুয়ে দু-হাতের তালুই টেনে নিয়ে গেলেন দুই কনুই অবধি। ভেজা হাতের তালুতে কনুইতে লাগিয়ে রাখা মিষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে আবার সাবানটা এগিয়ে দিয়ে হাতের তালুতে ঘষতে বললাম, মেঠাইবাবা আবার একইভাবে সাবান ঘষলেন। সাবান ছুড়লেন এবং জল দিয়ে হাত ধোয়ার পর আবার দু'হাতের তালুই টেনে নিয়ে গেলেন প্রায় কনুই পর্যন্ত। ব্যাপারটা এমন সহজ সরল ও স্বাভাবিকভাবে ঘটাচ্ছিলেন যে, অন্য কারোরই একবারের জন্যেও মনে কোনও রকম সন্দেহের রেখা দেখা যাচ্ছিল না। আবারও সাবানে হাত ধুতে বললাম। এবং বললাম, আপনি হাত ধুয়ে কখনই হাতের তালু দুটো ওপরে তুলবেন না। আমার নির্দেশ মতই হাত ধুলেন এবার। এগিয়ে দিলাম একটা লঙ্কা। লঙ্কাটা ভেঙে ভিতরের শাঁসে বার দশেক ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা ঘষলেন। লঙ্কাটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'এবার খেয়ে দেখ।' লঙ্কার শাঁস চাটলাম। মিষ্টি নেই। উপস্থিত আরও কয়েকজনকে লঙ্কার স্বাদ গ্রহণ করে মতামত দিতে বললাম। তাঁরাও মতামত জানালেন — মিষ্টি লাগছে না। তাঁদের মতামতের সঙ্গে নাম, ঠিকানা ও পেশা জেনে নিয়ে ক্যাসেটবন্দি করলাম। মেঠাইবাবার মা অবশ্য মত প্রকাশ করলেন, 'মিষ্টি আছে।' ওঁর মত জানার সঙ্গে সঙ্গে আবার এই বিষয়ে কয়েকজনের মতামত গ্রহণ করি। তাঁরা আবারও জানালেন, 'একটুও মিষ্টি লাগছে না।' মেঠাইবাবার কাছে এগিয়ে দেলাম একটা স্টিলের ঘটি। মিষ্টি বাবা হাতে তালুতে বার বার ঘটি ঘষলেন কিন্তু মিষ্টি হল না। মেঠাইবাবাকে কেমন একটু অসহায় লাগছিল। মেঠাইবাবা বললেন, 'জল দাও, দেখ এক্ষুনি মিষ্টি করে দিচ্ছি।' এক ঘটি জল দিলাম। মেঠাইবাবা ঘটির জলে আঙুল ডুবিয়ে কিছুক্ষণ কচলালেন। তারপর বললেন, 'এবার দেখ'। আমরা জনে জনে জল তুলে মুখে দিলাম। মিষ্টি নেই। মেঠাইবাবা দক্ষ জাদুকরের মতই অস্বস্তিকর অবস্থাটাকে সামাল দিতে চাইলেন। বলেন, 'আমার মিষ্টি করার ক্ষমতা থাকে সকাল থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত। তাই এখন মিষ্টি হচ্ছে না।' মেঠাইবাবার মা সত্যভামা ছেলেকে এমনভাবে নাস্তানাবুদ হতে দেখে আমাদের ওপর রেগে আগুন হলেন। যথেষ্ট চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন 'সন্ধে ছ'টার পর আমার ছেলের মিষ্টি করার ক্ষমতা থাকে না। তোমরা গোলমাল পাকাতে এসেছ কেন?'

বললাম, 'তাহলে আপনার ছেলে এতক্ষণ জল থেকে লঙ্কা হাতের ছোঁয়ায় মিষ্টি করল কি করে?'

উত্তর দেওয়ার কিছুই ছিল না। সুতরাং আমার উদ্দেশে প্রবল বেগে প্রচুর গালি পাড়তে লাগলেন সত্যভামা।

সত্যানুসন্ধানে কৃতকার্য হতে গেলে সেন্টিমেন্টাল হলে চলে না। অতএব ওইসব গালাগাল আমার মস্তিষ্ককোষে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছিল না।

এইসব গোলমালের মধ্যে ভানুদাস হঠাৎই গর্জন করে আমার দিকে তেড়ে এলেন। বললেন, 'এই দেখ, আবার আমার মধ্যে মিষ্টি করার ক্ষমতা ফিরে এসেছে।'

আমার ঘড়ির কাচে ডান হাতের বুটো আঙুলটা ঘসে দিয়ে বললেন, 'চেটে দেখো।'

দেখলাম। সত্যিই মিষ্টি হয়ে গেছে। বললাম, 'সত্যিই মিষ্টি হয়ে গেছে। তাতে এটাই কিন্তু প্রমাণ হলো তোমরা মিথ্যে কথা বলো, এবং তা একটু বেশি মাত্রাতেই। সন্ধে ছ'টার পর তোমার মিষ্টি করার ক্ষমতা থাকে না বলে জানালে। তবে এত রাতে তুমি মিষ্টি করলে কি করে?'

গোড়বাবা মস্তানের মত তেরিয়া গলায় বললেন, 'তোমার ফালতু কথার জবাব দিতে চাই না। তোমার সন্দেহের জবাবে আবার প্রমাণ করলাম আমার মিষ্টি করার অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তোমার বিজ্ঞান কোনওভাবেই আমার এই ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে পারবে না।'

তারপরই নাটকীয়ভাবে আমাদের আশেপাশের শ্রোতা ও দর্শকদের কলম, ঘড়ি, চশমা হাতের পরশে মিষ্টি করতে শুরু করল। জনতা গোড়বাবার ক্ষমতায় হতচকিত। একটু আগে আমার হাজির করা যুক্তি ম্যাজিক-আবেগের চোরাবালুতে ডুবতে শুরু করেছে। আর সময় দিলে গোটা ব্যাপারটাই নাগালের বাইরে চলে যাবে। পকেট থেকে বের করলাম অ্যাবসিলিউট অ্যালকহলের শিশি। অ্যালকহলে ওর আঙুলগুলো ভাল করে ধুইয়ে দিলাম। সঙ্গে ধুয়ে গেল ওঁর আঙুলে লেগে থাকা মিষ্টি করার রাসায়নিক পদার্থ। তুলোয় অ্যালকহল ঢেলে সেই তুলো দিয়ে ঘসে ঘসে মুছলাম ওর আঙুলগুলো। এবার উপস্থিত সকলের উদ্দেশে বললাম, 'আপনারা একে একে আসুন। ওর আঙুলে জিব ঠেকিয়ে দেখুন, মিষ্টি লাগছে কি না?'

আমি মিঠেবাবার ডান হাতের কব্জিটা ধরে আছি। বিভিন্ন মানুষ এগিয়ে এসে আঙুলে জিব ঠেকিয়ে জানিয়ে যাচ্ছেন, মিষ্টি নেই। আমি তাঁদের মতামত নাম-ঠিকানাসহ জানতে চাইছি। আমাদের কথোপকথন ক্যাসেট বন্দি করে রাখছিলেন

বিধান। মেঠাইবাবার মধ্যে আবার আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখতে পেলাম।

'এমন ধরনের হঠাৎ হঠাৎ হাত মিষ্টি হচ্ছে আবার হচ্ছে না কেন বলুন তো?'

'তার আমি কি জানি।' আমার প্রশ্নের উত্তরে মিঠেবাবার তেড়িয়া জবাব।

'আগে কোনও সাংবাদিকদের সামনে আপনার শরীর এমন অদ্ভুত ব্যবহার করেছে?'

'না।'

'আজই প্রথম করল?'

'হ্যাঁ।'

'সবটাই কেমন রহস্য, তাই না! শরীরের কিছুটা অংশ মিষ্টি। তাও আবার মাঝে মাঝে থাকছে না কেন বলুন না ভাই?'

ক্ষেপে উঠলেন মেঠাইবাবা, 'আমি জানি না। অনেক ডাক্তার দেখেছে, তারাও কারণ বের করতে পারছে না।'

'কোন্ কারণটা বের করতে পারছেন না? আপনার শরীর কেন মিষ্টি? নাকি, আপনার গোটা শরীরের মধ্যে দুই কনুই থেকে হাতের আঙুল পর্যন্ত শুধু মিষ্টি কেন? নাকি, হাত ঠিক-ঠাক ধুয়ে-মুছে দিলে মিষ্টি কেন পালিয়ে যায়?'

আমার কথায় মজা পাচ্ছেন জনা পনেরো মানুষ, যারা মিঠেবাবার পরিবারের কেউ নয়। ওরা হাসছে, টিপ্পনি কাটছে। ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'গোড়বাবার ভাণ্ডা ফোড়।' আমার ওপরই ক্ষেপে উঠলেন মেঠাইবাবা, 'সমস্ত পত্রকাররা আমার চমৎকারকে সম্মান জানিয়েছেন। শুধুমাত্র তুমি আমাকে অসম্মান করলে। এর পরিণাম খুব খারাপ হবে।'

মেঠাইবাবার মেজাজ ঠাণ্ডা করতে বিধান কথা ঘোরালেন।

— কবে থেকে আপনি জানতে পারলেন, আপনার ছোঁয়া পেলেই সব মিষ্টি হয়ে যাচ্ছে?

— '৮১ সালের ঘটনা। দিনের বেলায় শুয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে যেখানেই হাত দিতে শুরু করলাম, মিষ্টি লাগতে লাগল। জল খাচ্ছি, সবই মিষ্টি লাগছে, রুটি খাচ্ছি, তাও মিষ্টি।

— সেদিন দুপুর বেলায় যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন কোনও স্বপ্ন দেখেছিলেন কী? জিজ্ঞেস করলাম।

— না স্বপ্ন কিছু দেখিনি।

— আপনার হাতই শুধু মিষ্টি?

— না, না, আমার সারা শরীরই মিষ্টি। অনেকেই পরীক্ষা করে দেখেছে।

— গোড়বাবা (গুড়বাবা) নামটা কে দিল?

— পেপারওয়ালারা।

মেঠাইবাবার মা তখনও গজগজ করছিলেন, 'তোমরা ঝামেলা পাকাতে এসেছ। মনে রেখ, ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী। ওকে মারবে এমন শক্তি কারও নেই। ওর ক্ষতির চেষ্টা করলে .....।' কথা শেষ করতে পারলেন না। ক্ষেত ভেঙে দু'টো বিশাল মোটরবাইক গুরুগম্ভীর আওয়াজ তুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। সত্যভামা স্বস্তির নিঃশ্বাস পেলে বললেন, 'ওর ডাক্তার আসছে। ছবি তুলতে যেতেই তীব্রভাবে বাধা দিলেন দু'জনেই। মোটরবাইক আরোহী দু'জনই বয়সে তরুণ। বয়স বছর পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি হবে। প্রথমেই যিনি আমার মুখোমুখি হলেন, তাঁর উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চির মত। তিনি কিছু প্রশ্ন করার আগেই টেপ রেকর্ডারটা তাঁর মুখের কাছে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার নাম?'

— ডাক্তার আটোডে কে. বি। বারামতিতে এগার বছর ধরে প্র্যাকটিস করছি অ্যালোপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ।

— মেঠাইবাবা কি আপনার অধীনে চিকিৎসাধীন আছেন?

— এগার বছর ধরেই ভানুদাসজি আমার চিকিৎসায় আছেন। কিন্তু আমি কিছুতেই সমতায় আনতে পারছি না। আমার দৃঢ় ধারণা এটা 'মিরাকেল'।

— এমনটা কেন মনে হল আপনার?

— আমরা এটাকে বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখা করতে পারছি না। যার জন্যেই মনে হচ্ছে এটা একটা স্পিরিচুয়াল ব্যাপার।

— আপনার ক্লিনিকের ঠিকানা?

— ডাক্তার আটোডে কে. বি. করলা ক্লিনিক, ইন্দাপুর চক, বারামতি। জেলা - পুনে। পিন্ - ৪১৩ ১০২।

এবার অন্য মোটরবাইক-আরোহীর কাছে এগিয়ে দিলাম টেপরেকর্ডার। আপনার নাম?

— ডাক্তার সোনে জাক্তা।

— মেঠাইবাবার এই অদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

— যা ডাক্তার আটোডে বললেন, তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ সহমত।

— আপনার ঠিকানা?

— অবধূত নগর, পোস্ট-বারামতি, জেলা পুনে।

— আপনি কি আয়ুর্বেদ কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করেছেন?

— হ্যাঁ। আমি ও ডাক্তার আটোডে দু'জনেই আয়ুর্বেদ কলেজ থেকে বি এম এস পাস করেছি।

— আপনি তো তবে গাছ-গাছড়ার নানা চরিত্র, নানা গুণ এবং অদ্ভুত সব ফলাফল সম্পর্কে ভালমতই ওয়াকিবহাল। আপনার কি একবারের জন্যেও মনে হয়নি ভানুদাস কোনও গাছ-গাছড়ার সাহায্যে ভানুদাস মেঠাইবাবা সেজে বসতে পারেন?

— দশ বছর ধরে আমি ডাক্তার আটোডের সঙ্গে ওকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে আসছি। আমার একবারের জন্যেও তা মনে হয়নি। আমিও এর পেছনে বিজ্ঞানসম্মত কোনও কারণ খুঁজে পাইনি। আমার মনে হয় ও একজন সিদ্ধপুরুষ। মনে রাখবেন, অনেক রোগীও কিন্তু বিশ্বাস নিয়ে মেঠাইবাবার কাছে এলে মেঠাইবাবার হাতের ছোঁয়ায় রোগমুক্তও হন।

মেঠাইবাবা লঙ্কা ভেঙে শেষবারের মত লড়াই জেতার জন্য লঙ্কায় অনেকক্ষণ হাত ঘষলেন। লঙ্কাটা আমার হাতে দিতে সেটা আটোডের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'এখন লঙ্কা মিষ্টি লাগছে কী?'

— 'না মিষ্টি লাগছে না।' ডাক্তার আটোডের এই উত্তর শুনে তাঁর কাছে অভিযোগ করার মত করে মেঠাইবাবা বললেন, 'ওরা কি দিয়ে আমার হাত ধুইয়ে দিল। তারপরই আর কিছু মিষ্টি করতে পারছি না।' মেঠাইবাবার কথা শুনে ডাক্তার আটোডে প্রচণ্ডরকম ঘাবড়ে গেলেন। অনেক আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন, 'এর আগে আমরা এবং অনেক সাংবাদিকরাই বারবার ওর হাত সাবান দিয়ে ধুইয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। ওর শরীরের মিষ্টি কিছু মাখানো থাকলে ধরা পড়তই। কিন্তু এখন কেন এমনটা হচ্ছে? ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এগার বছরে এই প্রথম দেখলাম ওর শরীরের স্বাভাবিক মিষ্টত্ব চলে গেছে। ঠিক এই অবস্থায় ওর শারীরিক অবস্থার একটা 'থরো চেক্-আপ'-এর প্রয়োজন ছিল।' ডাক্তার আটোডে এবার মেঠাইবাবাকে বললেন, 'আপনি একবার ঘরে চলুন। এই অবস্থায় আপনার হার্ট নর্মাল বিহেভ করছে কি না একবার দেখা খুবই জরুরি।'

দু'মিনিটের মধ্যেই মেঠাইবাবা ও ডাক্তার আটোডে বেরিয়ে এলেন। আমি ডাক্তার আটোডেকে বললাম, 'মেঠাইবাবার নাড়ি-নক্ষত্র তো আপনার জানা। আপনি কি এমন কখনও দেখেছেন দিন বা রাতের কোনও বিশেষ সময়ে ওঁর শরীর মিষ্টত্ব হারায়?'

— না, তেমন কখনও ঘটেনি।

— কিন্তু আজই তেমনটা ঘটেছে। সাক্ষী এখানে হাজির সকলেই। ও হাতের ছোঁয়ায় এখন কোনও কিছুই মিষ্টি করতে পারছেন না। এমনটা না পারার কারণ হিসেবে ভানুদাস বললেন — সন্ধের পর নাকি ওঁর মিষ্টি করার ক্ষমতা থাকে না। আর আপনি বলছেন রাতেও মিষ্টি করার ক্ষমতা ওঁর আছে। আপনার এই সুচিন্তিত মতামত নিশ্চয়ই ভানুদাসের ওপর দীর্ঘ পরীক্ষার পরই দিয়েছেন। আজ ভানুদাস আমাদের কাছে পরীক্ষায় কেন বারবার ফেল করছেন?

— এই তো প্রথম ফেল করল। কেন ফেল করল, পরীক্ষা না করে জানাই কি করে?

— আপনি ওঁর শরীর পরীক্ষা করে অস্বাবাবিক কিছু লক্ষ্য করলেন?

— হার্ট-বিট একটু বেশি হচ্ছে। সম্ভবত আপনাদের উল্টোপাল্টা প্রশ্নে নার্ভাস হয়ে এমনটা হয়েছে।

মেঠাইবাবা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে দেখ, দেখ আমার আঙুলে জিভ ঠেকিয়ে দেখ, দারুণ মিষ্টি হয়ে গেছে।'

ডাক্তার আটোডে মেঠাইবাবার আঙুলে জিভ ঠেকিয়ে আমাকে বললেন, 'দেখুন চেটে।' দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে ধীর, গম্ভীর, শীতল গলায় বললাম, এখন যে মিষ্টি হবে এ আমি জানি। একটু আগেই মেঠাইবাবা বলেছেন — সন্ধে ছ'টার ওপর নাকি ওঁর শরীর মিষ্টি থাকে না। তাহলে এখন আবার মিষ্টি হচ্ছে কেন?' ডাক্তার আটোডে আমার কথায় প্রচণ্ড রকম ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'আপনাদের কোনও কথার উত্তর দেওয়ার আগে জানতে চাই আপনি কে?' আমার একটা ভিজিটিং কার্ড ওঁর হাতে দিলাম। বার কয়েক মনোযোগ দিয়ে কার্ডে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'ও আপনিই র‍্যাশানলিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রবীর ঘোষ? কিন্তু আমি যে শুনলাম সাংবাদিকরা এসেছেন ইন্টারভিউ নিতে! আপনি প্লিজ টেপটা বন্ধ করুন।' আমাদের অবস্থাটা তখন সপ্তরথী ঘেরা অভিমন্যুর মতই। উপস্থিত কারও হাবভাবই তেমন সুবিধের ঠেকছে না। আটোডের 'প্লিজ' কথাটাও বেরিয়ে এসেছে তীব্র ধমক হয়ে। টেপ বন্ধ করলাম। 'আপনি পরিচয় গোপন করেছেন কেন?' আটোডে 'চার্জ' করলেন। আমি বললাম, পরিচয় তো গোপন করিনি। কলকাতার 'আজকাল' পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবেই এসেছি। এরপর আরও এমন অনেক কথাই তিনি বলেছেন যা ক্যাসেটবন্দি নেই বলে এখানে হাজির করলাম না। তবে এটুকু বলতেই পারি, কথাগুলোর মধ্যে ছিল প্রচ্ছন্ন হুমকি, ভীতি প্রদর্শনের

সুর। এরপরই আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তীব্র মিষ্টি সৃষ্টি করার মত গাছের খবর আমার জানা আছে কি না। এবার টেপরেকর্ডার চালু করেই বলেছিলাম, 'গত সপ্তাহেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম হদিস করতে। ভারতের বিশিষ্ট রসায়ন বিজ্ঞানী ডঃ অসীমা চ্যাটার্জি বেশ কয়েক ঘণ্টা ব্যয় করে এই বিষয়ে বহু তথ্য হাজির করেছিলেন। ডালসিটল (Dulcitol) স্টেভিওসাই (Stevioside) এর মত অনেক 'প্ল্যান্ট প্রোডাক্ট'-এর খবর পেয়েছি মার্ক ইনডেক্স-এর টেন্‌থ এডিশন থেকে। এ-সবেরই মিষ্টত্ব চিনির থেকে ৩০০ গুণ বেশি। এই গাছের সাক্ষাৎ কলকাতায় কোথায় পাওয়া যাবে, তার হদিসও উনিই দিয়েছিলেন।'

'আপনি যে সব গাছের কথা বলেন, সেসব গাছের কথা ওঁর মত আনপড় জানবে কি করে?' ডাক্তার আটোডে প্রতিপ্রশ্ন ছুড়লেন। 'কি করে জানবে, সেটা কোনও প্রশ্নই এখানে হতে পারে না। এ-ধরনের বহু গাছের বাস্তব অস্তিত্ব যখন আছে, আমাদের দেশেই আছে এবং তার খোঁজ অনেক রসায়ন বিজ্ঞানী, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের অজানা নয়, তখন এই গাছে খোঁজ পাওয়ার সম্ভাবনা মেঠাইবাবার ক্ষেত্রে থেকেই যাচ্ছে। হয় কেউ জানিয়েছে, অথবা হঠাৎই জেনে ফেলেছে।'

ডাক্তার আটোডে বললেন, 'কিন্তু ওঁর ক্ষেত্রে এর কোনওটাই হয়নি।' বললাম, 'আপনি আগেই জানিয়েছেন ভানুদাসের এমন অদ্ভুত ক্ষমতার রহস্য জানতে, সত্য জানতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন দীর্ঘ বছর ধরে। সত্য জানতে গেলে খোলা মনের হতে হয়। আগের থেকেই যদি সিদ্ধান্তে পৌঁছেই থাকেন, তবে সত্য কোনওদিনই ধরা দেবে না। ওর শরীর স্বয়ং মিষ্টির আধার নয়। ও শরীরে তীব্র মিষ্টি মেখে রাখে বলেই সেই তীব্র মিষ্টির সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন বস্তু মিষ্টি হয়ে যায়। আর তাই মিষ্টির শত্রু তেতো সাবান দিয়ে হাত ধোয়ালেই মিষ্টি করার ক্ষমতা বিদায় নিচ্ছে। শরীরে তাও যেটুকু মিষ্টি থাকে, তাও দূর করা যায় অ্যাবসলিউট অ্যালকহল, স্পিরিট জাতীয় কোনও কিছু দিয়ে ভাল মত ঘষে। এখন ও যে আবার মিষ্টি করার ক্ষমতা ফিরে পেল, এই ক্ষমতা এক্ষুনি বন্ধ করে দিতে পারি ওই একই পদ্ধতিতে। বাস্তবিকই আপনাদের সত্য জানার আগ্রহ থাকলে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন।'

ডাক্তার আটোডে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার বক্তব্যকে এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'এখন যদি ও জল মিষ্টি করে দেয়, কি বলবেন?' বললাম, 'ঠিক মত হাত ধুইয়ে

দিলেই ও কোনও ভাবেই মিষ্টি করতে পারবে না। ঠিক আছে আপনি জল আনুন, মার্গো সোপ ও অ্যালকহল দিয়ে আমি ওর হাত সাফ্ করে দিচ্ছি। এরপর আপনারা প্রত্যেকেই দেখুন কি হয়?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনার ও-সব পরীক্ষা দেখতে চাই না। টেপটা বন্ধ করুন।' বললেন ডাক্তার আটোডে। টেপ বন্ধ হল। জল এল ঘটিতে। মেটাইবাবা জলে হাত ডোবালেন। তারপর নিজের মুখে কিছুটা জল ঢেলে মেঠাইবাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এখন মিষ্টি হয়ে গেছে।' বললাম, 'দেখার কিছু প্রয়োজন নেই। আমি জানি কি করে এটা হচ্ছে।' দুই ডাক্তার, মেঠাইবাবা ও কয়েকজন দাবি জানালেন, 'আপনাদের জল খেতেই হবে এবং জানাতে হবে মিষ্টি লাগছে কি না। যতক্ষণ না জানাচ্ছেন, আপনাদের ছাড়াই হবে না।'

বললাম, 'খুব ভুল করছেন। আমাদের আজ এখানে আসার খবর পত্রিকা ও আপনাদের বারামতি থানার জানা আছে।' আমরা রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যে বারামতি থানায় হাজির না হলে ওঁরাই এখানে এসে হাজির হবেন, এমনটাই কথা আছে। এখন সাড়ে দশটা বাজে। আজকের মত বরং বিদায় নিই। কাল দশ-এগারটা নাগাদ আমরা আসব, আবার পরীক্ষা নেব।'

ডাক্তার আটোডে আমাদের অটোরিকশর ড্রাইভার বালুকে বললেন, 'তুমি ওঁদের হোটেলে ঢুকিয়ে আমাকে খবর দিও, কোন হোটেলে আছেন। সকালে আমরাই ওঁদের হোটেল থেকে তুলে নেব।' এবার অটোয় ফিরে চললাম। আমাদের সঙ্গী হলেন শরদ গাইকোয়ড়।

শরদ শঙ্কা প্রকাশ করলেন, ওঁদের ওপর হামলা হবে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কারা হামলা করবে?' শরদ হঠাৎই মুখ বন্ধ করলেন।

ভোর হওয়ার আগেই আমরা থানায় হাজির হয়েছি। ওরা হোটেল থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার আগেই আমরা থানায় গিয়ে সাহায্য চেয়েছি। বলেছি, 'আপনাদের সামনেই প্রমাণ করে দেব ভানুদাস স্রেফ একজন প্রতারক। তাকে প্রতারণায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করছে ডাক্তার আটোডে ও ডাক্তার সোনি জাক্‌তা। কাল ওরা আমাদের জোর খাটিয়ে ভানুদাসকে অলৌকিক ক্ষমতাধর বলে সার্টিফাই করাতে চাইছিলেন। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন একটি প্রতারণা ধরতে। আপনাদের সাহায্য ছাড়া বুজরুকি ধরতে গেলে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। কাল রাতেই একবার বুজরুকি ধরেছি। এখন ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে আপনাদের সামনে

ওদের প্রতারণা হাতে-নাতে প্রমাণ করতে চাই।'

ডিউটি অফিসার হাই তুলতে তুলতে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দিয়ে বললেন, 'ভানুদাসজি আমাদের বারামতির গর্ব। ওর বিরুদ্ধে কিছু করা মানে পাবলিক সেন্টিমেন্টে আঘাত করা। তাছাড়া ভানুদাসজির পেছনে বড় রাজনীতিকদের সাপোর্ট আছে। আপনারা পত্রকার বাঙাল মুল্লুক থেকে এসেছেন, আপনাদের ভালোর জন্যেই বলছি, ভোরের বাস ধরে পুনে চলে যান।'

যুক্তির মুখে হেরে যাওয়ার মুহূর্তে প্রতিটি অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারকেই দেখেছি গায়ের জোর ও ভীতিপ্রদর্শনের পথ বেছে নিতে। এদের সঙ্গে পুলিশ ও রাজনৈতিক আঁতাত এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। ফর্মুলাটা প্রায় একই রকম সব সময়ে।

১২ জুলাই ১৯৯২ আজকাল পত্রিকার 'রবিবাসর' পাতায় দু-পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হল 'মেঠাইবাবার রহস্যভেদ'।

১৯৯৬-এর গোড়ায় গোড়বাবা আবার সংবাদপত্রের শিরোনামে এলেন। মহারাষ্ট্রের 'অন্ধ বিশ্বাস নির্মূলন সমিতি' নাকি পাঁচ লক্ষ টাকা চ্যালেঞ্জ করে চ্যালেঞ্জ হেরেছে। খবরটা কলকাতার 'Asian Age'-এর প্রথম পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। সঙ্গে ছিল গোড়বাবা ভানুদাসের ছবি।

ফোন পেলাম দুই সাংবাদিক অদিতি রায়ঘটক ও অভিজিৎ দাশগুপ্তের। তাঁরা জানতে চাইলেন, গোড়বাবার চ্যালেঞ্জ নিতে রাজি আছি কি না। থাকলে লিখে জানাতে। লিখেই-দু-জনকে জানালাম, বাড়তি জানালাম Asian Age-এর নিউজ এডিটর দিব্যজ্যোতি বসু'কে। জানালাম বোম্বাই বা দিল্লিতে 'প্রেস কনফারেন্স' ডেকে সাংবাদিকদের সামনে গোড়বাবার মুখোমুখি হতে চাই। হারলে দেব দেড় লক্ষ টাকা। প্রেস কনফারেন্স এবং দুই সঙ্গীসহ গোড়বাবার যাতায়াত ও হোটেল খরচ বহন করব। গোড়বাবা হারলে তাঁকে শুধু প্রেস কনফারেন্স এবং তাঁদের যাতায়াত ও থাকা খাওয়াবাবদ খরচগুলো 'অন স্পট' ফেরত দিতে হবে। এখন গোড়বাবা আমার মুখোমুখি হতে চাইলেই হয়।

গোড়বাবা আমার মুখোমুখি হওয়ার সাহস দেখাতে চাননি। আর একবার সাংবাদিকদের সামনে পরাজিত হওয়ার মত বোকা নয় বলেই মুখোমুখি হয়নি। তবে ওর জন্য পূর্ব শর্ত খোলা রাখলাম।

হাড় ভাঙার দৈব-চিকিৎসা

নদীয়া জেলার খাজুরি গ্রাম ভাঙা হাড় জুড়ে দেওয়ার দৈব চিকিৎসার জন্য বিখ্যাত। কৃষ্ণনগর থেকে বাসে ৩৫ মিনিটের পথ। বাসস্টপ ঘাটেশ্বর। এখানে নেমে হাঁটা পথে মিনিট দশেক এগুলেই খাজুরি। প্রতি মঙ্গল-শুক্কুরেই কাক-ভোর থেকে হাড়-ভাঙা রোগীরা এসে ভিড় জমান। দূরের রোগীরা অগের দিন রাত্রিবাসও করেন। অলৌকিক চিকিৎসকদের বারান্দায়।

আজকাল পত্রিকার হয়ে খাজুরি যাই ১৯৯৪-এ। তখন খাজুরি গ্রামে ৬ জন ভাঙা হাড় জুড়ে দেওয়ার অলৌকিক চিকিৎসক বা দৈব চিকিৎসকের বাস। এঁরা হলেন খয়ব্বর হালসনা, কাসেৎ মণ্ডল, শেখ এস্তার, আকবর শেখ, জান আলি শেখ ও দিদার শেখ। খয়ব্বর ছাড়া বাকি পাঁচ জনের দাবি, এঁরা মন্ত্র পেয়েছেন আল্লার কাছ থেকে। খয়ব্বর মন্ত্র পেয়েছেন বাবার কাছ থেকে। বাবা মন্ত্র পেয়েছিলেন ঠাকুরদার কাছ থেকে। আল্লা স্বপ্নে মন্ত্র দিয়েছিলেন ঠাকুরদাকে। খয়ব্বরের ঠাকুরদাই এই গ্রামের প্রথম হাড় জোড়ার দৈব চিকিৎসক।

খয়ব্বর গ্রামের সবচেয়ে নামী ও দামী চিকিৎসক। বয়স পঞ্চান্ন। নিরক্ষর। স্বাস্থ্যবান, চালাক-চতুর। হাড় জোড়ার কাজ করে নিজের জমানায় দোতলা বাড়ি, চাষের জমি, পুকুর, মাছ চাষ, মটোর সাইকেল — সবই করেছেন। পাঁচ মেয়ের ধূমধাম করে বিয়ে দিয়েছেন। দুই ছেলের একজন জমি-জমা দেখাশুনো করেন। অন্যজন দৈব চিকৎসায় বাবাকে সাহায্য করেন। রোগী দেখার সময় সকাল ছ'টা থেকে নটা তিরিশ। ফি ৬০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত। হাড় ভাঙার রকম ফের অনুসারে। খয়ব্বর অবশ্য গ্রামের আর পাঁচ দৈব চিকিৎসকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'আল্লার কাছ থেকে মন্তর পাওয়া অতই সোজা নাকি? আসলে আল্লার দয়ায় আমাদের পরিবারের রমরমা দেখে রোজগারের ধান্ধায় ওরা সব গপ্পো ফেঁদেছে। ওদের নিয়ে আমি আর বেশি মুখ খুলতে চাই না।'

খয়ব্বরের মতামত শুনে আর পাঁচজন দৈব-চিকিৎসক ক্ষোভে ফেটে পড়েছে,

'আল্লা ওর ঠাকুরদা আর ওর কেনা গেলাম নাকি? আল্লা ওর ঠাকুরদাকে দৈব ওষুধ বাৎলাতে পারলে আমাদের বাৎলাতে অসুবিধে কোথায়? এরকম মন ভরা হিংসে নিয়ে কখনও আল্লার কৃপা পাওয়া যায়? ফল তো ফলছে হাতে হাতে। ও কত হাড় ভাঙা রোগীর বারোটা বাজিয়েছে জানেন? ভীষণ লোভী। গরিব রোগীদেরও জোঁকের মতো শুষতে ওর বিবেকে বাধে না।'

অন্য পাঁচ দৈব চিকিৎসক অবশ্য খয়ব্বরের তুলনায় খুবই সস্তায় চিকিৎসা করে। এঁদের ফি ৬০ টাকা থেকে ১৫০ টাকার মধ্যে। সবচেয়ে কম নেন আকবর শেখ। ২১ টাকা থেকে ৯০ টাকা। তবে সকলেরই রোগী দেখার দিন মঙ্গল-শুক্কুর। রোগী দেখার সময় সকাল। অন্যান্য দিন বাড়িতে বা চেম্বারে রোগী দেখেন না বটে, তবে 'কল' পেলে রোগী দেখতে যান।

কি ভাবে হাড় জোড়া লাগে? এ-বিষয়ে খয়ব্বর থেকে আকবর সকলেরই এক সুর, 'আল্লা জোড়েন, আল্লাই জানেন। আমি কে? আল্লা করাচ্ছেন, আমি করছি।'

দৈব চিকিৎসা পদ্ধতিটি বিচিত্র। রোগীকে আনতে হয় ২০০ গ্রাম চাল বা ২০০ গ্রাম চালের ভাত, দশ হাত লম্বা শাড়ির পাড় ও এক শিশি তিসির তেল। যাঁরা দূরের যাত্রী, তাঁরা চাল আনেন। ভোরের আলো ফোটার আগেই ভাত ফুটিয়ে নেন। অলৌকিক চিকিৎসক বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে প্রয়োজনে আন্দাজমতো হাড় সেট করে ভাঙা জায়গাটা লতা দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে দেন। নির্দিষ্ট কোনও লতা এঁরা ব্যবহার করেন না। ক্ষেতের আশে-পাশে ঝাড়ে-জঙ্গলে গজিয়ে ওঠা যে কোনও লতাই ডাল পাতা বাদ দিয়ে কাজে লাগান। লতার বাঁধনের উপর ভাত চট্‌কে তৈরি মণ্ড চাপান হয়। তারপর শাড়ির পাড় জড়িয়ে ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হয়। বাঁধা শেষ হতে তিনবার ফুঁ দিয়ে ঘড়ি দেখে সময়টা জানিয়ে দেওয়া হয় রোগী বা তার সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীকে ঘড়ি ধকে ২৪ ঘণ্টা পরে ওই সময়ই ব্যান্ডেজ খোলা শুরু করতে হবে। ২৪ ঘণ্টাতেই হাড় জুড়ে যায় — দাবি ছয় অলৌকিক চিকিৎসকেরই। তিসির তেলেও মন্ত্র পড়ে দেন। পেঁয়াজের রস, থানকুনি পাতার রস ও নুন মন্ত্র-পড়া তেলের সঙ্গে মিশিয়ে তিন বেলা মালিশ চালাতে হবে ১ মাস থেকে ৩ মাস পর্যন্ত। জোড়ালাগা ভাঙা অঙ্গ আগের মতই সুস্থ সবল হয়ে উঠবে।

যে-দিন গিয়েছিলাম সেদিন ছিল নদীয়া বন্‌ধ। রোগীর ভিড় তাই তেমন জমেনি। তাও খয়ব্বরের বাড়ির বারান্দায় কাল রাত কাটিয়েছেন জনা কুড়ি নারী-পুরুষ। সকালে হেঁটে ও সাইকেলে আরও জনা কুড়ি লোক এসেছেন। চাকদার গোরাচাঁদতলার বাসিন্দা যশোদাবালা, চাকদার ছাতিমতলার মীরা মণ্ডল, পাথুরিয়া

গ্রামের রামজন শেখ, তারকনগর গ্রামের চিন্তামণি ভৌমিক, বানপুরের বিজন সরকার — এঁদের প্রত্যেকের কথাতেই বেরিয়ে এলো অলৌকিক চিকিৎসার প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস — হাড় জুড়বেই। হাড় না হয় জুড়বে; কিন্তু তা ভাঙা হাড়, না জোড়া হাড়? সেখানেই একটা বিরাট প্রশ্ন! কারণ এঁদের প্রায় কেউই এক্স-রে করেননি। অতএব নিশ্চিত নন — মচকেছে, কি ভেঙেছে। মচকালে, এমনকি হাড়ে, সামান্য চিড় ধরলে আধুনিক চিকিৎসকরা ক্রেপ-ব্যান্ডেজ বেঁধে রাখতে উপদেশ দেন দিন কয়েকের জন্য। তাতেই কাজ হয়। দৈব চিকিৎসকের চিকিৎসায় ওইটুকু কাজই হতে পারে মাত্র। পাথরদহের আসান আলি মণ্ডল ১০ বছরের ছেলে সাকিবলকে নিয়ে এসেছেন। তিনিই শুধু এক্স-রে করিয়েছেন। এক্স-রে ফিল্ম অবশ্য সঙ্গে আনেনি। কারণ এইসব অলৌকিক অস্থি-বিশেষজ্ঞদের এক্স-রে ছবি দেখার প্রয়োজন হয় না, সাকিবুলের হাত ভেঙেছে। প্লাস্টার করলে দু-তিন মাসের ধাক্কা। ২৪ ঘণ্টাতেই ভাঙা হাড় জোড়ার হদিস জানার পর কে যাবে ফালতু ডাক্তারদের কাছে? তা এখানে হয় তো খরচটা একটু বেশি পড়লো। বারো'শ দিতে হচ্ছে।

মহেন্দ্র সাহা, ক্ষয়া চেহারার তিরিশের যুবক। থাকেন কৃষ্ণনগরে। ওঁর বাড়ি গিয়ে দেখা করলাম। হাত ভেঙেছিল। গত ১০ ফেব্রুয়ারি এক্স-রে করান। হাড় ভেঙেছিল। ১০ ফেব্রুয়ারি খয়ব্বরের কাছে হাত বাঁধান। ব্যথা ও ফোলা দিনের পর দিন বাড়তেই থাকে। ৫ মার্চ আবার এক্স-রে করান। দেখা যায় আল্লার কাছ থেকে পাওয়া দৈব ওষুধ কোনও কাজেই আসেনি। বরং অ-কাজ করেছে। সময়ে হাড় সেট না করে ফেলে রাখায় ভাঙা জায়গায় ক্যালসিয়াম ফর্ম করেছে। কৃষ্ণনগর হাসপাতালে গিয়ে ৯ মার্চ হাতে প্লাস্টার করিয়ে আসেন। হাড় সেট করেন ডাঃ অরুণজিৎ দত্তরায়। পরে প্রয়োজনে অপারেশন করতে হবে। এ-সবই দৈব চিকিৎসকের ক্যারিশমার ফল। কোনও চিকিৎসকের এমন কাণ্ডজ্ঞানহীনতার বিরুদ্ধে ক্রেতাসুরক্ষা আইনের সাহায্য নেওয়া যেত। এই অলৌকিক চিকিৎসকের বিরুদ্ধেও আইনি সাহায্য নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে মুশকিল একটাই, এই আইনটা [The Drugs and Magic Remedics (Objectionable Advertisement) Act, 1954] কৃষ্ণনগর থানার যেমন জানা নেই, তেমনই জানা নেই কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের তা-বড় কর্তাদের। আর একটা মুশকিল আমাদের দেশের নিপীড়িত, শোষিত, প্রতারিত মানুষদের মানসিকতা নিয়ে। এরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার চেয়ে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে অন্যায়ের সঙ্গে

সহাবস্থানকে বেশি কাম্য মনে করে।

এখানকার দৈব্য চিকিৎসক ও মহেন্দ্র সাহার খবর দিয়েছিলেন যুক্তিবাদী সমিতির কৃষ্ণনগর শাখার ঔঙ্কার রায়। ঔঙ্কার ও আমি মহেন্দ্রকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি খয়ব্বরের বিরুদ্ধে ও আইনি ব্যবস্থা নিতে চাইলে আমরা সমিতিগত ও ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যের চেষ্টা করব। উত্তরে মহেন্দ্র জানিয়েছেন, 'কপালে ভোগ ছিল হয়েছে। এ-জন্য খয়ব্বরের উপর আমি রাগ পুষে রাখিনি। আমরা কিছু না করলেও শাস্তি ওর হবে। আল্লাই ওর বিচার করবেন।'

কাসেৎ মণ্ডলের কাছে চিকিৎসা করতে গিয়ে ভাঙা হাত ভাঙাই থেকে গেছে বেথুয়াডহরির বিল্বগ্রামের ক্লাশ টু'র ছাত্র দেবব্রত সরকারের। এর জন্য দেবব্রতর বাবা কাসেৎকে দোষ না দিয়ে দিলেন ভাগ্যের। কাসেৎ-এর বিচারের ভার সঁপে দিলেন ভগবানের হাতে। রোগীদের ভাগ্য ও ঈশ্বর-আল্লার প্রতি বিশ্বাসই এইসব বে-আইনি চিকিৎসক বা প্রতারকদের ব্যবস্থা রমরমা করতে সাহায্য করে।

হুগলী জেলার গুড়াপ স্টেশন। গুড়াপ পড়বে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে। সেখান থেকে বাস বা ট্রেকারে উঠে বসুন 'লতা বাঁধা' স্টপেজে নামবেন। মিনিট পাঁচেকের পথ।

লতা বেঁধে ভাঙা হাড় সারানোর দৈব্য চিকিৎসার সুবাদে স্টপেজটি 'লতা বাঁধা' নামেই পরিচিত দীর্ঘ বছর ধরে। প্রত্যেক দিনই রোগী দেখা হয়। রোগীর গড় ভিড় দৈনিক ৩৫০ থেকে ৪০০। রোগী আসেন কলকাতা থেকে বাংলাদেশ, সব জায়গা থেকেই। এখানে দৈব চিকিৎসক চার জন। প্রত্যেকেই হিন্দু।

দক্ষিণবঙ্গে হাড় জোড়া দেওয়ার দৈব চিকিৎসক আছেন একাধিক। ভাল ভিড় হয়। এখানেও সেই লতা বেঁধে মন্ত্র পড়ে হাড় জোড়া দেওয়া হয়। হাড় ভাঙার দৈব চিকিৎসকের রমরমা শহর বাঁকুড়াতেও।

প্রত্যেক অঞ্চলের হাড় জোড়া দেওয়া দৈব চিকিৎসকদের মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে দারুণ রকমের মিল রয়েছে। এক : এরা প্রত্যেকেই স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত বা ওদের ছত্রছায়ায় পালিত। দুই : স্থানীয় থানার সঙ্গে দহরম-মহরম যথেষ্ট। তিন: প্রতিবেশীদের ধারণা মোটেই ভালো নয়। চার: এইসব দৈব চিকিৎসকদের উপর পশার নির্ভর করা রিকশা, ভ্যান-রিকশা, চায়ের দোকান,

খাবারের দোকানের কারবারিরা এইসব বে-আইনি ব্যবসার সমর্থক। নিরীহ প্রতিবেশীরা রাজনীতিক, পুলিশ ও ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত সমর্থনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে ভয় করেন। অথচ এই নিরীহ প্রতিবেশীরাই আমাদের দেশের আমজনতা। এরাই গরিষ্ঠ ভোটদাতা। এদের দ্বারা নির্বাচিত এদের জন্যে নাকি সরকার। এরা জানেই না — এই কল্যাণমূলক 'ভারত' নামক রাষ্ট্রটির দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিকের চিকিৎসার সুযোগ করে দেওয়া। পড়ে গিয়ে হাড় ভাঙা কিছু জটিল ব্যাধি নয় — তার জন্য এক্সরে ও প্লাস্টার করার ব্যবস্থা নেই গ্রামে-গঞ্জে। অথচ প্রায় প্রতিটি মন্ত্রী চিকিৎসা করাতে বিদেশ ছোটেন। শহরের নামী-দামী নারসিংহোমকেও তাঁদের নিরাপদ মনে হয় না। এই গরিব দেশের জনপ্রতিনিধিরা বিদেশে চিকিৎসার নামে খরচ করেন মাথা পিছু কোটি পর্যন্ত।

সরকার কি ভাগ্য ও ঈশ্বরের কাছে নাগরিকদের সঁপে দিয়ে বে-আইনি ও অমানবিক চিকিৎসা চালিয়ে যেতে দেবে? স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে রাজনীতিকদের ক্ষুদ্র ব্যক্তি-স্বার্থ ও দলীয়-স্বার্থ কি এভাবে অমানবিক বে-আইনি ব্যবসা চালাতে দেবে?

কাকদ্বীপের দৈব-পুকুর

সাল ১৯৯৩। নভেম্বরের ২ তারিখ, মঙ্গলবার। যাচ্ছি ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ অঞ্চলে 'নাগের মহল' গ্রামে। কলকাতা থেকে দূরত্ব ৮০ কিলোমিটারের মত। 'আজকাল' পত্রিকার তরফ থেকে চলেছি 'অলৌকিক পুকুর'-এর মাহাত্ম্য দর্শন করতে। সঙ্গী চিত্র-সাংবাদিক কুমার রায়। সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে।

যতই নাগের মহলের কাছাকাছি হচ্ছি দেখা মিলছে লরি, মিনি-লরি, মেটাডোর বোঝাই স্নান সেরে ফেরা নারী-পুরুষ ও শিশুদের সঙ্গে। একই চিত্র। ভিজে কাপড়, ভিজে চুল, কপালে গোলা সিঁদুরের লম্বাটে টিপ। মাইল দুয়েক আগে থেকেই বুঝে যাই আমরা অলৌকিক পুকুরের কাছাকাছি এসে পড়েছি। ভ্যান রিকশায় স্নান সেরে ফেরা মানুষের ভিড়। ভিড় পায়ে হাঁটা মানুষের।

অলৌকিক পুকুরের খোঁজটা দিয়েছিলেন এই অঞ্চলের কিছু মানুষ। তাঁরা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, এই পুকুরে স্নান করলে নাকি সব রোগ সেরে যাচ্ছে। দ্রুত ভিড় বাড়ছে। পুকুরের গায়ে গড়ে তোলা হচ্ছে বিশালাক্ষ্মীর মন্দির। গোটা ব্যাপারটা সরেজমিনে তদন্ত করতেই আমাদের আসা।

পুকুরের মাইলখানেক দূরে পিচ রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রিক্সো ভ্যানে চাপলাম। এখন বৃষ্টি নেই। তবে বেলা এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে। ইট পেতে তৈরি রাস্তা। পিচ রাস্তা থেকে অলৌকিক পুকুর মাইল দেড়েকের পথ। এক মাইল দূর থেকেই ইট-রাস্তার দুপাশে বাঁশের খুঁটি পুঁতে খোড়ো ছাউনির অজস্র দোকান। চা, মনিহারি জিনিস, খেলনা, ঠাকুর-দেবতার ছবির ও খাবারের দোকান। মুড়ি-ঘুগনী ও পেটাপরোটার দোকান একটু বেশিষ। বিশাল আকারের পরোটা উনুন থেকে নামিয়েই দু-হাতে দমাদম পিটিয়ে দলা-মুচি করে রাখা হচ্ছে। তাই নাম পেটাপরোটা — বিক্রি হচ্ছে কিলো দরে। ছবির দোকানগুলোয় বিশালাক্ষী মন্দির সহ অলৌকিক পুকুরের বাঁধানো ছবি বিক্রি হচ্ছে। ছবির দোকানেই পাওয়া যাচ্ছে আট পাতার নিউজপ্রিন্টে ছাপা পুস্তিকা 'পুষ্করিণী মাহাত্ম্য'। দাম দু-টাকা। দেবেন ও নরেন মেঠাই বেচেছেন আজ ৯০০ এবং ১০০০ টাকার। শকুন্তলা পাড়ুই মুড়ি

তেলেভাজা বেচেছেন ৪০০ টাকার। লক্ষ্মী, সরলা, সুবল মুড়ি ঘুগনি বিক্রি করেছে ৬০০ থেকে ৮০০ টাকার। প্রণব দাসের কলা বিক্রি হয়েছে ৫০০ টাকার। হরিপদ মণ্ডল, জয়া চা বিক্রি করেছেন ৪০০ থেকে ৫০০ টাকার।

এই পুষ্করিণী মাহাত্ম্যের রমরমা স্বল্পদিনের। এর মধ্যেই মন্দির কমিটি তৈরি হয়ে গেছে। মন্দিরের পাকা দেওয়াল তুলেছে কমিটি। ছাদটা এখনও ঢালাই হয়নি।



দৈব পুকুরে স্নান। সামনে বিশালাক্ষ্মী মন্দির।

'আজ একদম ভিড় হয়নি' কর্মাধ্যক্ষ সমীররঞ্জন বৈরাগী জানালেন। 'সকাল থেকে যা বৃষ্টি, ভক্তের ভিড় তাই আজ বেজায় রকম কম' জানালেন কমিটির প্রভাবশালী নেতা দিবাকর প্রামাণিক। মন্দির কমিটির অন্যান্য প্রভাবশালী নেতারা হলেন জগদীশ বৈরাগী, শক্তিপদ কর, ঝন্টুপদ প্রামাণিক, বাবুলাল তাঁতী প্রমুখ। এঁরা কেউই বি জে পি করেন না। মন্দির কমিটির একজনও বি জে পি করেন না। বরং সি পি এম কেউ কেউ। গ্রাম পঞ্চায়েতেও আছেন কেউ কেউ।

গত মাস তিনেকে কত মানুষ স্নান সেরেছেন এই দৈব জলাশয়ে? মন্দির কমিটির কেউ বললেন দু লাখ, কেউ বললেন, দশ লাখ। সমীররঞ্জন জানালেন গত পূর্ণিমায় দশ হাজার লোক স্নান করেছে। গত শনিবার মন্দিরে প্রণামী পড়েছে ৫

হাজার টাকা। কমিটির কাছে ডোনেশন পড়েছে ২৬০০ টাকা। পূর্ণিমার দিন দান ও প্রণামীতে পাওয়া গেছে ৫০ হাজার টাকার মত।

'এই দৈব পুকুরের মালিক কি বিশালাক্ষ্মী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা স্থানীয় প্রাক্তন জমিদার?' কথাটা জিজ্ঞেস করতেই কমিটির কয়েকজন রে-রে করে উঠলেন। তাঁরা সমস্বরে জানালেন — দু-পয়সা রোজগারের গন্ধ পেয়ে জমিদার বিষ্ণুপদ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিথ্যে দাবির গুজব ছড়াচ্ছে। এই পুকুর সরকারের খাস জমিতে।

'কী কী রোগ সেরেছে?'

'কী রোগ সারছে না বরং জানতে চান?' বললেন সমীররঞ্জন, 'কুষ্ঠ থেকে ক্যান্সার — সমস্ত সারছে।'

'এইডস?'

একটু লাজুক হেসে কমিটির একজন জানালেন, 'কেউ তো মুখ ফুটে জানাবে না এইডস নিয়ে এসেছে। তবে কোনও এইডস রোগী এলেও এখানে স্নান করলে রোগ পালাবেই গ্যারান্টি দিচ্ছি।'

মন্দির কমিটির সামনে হাজির করতে একটি উদাহরণ সঙ্গে এনেছিলাম। স্নানার্থীদের থেকে সংগ্রহ করা উদাহরণ। উদাহরণটি দেখিয়ে মন্দির কমিটিতে বললাম, 'এই ছেলেটা। গৌতম। কানের লতিতে ছোট্ট একটা ঘা। তিন বার স্নান করেছে। আজ নিয়ে চার বার। কই এর তো সারেনি।'

আমাদের ঘিরে-ধরা কমিটির একাধিক সদস্য গ্রীক কোরাস ধরনে সমস্বরে বলে উঠলেন, 'ভক্তি থাকা চাই। বিশ্বাস থাকা নিয়ে কথা।'

অধিকাংশ মানুষের রোগ সারেনি। তাঁরা বারবার আসছেন। যদিও কমিটির সদস্যের মতে তিনটি ডোজই আরোগ্যের পক্ষে যথেষ্ট। সাধারণত, অর্থাৎ কিনা, তিনদিনে তিনটি ডুব। তবে, অসুখ দীর্ঘকালের হলে বেশ ক-বার আসা যাওয়া করতে হবে বৈকি। পথ্যি বলতে ঐ — বিশ্বাস ও ভক্তি।

তবে, সমীক্ষা চালাবার পর, সত্যের খাতিরে, আমরা এটা স্বীকার করতে বাধ্য যে কেউ কেউ বলেছেন, তাঁদের অসুখ সেরে গেছে। হাসনার কল্পনা মণ্ডল, 'ফল পাচ্ছি না।' কাকদ্বীপের জ্যোৎস্না বিশ্বাস - হাঁপানি। সারছে না। নামখানার নূর বিবি। গেঁটে বাত। চারদিন এলেন। ফলং নাস্তি। কিন্তু ডায়মন্ডহারবারের পূর্ণ মণ্ডল? পেটের অসুখ, গ্যাস। দুই স্নানে সেরে গেছে। ফতেমার (ফলতা) ব্লাড প্রেসার। সে কী আজকের! তাই বোধহয় তিন ডুবে সারেনি। নীলা দাসীর মাথার ধরা? টিভি-তে সারিডন ধাঁচে হেসে কপালে হাত বুলিয়ে নীলা বললেন, 'চোলে

গেছে।' অনন্ত মণ্ডল এসেছেন আমতা থেকে। অসুস্থ ভগিনীকে নিয়ে। অসুখের নাম বললেন না। তবে, সারছে। মানসিক কারণে শারীরিক অসুখ হলে অনেক সময়েই বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে রোগ সারানো হয়। আধুনিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে 'প্ল্যাসিবো'। এইসব বিশ্বাস-নির্ভর রোগ মুক্তির ক্ষেত্রে কোনও দৈব চিকিৎসার কেরামতি নেই এক পয়সাও। এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে।

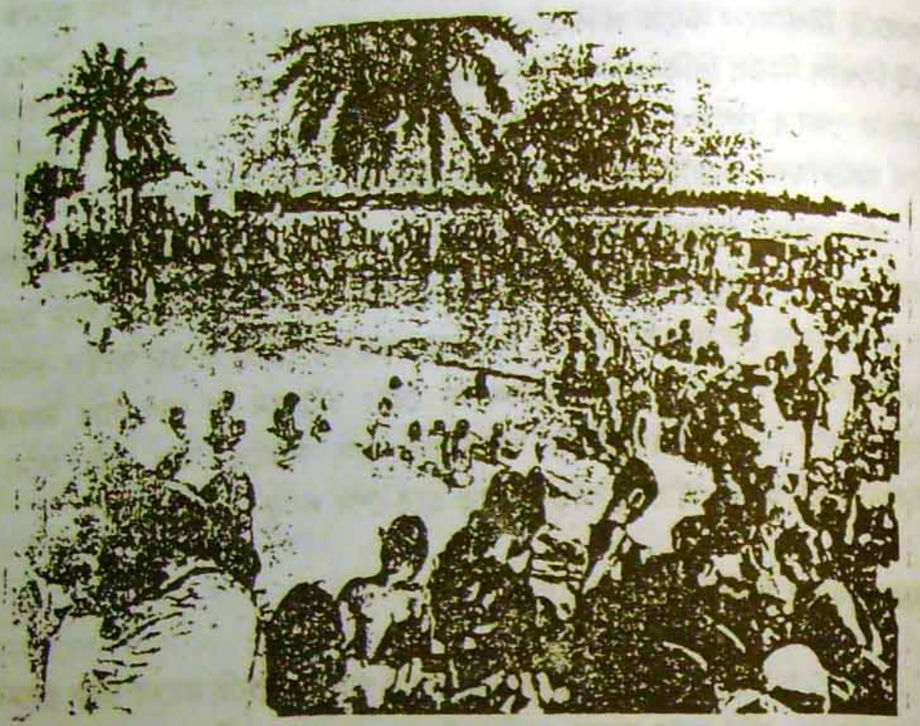
যাই হোক। আমরা কিন্তু যা দেখে এলাম, এই পুণ্যপুষ্করিণী প্রকতপক্ষে একটি পচা ডোবা। এখানে আগে গরু-মোষকে নিয়মিত স্নান করানো হত। এখানে স্নান করে মারাত্মক কোনও অসুখ হলে, আমাদের ভয় হল, রোগী বা তাঁর আত্মীয়-স্বজন কনজিউমার্স ফোরামে চলে যাবেন না তো? চাইতেন না লাখ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ? এই পুণ্যপুষ্করিণী সরকারের খাস জমিতে। ভয় সেই জন্যে। সরকারকেই হয়ত গ্যাঁটের কড়ি খসাতে হবে শেষ পর্যন্ত। সাধু সাবধান!

দৈব-পুকুরে দ্বিতীয় বার

আজ ১৩ নভেম্বর। এগারো দিনের মাথায় আবার এসেছি নাগের মহল গ্রামের দৈব-পুকুরে। শনি আর মঙ্গল এমনিতেই আরোগ্য স্নানের দিন। তার ওপর আজ শনিবার পড়েছে কালীপুজো। ৪ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার 'আজকাল' পত্রিকায় ছবি সমতে দৈব-পুকুরের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। চার কলম জুড়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল — 'পুণ্যিপুকুর' ঘিরে ব্যবসা জমজমাট। আজকালের প্রতিবেদনটির পর প্রত্যাশা করেছিলাম, অন্তত একটা ভাটার টান দেখব। পরিবর্তে গত দিনের তুলনায় আজ ভিড় বহুগুণ বেশি। খবর নিয়ে জানলাম এরই মধ্যে চল্লিশ হাজার মানুষের স্নান সারা।

আজও সেই একই। পিচ রাস্তায় গাড়ি ছেড়ে রিকশা ভ্যানে সওয়ার হলাম। আজও সঙ্গী কুমার রায়। ভ্যান থেকে নামতেই ঘিরে ধরলেন কমিটির লোকজন। ৪ নভেম্বর আজকালে প্রকাশিত লেখাটা নিয়ে তাঁদের আপত্তি। ক্ষোভ! কর্মাধ্যক্ষ সমীররঞ্জন বৈরাগী বললেন, 'এখানে স্নান করলে ক্যানসার সারে, কুষ্ঠ সারে — এ সব আমি কখন বললাম?'

আমি এমন একটা পরিস্থিতির জন্য তৈরিই ছিলাম। একটা ক্যাসেট কপি নিয়ে গিয়েছিলাম। টেপ রেকর্ডারে ক্যাসেটটা রেডি করাই ছিল। রেকর্ডারটা দেখিয়ে বললাম, 'তাহলে এটা চালাই। নিজের গলা নিশ্চয়ই চিনতে পারবে?'



দ্বিতীয় বারে দৈব-পুকুরে স্নানের ছবি।

সমীর এম এসসি পড়ে। মার্কসের ভক্ত। মার্কসের আর কোনও কথাকে মান্য করুক বা না করুক, মার্কস কথিত 'প্রয়োজনে এক পা এগিয়ে দু-পা পিছোবে' নীতিকে মান্য করে পিছিয়ে গেল। বলল, 'না না। টেপ চালাবার দরকার নেই। যদি বলে থাকি তাড়াহুড়োয় ভুল বলেছি। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, মার্কসবাদে বিশ্বাস করি। আপনি কী করে আশা করেন আমি এ-সব কথা বলবো বা এ-সব কথায় বিশ্বাস করবো?'

'তাহলে মন্দির কমিটিতে ঢুকে কর্মাধ্যক্ষ হয়ে বসে আছ কেন? এতে কি তোমার চরিত্রের স্ববিরোধী দিকটাই প্রকাশিত হয়ে পড়ছে না?'

'সে তো সব পুজো কমিটিতেই এখন মার্কসবাদী দলগুলো ঢুকছে। এদের বেলায় আপনি কী বলবেন?'

'তুমি এই কথার মধ্য দিয়ে কী জাস্টিফাই করতে চাইছ? পার্টির অনেকেই নীতিভ্রষ্ট, অতএব তোমারও নীতি মানার বালাই থাকতে পারে না! মন্দিরে হাজার

হাজার টাকার প্রণামী পড়ছে। তোমাদের কমিটিতে পড়ছে হাজার হাজার টাকার ডোনেশন। এতো দেখছি দৈব-পুকুর ঘিরে জম-জমাট ব্যবসা গড়ে তুলেছ তোমরা।'

আজ সমীর উত্তর দিচ্ছে খুব ভেবেচিন্তে।

'মন্দির কমিটি গড়া হয়েছে হাজার মানুষদের দেখ-ভাল করার জন্যে', সমীর বলল, 'এই যে সব টাকা আসছে তা দিয়ে ভক্তদের জন্য পায়খানা-বাথরুম এইসব করে দেব আমরা।'

'এখন পর্যন্ত তো কম টাকা জমা পড়েনি ভাই। সে-সব টাকা দিয়ে কিছু পায়খানা তৈরির কাজে তো হাত দিতে পারতে। দাওনি কেন?'

আমার প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না। জবাব দেওয়ার নেই, তাই এই নীরবতা।

বললাম, 'তুমি তো আজ বলছো, এগারো দিন আগে আমাকে যা বলেছ তা বলনি। পুকুরের বিজনেসটা জমে গেলে আবার ডিগ্‌বাজি খেয়ে বলবে না তো, আজ যা বলছ, সেগুলো বলনি।'

'এমনটা কেন ভাবছেন?'

'তোমার দ্বিচারিতা দেখে। তুমি যখন বিশ্বাসই কর না দৈব পুকুরের দৈব শক্তিতে, তখন কেন ফি-হপ্তায় হাজার হাজার রোগীদের প্রতারিত হতে দিচ্ছ? কত দূর-দূরান্ত থেকে গরিব-গুর্বো মানুষরা কষ্টের টাকা খরচ করে আসছেন ও ঠকছেন। এ-সব জেনেও তুমি এই কমিটির কর্মাধ্যক্ষ হয়ে বসে আছ?'

আমরা কথার উত্তরে সমীর বললেন, 'কাউকে তো আমরা আসতে বলছি না। কারও বিশ্বাসে আঘাতও করতে চাই না। কমিটি কারও বিশ্বাসে আঘাত হানতে যাবে না। তা ছাড়া এও তো ঠিক, আমি কী বিশ্বাস করি, তার ধার না ধরেই অনেকে দাবি করছে তাদের অসুখ সেরে গেছে।' আর এক দফা ডিগবাজি খেলেন সমীর।

সমীরকে প্রায় সরিয়ে এগিয়ে এলেন কমিটির নেতা দিবাকর, 'বিজ্ঞান পড়া মানুষ কি বিশ্বাস করল, না করল, তাতে কি এসে যায়? এই যে আপনি দৈব-পুকুরের বিরুদ্ধে, আমাদের বিরুদ্ধে এত কিছু লিখলেন, এতে কি একটা লোকের আসা কমলো? কমবে না। মানুষ যদি দেখে এই পুকুরে ডুব দিলে রোগ সারে, তাহলে আপনি হাজারটা বিরুদ্ধ লেখা ছাপলেও বিশ্বাসীদের ভিড় বাড়তেই থাকবে। সমীর দু-কলম বিজ্ঞান পড়ে ভাবছে অলৌকিক বলে কিছু থাকতে পারে না। আর চোখের সামনে দেখছে রোগীরা আসছে, ডুব দিচ্ছে, সেরে যাচ্ছে। তাইতে সমীর

দ্বিধায় পড়েছে। স্পষ্ট করে আমরা মন্দির কমিটি জানাচ্ছি, এই পুকুরে ডুব দিলে সব রোগ সারে। সব রোগ।'

বললাম, 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি আমাদের কমিটির সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। ছ'জন ক্লিনিক্যালি অসুস্থ রোগী দেওয়া হবে। পরপর তিনটি শনি বা মঙ্গলবার তারা স্নান করবে। যদি একজনও সারে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার। না সারলে, ওদের কিছু দিতে হবে না। শুধু কমিটি ভেঙে দিতে হবে। আপনারা কি রাজি আছেন?

কমিটির এক তরুণ স্বেচ্ছাসেবক বললেন, 'চ্যালেঞ্জ নেবার কী আছে। বিশ্বাস হল ওষুধ। আপনার যদি বিশ্বাস না থাকে, তাহলে তো ভগবানও নেই।'

কমিটিরই কেউ কেউ জানালেন, দু'হাতে টাকা লুটছে যারা, তাদের কথা। তাঁরা আরও জানালেন স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলোয় খোঁজ নিয়েছি। কমিটির নামে কোথাও কোনও অ্যাকাউন্ট নেই। একটা ফার্দিং জমা পড়েনি।

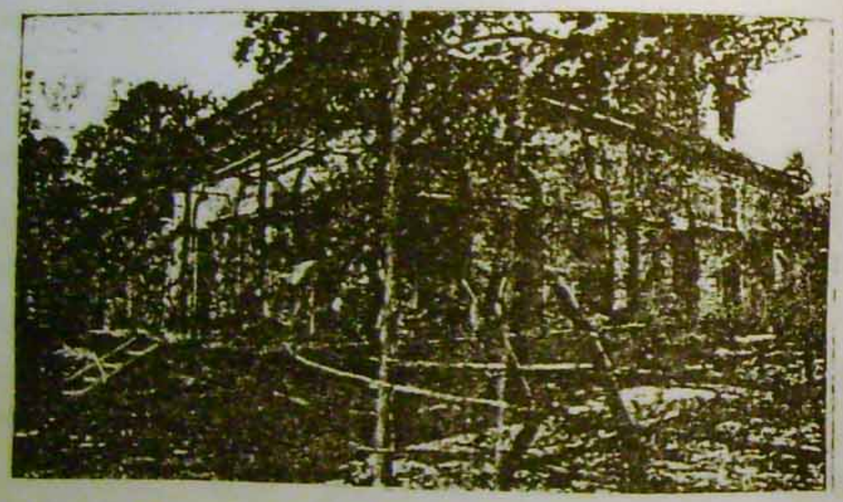
বিশালাক্ষ্মীর থানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্থানীয় জমিদার বিষ্ণুপদ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রামাণিক। জমি (পুকুরসহ) মোট দু'বিঘে আট কাঠা। প্রামাণিকরা ছিলেন চকদার। যদিও মন্দির কমিটি আগাগোড়া বলে যাচ্ছে, এটা সরকারের খাস জমি। ওঁদের প্রাচীন প্রসাদের বাইরে মহলে বসিয়ে প্রামাণিকরা দলিল দেখালেন। গাজন, পুজো, মেলা সবই হত এখানে। বিষ্ণুবাবুর ছেলে ডাঃ পুলকেশ প্রামাণিকের সঙ্গে কথা হল। 'জানেন, মন্দির কমিটি এখন ওই জমিতে পা রাখতে দেয় না আমাদের?' ডাঃ প্রামাণিক বললেন। খুললেই প্রামাণিকরা কেস করছেন। আর্টিকেল টু টোয়েন্টি সিক্স। অভিযোগ : প্রতারণা। অভিযোগ : জবর দখল।

একটি সমীক্ষা চালিয়ে আমরা দেখলাম, শতকরা ৮৫ জনের স্নান করে কোনও উপকার হয়নি। সুজাতা সর্দার (১৫)। বাড়ি মন্দির-বাড়ি। মুখভর্তি গোটা গোটা ফোড়ার মত মাংসের গুটি। বেড়ে গেছে। মিহির (১০)। বাড়ি : সুতাচেতা। পোলিও। পরেশ মণ্ডল (৬০)। বাড়ি : বাগনান। বাত। অজয় মিস্ত্রি। কামারহাট। হাতে পায়ে সাড় নেই, কেউ সারেনি। অসুখ বেড়ে গেছে শতকরা ৭৩ জনের। প্রশ্ন হল : স্বাস্থ্য দপ্তরের নড়ে চড়ে বসার সময় হয়েছে কি না। নাকি ওরাও তিথি নক্ষত্র দেখছেন?

চন্দ্রশেখর মাইতি। বয়স ২৬। এম এ পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে। কমিটির মেম্বার। 'চ্যালেঞ্জ নিলাম।' সে বলেছে, 'কমিটিতে চ্যালেঞ্জের কথা তুলব। ওরা যদি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না নেয়, আমি পদত্যাগ করব।' চন্দ্রশেখর আমার ঠিকানা ও ফোন নম্বর নিলেন।

আজও চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে কোনও চিঠি বা ফোন পাইনি। তবে এটুকু খবর পেয়েছি ১৬ নভেম্বর ১৯৯৩-তে চার কলম ছবিসহ প্রথম পৃষ্ঠায় 'পুণ্যিপুকুর'-এর দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশিত হওয়ার পর দৈব-পুকুরের ব্যবসা মুখ থুবড়ে পড়েছে ভক্তের ভাটার টানে।

আগরপাড়ায় 'ভুতুড়ে' আগুন



ভুতুড়ে বাড়ি।

খবরটা বিশালভাবেই ছড়িয়েছিল — আগরপাড়ার একটা বাড়িতে রহস্যজনক-ভাবে যেখানে-সেখানে আগুন জ্বলে উঠছে যখন-তখন। আগুন প্রথম জ্বলেছিল গত ২৪ এপ্রিল ১৯৯৩। শনিবার সকাল ৯টায়। তারপর থেকে আগুন তাড়া করে ফিরেছে বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন সময়ে। আগুন ধরেছে বিছানার গদিতে, চাদরে, শাড়ির কোনায়, খাতায়, বই-পত্তরে এমনকি কাঠের ইঁদুর-কলে। রহস্যময় এমন আগুনের যখন-তখন আক্রমণে বাড়ির সকলের নাওয়া-খাওয়া-শোওয়া শিকেয় উঠেছে। বাড়ির প্রবীণতম সদস্য সদানন্দ দাস। সংসারে আছেন তাঁর স্ত্রী, তিন ছেলে, বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, তিন পুত্রবধূর বয়স তিরিশ থেকে

চল্লিশের মধ্যে ও পাঁচ নাতি-নাতনি। সবচেয়ে বড় নাতি বাবাই পড়ে ক্লাস সেভেন-এ।

ও বাড়িতে আর থাকতেন চার ঘর ভাড়াটে, যাঁদের এক ঘর বাড়ি ছেড়ে উঠে গেছেন ভুতুড়ে আগুনের আক্রমণে সবে গত মঙ্গলবার।

আগুন-হানার রহস্য উন্মোচনে যাঁরা সবচেয়ে আগে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন সপ্তর্ষি ক্লাবের টগবগে তরুণরা। তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন স্থানীয় দমকল বাহিনী ও স্থানীয় পুলিস। পাশের পুরনো কুয়ো থেকে কোনও গ্যাস বেরিয়ে এমন অঘটন ঘটিয়েছে কি না — পরীক্ষা করতে দমকল বাহিনী দড়ি বেঁধে হ্যারিকেন নামিয়েছে। হ্যারিকেন নিভে যেতে কুয়োকে গ্যাস মুক্ত করতে জল এনে কুয়ো ভর্তি করে কুয়োকে গ্যাসমুক্ত করেছেন, কিন্তু তাতেও বাড়িকে আগুন-মুক্ত করতে পারেননি। অগত্যা বাড়ির বিদ্যুতের মেইন সুইচ বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও আগুন-রহস্য পিছু ছাড়েনি। বাড়ির ছেলেরা ওঝা নানুবুড়োকে এনেছেন গত বৃহস্পতিবার সকালে। প্রণামী দুশো একান্ন টাকা। নানুবুড়ো জলপড়া ছেটাবার সময়ই আগুন জ্বলেছে একটা খবরের কাগজে। খড়দার এক ভর-এ পড়া মানুষের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বাড়ির লোকেরা। তিনি ভরগ্রস্ত অবস্থায় জানিয়েছিলেন, 'ব্রহ্মভূত এমনটা ঘটাচ্ছে।' জলপড়া দিয়ে দিয়েছিলেন। ঘরের চারপাশে জলপড়া ছেটানো হয়েছে। কিন্তু আগুন ঠেকানো যায়নি তাতেও।



বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা রেকর্ড করছেন লেখক।

পরের সপ্তাহের বৃহস্পতিবার রাতে যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য দেবাশিস চ্যাটার্জি গিয়েছিলেন সমিতির তরফ থেকে সরজমিনে তদন্ত করতে। ঘরের প্রত্যেক সদস্যকে একঘরে কথায় কথায় আটকে রেখেছিলেন রাত সাড়ে ন'টা থেকে শুক্রবার সকাল পাঁচটা পর্যন্ত। এই প্রথম ওই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনও আগুন জ্বললো না। দেবাশিস জানিয়ে এলেন শুক্রবার প্রবীর ঘোষ আসবেন।

শুক্রবার দুপুর দুটো তিরিশে নিজে গিয়ে হাজির হলাম ওই বাড়িতে। শুনলাম এখনও পর্যন্ত আর একবারের জন্যেও আগুন ধরেনি। আমি যাব খবর পেয়ে 'দ্য টেলিগ্রাফ' ও 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকার সাংবাদিক ও চিত্র-সাংবাদিকরা হাজির হয়েছিলেন আমারও আগে।

ঘরে বসেছিলেন এক মাজারের পীর। পীরকে এনেছেন বাড়ির বড় ছেলে সমীর দাসের শ্যালক সনৎকুমার। পীরসাহেব ঘণ্টা দেড়েক 'ভর হওয়া' মানুষের মত মাথা দুলিয়ে জানিয়েছেন — জিনের কাণ্ড। পীর চার দেওয়ালে চারটে গজাল পুঁতে দিয়ে বাড়ি বেঁধে দিয়েছেন জিনের কারসাজি বন্ধ করতে।

সমস্যা হল ভিড়। যে ঘরে ঢুকি আমার সঙ্গে ঢুকে পড়েন এক ঝাঁক উৎসাহী জনতা, সপ্তর্ষির সদস্যরা ও সাংবাদিক, চিত্র-সাংবাদিকরা। আমি গিয়েছি 'আজকাল' পত্রিকার তরফ থেকে। চিত্র-সাংবাদিক হিসেবে সঙ্গে এসেছেন অভিজিৎ মুখার্জি। ভুতুড়ে পোড়ার কিছু স্যাম্পেল দেখা দরকার। বাড়ির সম্প্রতি পোড়া কিছু জামা-কাপড় বা কাগজ এনে দিতে বলতে মেজছেলে প্রবীর ও সনৎবাবু একটা শো-কেসের ওপরে পাতা আধ-পোড়া খবরের কাগজ থেকে কিছুটা ছিঁড়ে দিলেন, গন্ধ শুঁকলাম। কোনও তীব্র বিশেষ গন্ধ পেলাম না, যেটা মেটালিক সোডিয়ামের সাহায্যে জ্বালালে হত। সবার সামনে কাগজে কিছুটা জল ঢেলে দিতেই খবরের কাগজের রঙ মুহূর্তে হয়ে গেল হালকা বেগুনি। যেমনটা পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেটে জল পড়লে হওয়া উচিত। ঘরে তখন অনেক দর্শক। আগুনের ক্ষেত্রে যে পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেটের একটা প্রবল ভূমিকা ছিল এটা বুঝিয়ে দিয়ে বললাম, এর সঙ্গে গ্লিসারিন মিশলেই বিক্রিয়া আগুন জ্বলে, আর এ ভাবেই প্রতিটি ক্ষেত্রে আগুন জ্বালানো হয়েছে। পটাসিয়াম মেশানো জল জিভে চেটে দেখলেন আজকাল-এর চিত্র-সাংবাদিক অভিজিৎ মুখার্জি, চাখলেন সনৎবাবু। দুজনেই একমত — হ্যাঁ, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটই।

পরিবারের সকলের সঙ্গেই আলাদা আলাদা ভাবে কথা বললাম। বাইরের কারও পক্ষে এই ঘরে বিভিন্ন সময়ে ঢুকে পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট ও গ্লিসারিন

আগুন জ্বলে ওঠার মত করে গুছিয়ে রেখে যাওয়া অসম্ভব। সুতরাং এটা ভাড়াটে বা কোনও প্রমোটারের পরিকল্পনার অঙ্গ হতে পারে না। তবে যে জ্বালাচ্ছে, সে এই দুটির ব্যবহার বিষয়ে ওয়াকিবহাল। আমাদের সমিতির 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠানে বিনা আগুনে যজ্ঞ করার ঘটনা দেখে বা 'অলৌকিক, নয়, লৌকিক' বইটি পড়ে এই রসায়ন দুটির প্রয়োগ শিখেছে, এমনও হতে পারে। খুবই ক্যাজুয়েল ভঙ্গিতে অথচ আসলে সতর্কতার সঙ্গে বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হলাম। জানালাম এই পরিবারেরই একজন ঘটনাটা ঘটাচ্ছে। এই পরিবারেরই একজন এমনটা ঘটাচ্ছে বলায় বাড়ির কেউই তেমন সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। এমন কি ওই দুটি রসায়নে আগুন জ্বলে — এটা মানতেই চাইলেন না। আবার 'সপ্তর্ষি'র কেউ কেউ যদিও বা মানলেন, তবু তাঁদের জিজ্ঞাসা — আগুন জ্বলার সময় ধারে-কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না কেন? হাতে-কলমে আমাকে পরীক্ষা করে দেখাবার জন্য রীতিমত চ্যালেঞ্জ জানালেন দু-একজন অতি উৎসাহী দর্শক। সপ্তর্ষির এক তরুণ দৌড়ে কিনে আনলেন গ্লিসারিন ও পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট। বাড়ির বড় বউ দিলেন এক টুকরো কাপড়। কাপড়ের ভাঁজে পটাসিয়াম ছড়িয়ে দিয়ে ঝুলিয়ে দিলাম কাপড়টা। কাপড়ে গ্লিসারিন ঢেলে দিলাম। এক সময় গ্লিসারিন গা বেয়ে নেমে এল, পটাসিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া শুরু করল, ধোঁয়া-পোড়া গন্ধ, আর তারপরই আগুন। অনেক দর্শকই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঠিক এমন তীব্র পোড়া গন্ধই হচ্ছিল।' পোড়া কাপড়ে এক গ্লাস জল ঢেলে দিতেই কাপড়টা হালকা বেগুনি হয়ে গেল— খবরের কাগজটার মতই।

সমীরবাবু বললেন, 'আপনি তো বললেন আমাদের পরিবারেরই কেউ এমনটা ঘটাচ্ছিল। আপনার কথা যদিও মেনে নিই, তবুও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, যে ঘরে যখন আগুন জ্বলছে তখন দেখা গেছে ঘর ফাঁকা, কেউ নেই।'

'তেমনটাই তো হওয়ার কথা। যে আগুন জ্বালাচ্ছিল, সে যথেষ্ট চালাক। গ্লিসারিন ঢালছে কাপড়ে বা চাদরে। যেখানে ঢালছে তার কিছুটা নীচে রাখছে পটাসিয়াম। গ্লিসারিন ধীরে ধীরে নামছে। ততক্ষণে ভিলেন অনেক দূরে। তাই প্রতিবারই ঘটনাস্থলে ঘটনার সময় ভিলেনের দেখা মেলেনি।'

সপ্তর্ষির অনেকেই জানতে চাইলেন ভিলেনের নাম। সম্ভবত তাতেই উদ্দীপ্ত হয়ে বাড়িরই এক বউ প্রায় সমস্বরে বললেন, 'নামটা যদি জানেনই তো জানান না।'

বললাম, 'দেখুন যে এমনটা করেছে, সে আমাকে কথা দিয়েছে আর করবে না।

তার কথা ক্যাসেটবন্দি করা আছে। তাকে আমিও কথা দিয়েছি, আর এমনটা না করলে তার নাম কাউকে জানাব না। আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ তাকে ভালো হওয়ার একটা সুযোগ দিন। এরপরও সে যদি আবার এমন ঘটনা ঘটায় আমি নিজে এসে তার স্বীকারোক্তি আপনাদের শুনিয়ে দিয়ে যাব।'

আমার এই কথা শোনার পর কেউ আর নাম জানতে পীড়াপীড়ি করেননি।

এ-ভাবেই আগুন ভূতের টগবগে রহস্যে জল ঢেলে দিয়ে আগরপাড়ায় বিজ্ঞান মনস্কতার জয়কেই আবারও ঘোষণা করে এলাম।

১মে '৯৩-এ বহু পত্রিকাতেই ছবিসহ এই রহস্যভেদের খবর প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রদীপ আগরওয়ালের সম্মোহনে 'পূর্বজন্ম' যাত্রা

প্রদীপ আগরওয়াল নিজস্ব স্টাইলে সম্মোহন করেন। প্রায়ই ইংরেজি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ওয়ার্কশপের আয়োজন করেন স্টার হোটেলগুলোয়। ওয়ার্কশপ অ্যাটেন্ড করতে লাগে হাজার দুয়েক টাকা।

১৯৯৫ এর ১৭ নভেম্বর। The Telegraph পত্রিকার প্রথম পাতার অ্যাঙ্কারে ৬ কলম জুড়ে প্রকাশিত হল প্রদীপ আগরওয়ালকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটি শিরোনাম ছিল দু-লাইনে। প্রথম লাইনে লেখা Self-Styled hypnotist ducks challenge to prove claims as rationalist emulates feats। দ্বিতীয় লাইনে লেখা — City freed from mesmeric speel। দু-কলম জুড়ে আমার ও প্রদীপ আগরওয়ালের ছবি। বেশ বড় খবর।

আগের সপ্তাহের শনিবার প্রদীপ একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিল কলকাতার পাঁচতারা হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশানাল-এ। 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে হাজির ছিলাম। সঙ্গী ছিলেন সাংবাদিক সৌম্য ভট্টাচার্য ও চিত্র-সাংবাদিক কিশোর রায়চৌধুরী।

৫৫ জন টাকা দিয়ে ওয়ার্কশপে নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। নথিভুক্তির বিনিময় মূল্য ১৯৭৫ টাকা।

সম্মোহনের সাহায্যে কি কি করা সম্ভব, তার একটা তালিকা প্রদীপ প্রায়ই বিজ্ঞাপিত করে থাকেন। সম্মোহনে ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি, যে কোনও রোগ থেকে মুক্তি, অন্যের হৃদয় জয়, নিজের মনকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে কোনও জায়গায় নিয়ে যাওয়া, মনকে পূর্বজন্মে নিয়ে যাওয়া — এমন অনেক কিছুই করা সম্ভব বলে প্রদীপ বিজ্ঞাপনে দাবি করে থাকেন।

ওয়ার্কশপে অংশ নিতে এসেছেন এমন অনেকের সঙ্গেই আলাপ করলাম। বেশিরভাগই ধনী, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর একজিকিউটিভ, কোম্পানীর ডিরেক্টর ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পেলাম চারজন। একজন কলেজে

পড়ান। কলকাতার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী দু-জন। একজন রিসার্চ-স্কলার। কথা বলে মনে হল এঁরা প্রত্যেকেই প্রদীপ আগরওয়ালের বিজ্ঞাপন পড়ে এবং প্রদীপ-কোম্পানীর প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে খুবই উঁচু ধারণা পোষণ করেন। প্রদীপের বিজ্ঞাপনের কথায় বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করেন এক্সট্রা সেনসেটিভ পাওয়ার পাওয়া সম্ভব। সম্ভব পূর্বজন্মে ফিরে যাওয়া।

সে সময় দূরদর্শনে একটি জনপ্রিয় প্রোগ্রাম হত — 'প্রবাহ'। নিউজ ফিচার তৈরি করতো 'প্রবাহ'। আমাদের হাজির হওয়ার একটু পরেই পুরো টিন নিয়ে হাজির হলেন 'প্রবাহ'-এর পরিচালক সুজিত চ্যাটার্জি।

প্রদীপ আগরওয়াল সব সময় মাপা হাসি ঝুলিয়ে রাখা চল্লিশের নীচের তরুণ। এক সময় কলকাতার বড়বাজারে পৈত্রিক সোনার ব্যবসায় বসতেন। এখন সম্মোহন শেখবার অফিস খুলেছেন বড়বাজারে। জনা কয়েক কর্মচারী অফিসের দেখভাল করেন। সম্মোহন শেখাবার আসর বসে শুধু হোটেলে। ভারতেই সব বড় শহরেই ঘুরে ঘুরে ওয়ার্কশপ করেন। সম্মোহনের বেশ কিছু অডিও ক্যাসেট করেছেন। ওয়ার্কশপে সে-সব বিক্রি হয়। দাম একশ টাকার ওপর। এক একটা ক্যাসেটে নাকি এক এক রকম কাজ হয়। কোনটায় ব্যক্তিত্ব বাড়ে। কোনওটা শুনে আপনি মনকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেন যে কোনও জায়গায়। কোনওটায় নিজেকে নিয়ে যেতে পারেন পূর্বজন্মে।

প্রদীপ ওয়ার্কশপ শুরু করলেন। একটা মিউজিক বাজছিল মৃদু ভলিউমে। প্রদীপ বক্তব্য রাখছিলেন। সম্মোহন করে কি কি করা সম্ভব এই নিয়ে বক্তব্য। এক সময় 'সাজেশন' দিতে শুরু করলেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে একটি ধারণাকে সঞ্চারিত করতে শুরু করলেন। বলতে লাগলেন — আপনারা প্রত্যেকে যে যার চেয়ারে যতটা সম্ভব রিল্যাক্স মুডে বসুন। চোখ বুজুন, ভাবতে শুরু করুন আপনার কোনও এক প্রিয় বন্ধুর কথা। ভাবতে শুরু করুন। এক মনে ভাবতে শুরু করুন। এবার ভাবতে শুরু করুন আপনার বন্ধুর ড্রইং রুমের কথা। ড্রইং রুমের কার্পেটটার ছবি ভাবতে থাকুন। একটু একটু করে ছবিটা স্পষ্ট হচ্ছে। কার্পেটের ওপরে একটা টেবিল। টেবিলটা এখন দেখতে পাচ্ছেন। টেবিলে কয়েকটা ম্যাগাজিন পড়ে রয়েছে। সোফাগুলোর দিকে এবার তাকান। সোফা দেখতে পাচ্ছেন। নরম গদির সোফা। দৃষ্টি ফেরান ঘরের সেই কোনায় যেখানে পেতলের টবে সবুজ গাছ। ঘরের দেওয়ালে ঝোলান পেনটিংটার দিকে তাকিয়ে থাকুন। ভাল লাগছে। পেলমেট থেকে ভারী পরদা ঝুলছে। পরদা প্রায় মেঝে ছুঁয়েছে।

আপনি এবার চলুন টয়লেটে। সুন্দর একটা মৃদু গন্ধ। স্টোনের ঝকমকে মেঝে। দেওয়ালে টাইলস বসানো বেসিন। র‍্যাকে নরম তোয়ালে।

চলুন এবার অন্য ঘরে। বন্ধু পত্নী কারো সঙ্গে কথা বলছেন।

আমি এই মুহূর্তে আমার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনকে নিয়ে গেছি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। মনেরও চোখ আছে। সেই চোখ দিয়ে সব কিছু দেখা যাচ্ছে। একদম স্পষ্ট।

আমি যখন সব কিছু দেখতে পাচ্ছি, তখন আপনারও দেখতে পাবেন। কারণ বিজ্ঞানের প্রয়োগে সব জায়গায় একই ফল পাওয়া যায়। আপনারা নিশ্চয়ই অনেকেই আমার সাজেশন শুনে মনকে বন্ধুর ফ্ল্যাটে পাঠাতে পেরেছেন। এখন আপনারা চোখ খুলে ঘড়ির দিকে তাকান। সময়টা দেখে মনে করে রাখুন। আজই ফোনে জেনে নেবেন এই সময় আপনার বন্ধুর বাড়িতে কে কে ছিলেন, তাঁরা কি করছিলেন, দেখবেন, সম্মোহিত অবস্থায় আপনারা মনকে নিয়ে গিয়ে যা যা দেখলেন তা সবই মিলে যাচ্ছে। এটা হল সম্মোহনের সাহায্যে এক্সট্রা সেনসেটিভ পাওয়ার-কে জাগিয়ে তোলা। এ-ভাবে আমি আমার প্রয়োজন মত মুহূর্তে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে নিজের মনকে নিয়ে যাই। যা আমি পরি, তা আপনারাও পারবেন। নিশ্চয়ই পারবেন।

অবাক কাণ্ড! কয়েকজন উৎসাহের সঙ্গে জানালেন, তাঁরা মনকে বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যেতে পেরেছেন।

এ-বার শুরু হল নতুন ধরনের সম্মোহন। জনা পনেরো মানুষকে বেছে নিলেন প্রদীপ। সামনে অনেকটা খোলা জায়গা। সেখানে প্রত্যেককে গোল করে দাঁড় করালেন। শুরু হল প্রদীপের সাজেশন দেওয়ার পালা। এ-বারের সাজেশন এই রকম — আপনারা চোখ বুজে এক মনে ভাবতে থাকুন কুড়ি বছর বয়েসে পৌঁছে গেছেন। ভাবতে থাকুন। সেই বয়সের স্মৃতি আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। দেখুন, আপনার সামনে কুড়ি বছরের দিনগুলো, আপনি এখন কুড়ি বছরের যৌবনে ফিরে গেছেন।

আপনি এ-বার আপনার মনকে নিয়ে চলুন দশ বছরের দিনগুলোতে। সেই দশ বছরের কৈশোরে। গভীরভাবে এক মনে আপনার দশ বছরের কথা ভাবতে থাকুন। আপনি এখন দশ বছর বয়েসে ফিরে যাচ্ছেন। আপনি ফিরে গেছেন কৈশোরে।

এ-বার আপনার শিশু বয়েসে ফেরার পালা। আপনি এক মনে ভাবতে থাকুন আপনি আপনার এক বছর বয়সে ফিরে যাচ্ছেন, যখন আপনি নিজের পায়ে

দাঁড়াতে পারতেন না। আপনি এখন এক বছর বয়েসে ফিরে গেছেন। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছেন না। টলমল পায়ে পায়ে হাটতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছেন। হামা দিচ্ছেন।

এই সময় দেখা গেল কেউ কেউ টলমল পায়ে সত্যিই পড়ে গেলেন। এবং তারপর হামাও দিতে লাগলেন।

এক সময় নতুন করে সাজেশন দেওয়া শুরু করলেন প্রদীপ। এ-বার আগের জন্মে ফেরার সাজেশন। আগের জন্মের শৈশব, কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে এনে ফেললেন।

এক সময় জন্মান্তরে নিয়ে যাওয়ার পালা শেষ হল। শুরু হল সম্মোহিতদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা শোনার পালা। হামা দেওয়া মানুষগুলো একে একে শোনালেন তাঁদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা। শোনালেন তাদের শিশু অবস্থা থেকে পূর্বজন্মে ফিরে যাওয়ার কথা। পূর্বজন্মে কি ছিলেন, তা নিজের মধ্যে অনুভবের কথা। ওঁদের অভিজ্ঞতার কথা শুনে আপ্লুত হলেন, আক্ষেপ করলেন, সম্মোহনে অংশ না নিতে পারা ওয়াকশপ অ্যাটেন্ড করা মানুষরা। প্রদীপ ওঁদের আক্ষেপে মলম লাগলেন, বললেন — আপনারা পূর্বজন্মে ফিরে যাওয়ার সম্মোহন প্রক্রিয়া দেখলেন। বাড়ি গিয়ে এই পদ্ধতিতে নিজেকে নিজে সাজেশন দিন, একই ফল পাবেন। নিজেকে নিজে সাজেশন দেওয়ার ব্যাপারে কারও প্রাথমিক কোনও জড়তা থাকলে ক্যাসেট কিনে তা বাজিয়ে সাজেশন নিন। অনেক ধরনের সাজেশনই আপনারা আমাদের কাউন্টার থেকে কিনতে পাবেন।

একটি তরুণকে এ-বার ডাকলেন প্রদীপ। দুটি চেয়ার পাতলেন সামান্য দূরত্ব রেখে একটি চেয়ারে মাথা ও আর একটি চেয়ারে দু-পা রেখে শুতে বললেন তরুণটিকে। কাঁধের নীচে থেকে পায়ের কিছুটা অংশ শূন্যে ঝুলে থাকার দরুণ ছেলেটি ঠিক মত শুতে পারছিলেন না। প্রদীপের দুই সহকারী ছেলেটির শূন্যে ঝুলে থাকা শরীরের নীচে হাত রেখে ওর পতন রোধ করলেন। এ-বার প্রদীপ ছেলেটিকে চোখ বুজে তার দেওয়া সাজেশন শুনতে বললেন। সাজেশনের মোদ্দা কথা — আপনার শরীরটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

সাজেশন কিছুক্ষণ চলার পর প্রদীপের ইশারায় তাঁর দুই সহকারী তাঁদের হাতের সাপোর্ট তুলে নিলেন। ছেলেটি এ-বার আর পড়ছেন না। শক্ত হয়ে শুয়ে আছেন। প্রদীপের ঈশারায় তার এক সঙ্গী সম্মোহিত হয়ে শুয়ে থাকা ছেলেটির বুকের ওপর দু'পা রেখে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়ে নেমে এলেন। ছেলেটি আর একজনের

দেহভার নিজের শরীরে নিয়েই শক্ত হয়েই শুয়ে রইলেন।

এবার প্রদীপ ছেলেটিকে সম্মোহিত অবস্থা থেকে তুললেন। তারপর ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের বললেন — এভাবেই সম্মোহনের সাহায্যে শরীরকে শক্ত করে জাদুকররা একটা মাত্র তলোয়ারের ওপর ভার রেখে শূন্যে ভাসিয়ে রাখেন।

সাজেশন দিয়ে হাতকে অবশ করে ইন্‌জেকশনের সিরিঞ্জ ফোঁটালেন প্রদীপ। সম্মোহিত টেরই পেলেন না।

সম্মোহনের ওয়ার্কশপ শেষ প্রদীপ আমদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগলো ওয়ার্কশপ? কোন প্রশ্ন আছে এই প্রসঙ্গে?'

'প্রশ্ন তো আছেই।' বললাম আমি। আমার সাংবাদিক বন্ধু সৌম্য আপনার সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করবে। আপনি কি ওকে ওঁর গতজন্মে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'মনে হচ্ছে সম্মোহন করে পূর্বজন্মে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়েই আপনাদের সন্দেহ আছে। এই যে ওঁরা গেলেন, ওঁরা কি মিথ্যে কথা বলেছেন?' বললেন প্রদীপ।

'না, সরাসরিভাবে ওঁদের মিথ্যেবাদী বলার মত প্রমাণ আমার হাতে নেই। কিন্তু ওঁরা আপনার সাজানো লোকও তো হতে পারেন। ঠিক আছে এই নিয়ে আর বিতর্কে না গিয়েও আপনার সম্মোহন ক্ষমতার প্রমাণ নেওয়ার সুযোগ যখন আমাদের আছে, তখন আসুন আমরা সেই সুযোগটাই নেই। আপনি আমার এই সাংবাদিক বন্ধুর বেডরুমে আপনার মনকে সম্মোহিত করে নিয়ে যান এবং ফিরে এসে বেডরুমের বিস্তৃত বর্ণনা দিন।'

উত্তরে প্রদীপ বললেন, 'এখন আমি খুবই ক্লান্ত। তাই আপনার দুটি প্রস্তাবই এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও রাস্তা নেই।'

'ক্লান্ত থাকতেই পারেন। কিন্তু আগামী তিন দিনের মধ্যে এই সাংবাদিক বন্ধুর বেড রুমের ডিটেলে বর্ণনা দিয়ে আপনার দাবি মত সম্মোহনের সাহায্যে তৈরি একস্ট্রা সেনসেটিভ পাওয়ারের প্রমাণ দিতে রাজি আছেন?'

প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে আমাদের কথা শুনছেন এক হল মানুষ। অপ্রস্তুত প্রদীপ কোটের বুক পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল মুছলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, আপনারা আসুন, আমি বলে দেব।'

'কবে, কখন, কোথায় আমাদের যেতে হবে বলুন। সঙ্গে বাড়তি যাবে 'প্রবাহ' টিম।'

'এখুনি বলতে পারছি না, ফোন করে নেবেন।'

আমাদের অনেক চাপা-চুপি সত্ত্বেও তিনি 'কবে-কখন-কোথায়' আমাদের যেতে হবে তা নিয়ে মুখ খুললেন না।

বললাম, 'আপনি দাবি করেছেন, যে কোনও রোগ এমনকি ক্যানসার পর্যন্ত হিপনোটিক সাজেশন দিয়ে সারিয়ে তুলতে পারেন। 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার তরফ থেকে কয়েকজন রোগী আপনার হাতে তুলে দেব। আপনি রোগী দেখে জানিয়ে দেবেন কত দিনের মধ্যে ওদের সারিয়ে দেবেন।'

'দয়া করে তাই করবেন। আমি ওদের দেখ-ভালের সুযোগ পেলে খুশিই হবো। আমি ওদের সারিয়ে দেব, এমন গ্যারান্টি দিচ্ছি না। কিন্তু ওদের হিপনোটিক সাজেশন দেব। ওরা যদি ঠিক মত সহযোগিতা করে, তবে নিশ্চয়ই ওরা রোগমুক্ত হবে।'

'রোগীদের নিয়ে কবের মধ্যে যোগাযোগ করব?' আমি, সৌম্য ও প্রবাহের পরিচালক সুজিত চ্যাটার্জি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার এই প্রশ্ন করেও উত্তর পেলাম না। কোণঠাসা প্রদীপ পুরোপুরিভাবে এই প্রসঙ্গ নিয়ে কানে তুলো ও মুখে লুকোপ্লাস্ট লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চাপ বাড়ছিল ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের তরফ থেকে। শেষ পর্যন্ত বিদ্ধস্ত প্রদীপ বললেন, 'আমি আপনার কোনও চ্যালেঞ্জই গ্রহণ করছি না। আমি আমার দাবির যথার্থতা কারো কাছেই প্রমাণ করতে বাধ্য নই।'

বললাম, "ঠিক আছে, আপনার যখন আপত্তি আছে, তখন রোগীদের হাজির করার ব্যাপারটা না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু সৌমের বেডরুমের ডিটেল বর্ণনা দেবেন বলে যে কথা দিয়েছেন, তার থেকে আপনি এখন নিশ্চয়ই পিছু হটবেন না? এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার পর পিছু হটার একটিই অর্থ হয়, তা হল আপনি মিথ্যে দাবি করে, প্রতারণা করে লোক ঠকাচ্ছেন।'

অপ্রত্যাশিতভাবে প্রদীপ বললেন, 'এমন কোনও কথা দিয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

প্রকাশ্যে এক হল মানুষ ও টিভি ক্যামেরার সামনে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেও সরাসরি পরাজয় থেকে বাঁচতে একটি বিশ্রী রকমের ডিকবাজি খেলেন।

টাকা দিয়ে শিখতে আসা অনেকেই প্রদীপের ওপর যথেষ্ট ক্ষিপ্ত হলেন। হৈ-হৈ চেঁচামেচি। প্রদীপ আগরওয়ালের একটি পেশী বাহিনী খারাপ পরিস্থিতি সামলাবার জন্য তৈরি থাকে বুঝলাম। শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ থেকে মাসলম্যানরাই প্রদীপকে বাঁচাচ্ছিল।

এরই মধ্যে আমি এক হল লোকের সামনে একটা ছোট-খাট বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম। জানালাম, দুই চেয়ারের মাঝে শেয়ান ছেলেটির শরীর সম্মোহনে শক্ত হয়নি। জাদুকররাও সম্মোহনের সাহায্যে কাউকে শক্ত করে তলোয়ারের ওপর শোয়ান না। জাদুকরের ওই সম্মোহন শুধুই অভিনয়। তাদের শরীর শক্ত করার পিছনে থাকে কৌশল। এখানেও মিস্টার আগরওয়ালের ডেকে নেওয়া ছেলেটির শরীর সম্মোহনে শক্ত হয়নি। ছেলেটি মিস্টার আগরওয়ালের দলের। ও শরীর শক্ত করেছে সামান্য অভ্যেসের সাহায্যে। আপনারা যে কেউ একটু অভ্যেস করলেই এমনটা করতে পারবেন।

১৩ নভেম্বর 'দ্য টেলিগ্রাফ'-এর সাংবাদিক সৌম্য ভট্টাচার্য ও 'প্রবাহ' টিমের সামনে আমাকে সত্যিকারের সম্মোহন, তার সীমাবদ্ধতা নিয়ে বলতে হয়েছে। সম্মোহনের প্রয়োগ অন্যের ওপর করে দেখাতে হয়েছে। সে সবই 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিবেদনটিতে এও প্রকাশিত হয়েছে — আমি কলকাতা পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে মিস্টার আগরওয়ালের গ্রেপতার দাবি করেছি।

কলকাতা দূরদর্শনের প্রবাহ অনুষ্ঠানে দেখান হয়েছে প্রদীপের সম্মোহনের নামে বুজরুকি ফাঁসের নিউজ ফিচার এবং নিউজ ফিচারটি সপ্তাহের সেরা নিউজ ফিচার হিসেব পুরস্কৃত হয়েছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্যাডে প্রদীপ আগরওয়ালের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছি কলকাতা পুলিশের কমিশনারের কাছে। জানিয়েছি, প্রদীপ সম্মোহনের সাহায্যে যে অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে দেওয়া সম্ভব বলে দাবি করেছেন তার তালিকা। জানিয়েছি, এইসব দাবি করে প্রদীপ 'The Drugs and Magic Remedies (Objectional Advertisement) Act 1954 লঙ্ঘন করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। শুধু তাই নয়, প্রদীপ মিথ্যে দাবি করে ওয়ার্কশপের নামে আর্থিক প্রতারণা করছে — যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সঙ্গে প্রদীপের অদ্ভুতুড়ে দাবির প্রচারপত্র পাঠিয়েছি। পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন, এমনটা আমার জানা নেই। তবে এটুকু জানি প্রদীপ বেশ কিছু দিনের জন্য কলকাতা ছেড়েছিলেন। প্রদীপের ব্যাপারে পুলিশের নীরবতা এটাই আরও একবার পরম সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে — এ দেশে আইনভঙ্গকারীদের সঙ্গে আইনরক্ষকদের প্রেম বড়ই গভীর।

কামধেনু নিয়ে ধর্মব্যবসা

'কামধেনু' মাঝেমাঝেই পুরাণের কাহিনী থেকে উঠে আসে এখানে ওখানে। এবার কামধেনুর আবির্ভাব ঘটেছে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের 'টিনবাজার'-এ। সে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দশ মাসের বাছুর না প্রসব, না গর্ভসঞ্চার দিব্যি দুধ দিচ্ছে। খবর পেয়ে 'আজকাল'-এর তরফ থেকে ১ জানুয়ারি '৯৪ দৌড়লাম। সঙ্গী চিত্রসাংবাদিক কুমার রায়। গোটা কুড়ি গরু-মোষ নিয়ে গোয়াল ঘর। অনেক ভক্তের ভিড়। ভিড় ঠেকাতে বাঁশ বাঁধা হয়েছে। ভক্তদের হাতে হতে ফুল, বেলপাতা, কলা, ধূপ, দুধ সংগ্রহ করতে ঘটি। বাছুরের মালিক বসনায়েক সিংহ বিহারের আরা জেলা থেকে ৩০ বছর আগে এখানে এসেছিলেন দুধের ব্যবসা করতে। এখন কামধেনুর ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন। বসনায়েকের ব্যবস্থাপনায় দু'বেলা পুরুত আসছেন। ঘণ্টা নেড়ে ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো করছেন কামধেনু।

৩০ ডিসেম্বর থেকে বসনায়েকের আস্তানার পাশে গড়িয়ে উঠেছে অস্থায়ী দোকান। বিক্রি হচ্ছে ফুল, বেলপাতা, কলা, বাতাসা, ধূপ। ভিড় ভালই জমে উঠেছে। প্রণামীও পড়ছে। দিনে নাকি প্রণামী পড়ছে অন্তত ২০০ টাকা। এসব জানালেন ২৫ ডিসেম্বর থেকে ওখানেই থানা গেড়ে থাকা যুক্তিবাদী সমিতির শেওড়াফুলি শাখার ছেলে-মেয়েরা।

এ বছর দুর্গাপুজোর সপ্তমীর দিন প্রথম দুধ দেয় সংকর জাতের এই বাছুরটি। খবরটা হিন্দি দৈনিক 'বিশ্বামিত্র'তে প্রথম প্রকাশিত হয় ৬ ডিসেম্বর। তারপর থকে ভিড় প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বসনায়েক বিশ্বাস করতেন সংকর জাতের বাছুরের এমন দুধ দেওয়ার মধ্যে অলৌকিক কিছু নেই। হরমোন ইঞ্জেকশন দিলে গরু-মোষ দুধ বেশি দেয়, এটা বসনায়েক জানেন। এও জানেন, বাছুরকে হরমোন ইঞ্জেকশন দিলে গাভিন না হলেও বাঁটে দুধ আসে। এ-সবই বসনায়েক আমাকে জানিয়েছেন। তবে কামধেনুকে কোনই ইঞ্জেকশন দেননি, দিব্যি, গেলে জানালেন। এখন বসনায়েক বাছুরটিকে 'কামধেনু' বা 'ভগবান' বলে

কেন বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন জিজ্ঞেস করায় জানালেন, 'বিন্ ইঞ্জেকশনে গরুর দুধ হয়, এমনটা কোনও দিন শুনিনি। ভক্তরাই এর নাম দিয়েছে 'কামধেনু'। যে যা অসুখ-বিসুখ সারাবার কামনা নিয়ে এই দুধ তিন ফোঁটা খাচ্ছে, অসুখ সেরে যাচ্ছে। এত ভক্ত সকলেই কি তবে ভুল করছেন?' জানি না, প্রণামী দিন- দিন বেড়ে চলাটাই মিথ্যে বলার কারণ কিনা? আজকালের এক চিত্রসাংবাদিক কুমার রায় গোয়ালঘর থেকেই কিন্তু কুড়িয়ে পান অ্যাস্ট্রোজেন ইঞ্জেকশনের খালি অ্যাম্পুল। একই জিনিস এসেছে যুক্তিবাদী সমিতির উপস্থিত কর্মীদের হাতেও, রতন পালিত জানালেন।

বসনায়েককে বললাম, 'চারজন রোগী দেব, তাঁরা এখানে এসে আপনার সামনেই দুধ খাবে। না সারলে ধরে নেব, আপনি সবার সঙ্গে প্রতারণা করছেন। আমার প্রস্তাবে রাজি আছেন?''

বসনায়েক জানালেন, 'আমার ইচ্ছে ছিল না হুজুর। নাম বলতে পারব না, তবে তারাই এটা নিয়ে ব্যবসা করছে। অবশ্য প্রণামীর ভাগ আমিও পাই। ওইসব চ্যালেঞ্জে আমি নেই।'

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশুচিকিৎসা বিভাগের প্রাক্তন রোগ অনুসন্ধান আধিকারিক ডাঃ পরিতোষকুমার বিশ্বাসের মতে, 'ল্যাকটোজেনিক হরমোন ইনজেক্ট করে বকনার বাঁটে দুধ আনা সম্ভব। এমন যদি হয়, গরুটা গর্ভবতী হয়েছিল এবং কোনও কারণে গর্ভ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সে ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটা সম্ভব! শরীরের বিভিন্ন হরমোনের কাজের ভারসাম্যে পরিবর্তনের ফলে বকনার দুধ আসতে পারে। মোট কথা, বকনার বাঁটে দুধ শারীরিক নিয়মেই আসে। এর মধ্যে অলৌকিক কিছু নেই। সংকর জাতের বাছুরদের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা বেশি ঘটে। প্রায় সব পশু চিকিৎসকেরই কম বেশি এমন ধরনের ঘটনা দেখার অভিজ্ঞতা আছে।

আর বকনার দুধ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করালেও দেখবেন তা সাধারণ দুধই, বাড়তি কোনও মাহাত্ম্য নেই। আমরা কামধেনুর গোয়াল থেকে যখন বের হচ্ছি, তখন দর্শক অন্তত ২০০। প্রায় প্রত্যেকের হাতেই যুক্তিবাদী লিফলেট। শিরোনাম 'শ্রীরামপুরের কামধেনুর রহস্য ফাঁস।' স্লোগান ও পাল্টা স্লোগানের লড়াই চলছে দস্তুরমত — 'গোমাতা কী জয়', 'যুক্তিবাদ জিন্দাবাদ।'

৫ জানুয়ারি আজকাল পত্রিকায় ছবিসহ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর বসনায়েক তার ধর্মব্যবসা গুটিয়ে ফেললেন।

বরানগরের হানাবাড়ি : গ্রেপ্তার মানুষ-ভূত

শুরু থেকে বলি। স্থান বরানগর। মহারাজা নন্দকুমার রোডের একেবারে ভেতর দিকে একটি পোড়ো বাড়ি। ২৩৯ নং। ভূতের গল্পের সিরিয়াল তুলতে এমন বাড়িই পরিচালকেরা খুঁজে থাকেন। বাড়িটি দোতলা।

৩১অক্টোবর ১৯৯৩ থেকে ঘটনার সূত্রপাত। ওপরে থাকেন বাড়িওলা অরুণ মান্না ও তাঁর পরিবার। কয়েক ঘর ভাড়াটে — পারুলবালা, তাপস, সমর। পারুলবালার সঙ্গে থাকেন তাঁর দুই মেয়ে মীরা আর বেলা।

৩১ অক্টোবর। প্রতিবেশীর ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজছে।

পারুলবালার পাশের ঘরের ভাড়াটে তাপস মণ্ডল। 'বিশ্বাস করুন' তাপস বলল, 'হঠাৎ, ক্যাঁ-অ্যাঁ-চ! দেখলাম, আমার ঘরের দরজাটা খুলছে। আবার বন্ধ হয়ে গেল। আবার খুলল। এরকম চার বার।'

দেখলাম দরজায় হুড়কো নেই।

'ছিটকিনি দেওয়া ছিল?'

'ছিল বৈকি। কে যে খুলল!' তাপস বলল, 'দেখুন, ... এখনও কাঁটা দিচ্ছে গায়ে।' তাপসের টেলারিংয়ের ব্যবসা।

এরপর থেকে নিত্য শুরু হল ভূতের উপদ্রব। শুরুর সময় রাত যখন ঠিক বারোটা। কোনও দিন পার্টিশনের ওপার থেকে উড়ে এসে পড়ল জলভর্তি মাটির কলসি। যেন মার্ধাকর্ষণ-ফর্ষণ সব বোগাশ। এমনি তার চলন। শূন্যে উঠে চেয়ার-টুল দুলতে দুলতে আছড়ে পড়া হয়ে দাঁড়াল নৈমিত্তক ঘটনা।

কথা বললাম বাড়িওলা, ভাড়াটিয়া প্রত্যেকর সঙ্গেই। ভুতুড়ে, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী প্রত্যেকেই। তাঁদের চোখের সামনেই নাকি এইসব ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যেকেরই প্রথম ভূতুড়ে ঘটনা দেখার সুযোগ হয়েছে ৩১-এর রাতে।

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বার বার দেখেছি অলৌকিক ঘটনা বা ভুতুড়ে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাজতে সব বয়সের নারী-পুরুষই নিপাট মিথ্যে বলতে থাকেন। সুতরাং

এদের কাছ থেকে শুনে সত্যের ছাকনিতে ছেকে যতটুকু নেওয়ার, ততটুকুই মাথায় রাখছিলাম।

পারুলবালা, মীরা ও বেলা আলাদা আলাদা করে একটি কথা বলেছেন, ভূত রাত দুপুরে দরজা আঁচড়ায়। এটা বেশ কয়েকটা রাতে হয়েছে। এক রাতে তো দরজায় দমাদ্দম লাথি মেরে গেছে। অবশ্য তাঁরা এ-কথাও বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলেও তাঁরা কাউকে দেখতে পাননি।

পারুলবালা, মীরা, বেলা প্রতিবারই এই ঘটনায় সাংঘাতিক রকম ভয় পেয়েছিলেন, জানিয়েছেন। ভয় পাওয়া মানুষ প্রচণ্ড সাহস নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলবে — অসম্ভব। এই অংশটুকু মিথ্যে বলেছেন। আর এক দিক থেকে দেখলেও ব্যাপারটা সম্ভব নয়। সত্যিই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে কাউকে দেখতে না পাওয়ার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া, এটা সম্ভব নয়। অতএব .....

আমরা আজকাল পত্রিকার তরফ থেকে সরেজমিন তদন্তে গিয়েছিলাম ৯ নভেম্বর '৯৩। আমরা মানে আমি, সাংবাদিক বাহুল রায় ও চিত্র সাংবাদিক ভাস্কর পাল।

প্রত্যক্ষদর্শীদের গুল শুনতে শুনতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য যা যা পেলাম তা হল : (এক) বাড়িওয়ালার বা তাদের পরিবারের সঙ্গে কোনও ভাড়াটের ঝগড়া নেই। (দুই) বাড়িটার ওপর কোনও প্রমোটারের নজর পড়েনি। (তিন) টুল, হাঁড়ি কলসি শূন্যে ভাসার গল্পগুলো নিপাট মিথ্যে হলেও হঠাৎ মাটির কলসি মেঝেতে আছড়ে পড়ে ভেঙেছে। কলসি থাকত একতলার ছোট্ট এক ফালি বারান্দার একটা টুলের ওপর। (চার) বাড়িওয়ালা দোতলায় থাকেন। তাদের পক্ষে ঘটনাগুলো ঘটাতে যেটা সবচেয়ে বড় অসুবিধে, তা হল সিঁড়ি ভেঙে তাকে দোতলায় পালাতে হবে প্রতিবারই। এতে সিঁড়ি ভাঙার আওয়াজ পাওয়ার বা যে কোনও সময় ধরা পড়ে যাওয়ার প্রচণ্ড ঝুঁকি থাকছে। কথা বলে আদৌ মনে হল না, এমন ঝুঁকি তাদের বাড়ির কারও পক্ষে নেওয়ার মত মানসিক জোর আছে। (পাঁচ) প্রতিদিনই একটি ভাড়াটে পরিবারের ঘরে ভুতুড়ে উপদ্রব হয়েছে। পরিবারটি পারুলবালার। ওঁদের ঘরের দরজায় বারবার ভূত আঁচড়ায়, লাথি মারে। (ছয়) একতলায় একচিলতে বারান্দার এপাশে-ওপাশে এক একটি ঘর নিয়ে থাকেন এক একটি ভাড়াটে। যে কোনও ভাড়াটের পক্ষে নিজের ঘরের দরজা খুলে রেখে ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটিয়ে দুটি মাত্র পদক্ষেপে নিরাপদে নিজের ঘরে ঢুকে পড়া সম্ভব। (সাত) বছরখানেক হল পারুলবালার পরিবারের সঙ্গে থাকেন শঙ্কর

ভৌমিক — তাঁরই বোনপো। শোবার জায়গার একটু অভাব তো আছেই। শঙ্কর রাতে শোয় কখন পারুলবালার ঘরে। কখনও শোয় বন্ধু হয়ে ওঠা ভাড়াটে সমরের ঘরে। (আট) পারুলবালার মেয়েরা যুবতী। সংসারের নিয়মিত আয় খুবই সামান্য। (নয়) শঙ্করের বয়স বছর পঁয়তিরিশ। সাধারণ চেহারা। অসাধারণ শক্ত মনের জেদি ছেলে। ফুটপাতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জিনিস ফেরি করে পেট চালায়। পিছুটান নেই। বিয়ে করেনি। (দশ) একবার শঙ্করের বন্ধু সমরের ঘরেও ভূতের আবির্ভাব ঘটেছিল। ঘরের দরজায় ভূতের লাথি পড়েছিল। দরজার পাল্লার এক দিকের কাঠ ভেঙে ছিটকে পড়েছিল বারান্দায়। এখনও দরজার পাল্লাটা অমনই ভাঙাই পড়ে রয়েছে।

পাড়ার মানুষদের কাছ থেকেই খবরটা পেয়ে ওখানে গিয়েছিলাম। 'প্রেস' লেখা গাড়ি দেখে উৎসাহী জনতা কিছু হাজির হয়েছিলেন। আমরা যে যাব, সেটাও বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটেরা আগে থেকে জানতেন, কথা বলে বুঝেছিলাম, আমার পরিচয়টাও তাঁদের কারুরই অজানা ছিল না। ভূতের উপদ্রব প্রতিদিন রাত বারোটা থেকে শুরু হয় শুনে জানালাম, 'এখন ফিরে যাচ্ছি, রাত বারোটার মধ্যে আবার হাজির হবো, ভুতুড়ে কাণ্ড দেখতে।

শঙ্কর হাত-টাত নেড়ে বলল, ''না না, ভূত তো আজ থেকে আর আসবে না।'

'কেন?' আমার প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর জানালেন, 'ভূতের হাত থেকে বাঁচতে গিয়েছিলাম তান্ত্রিকাচার্য গণেশ মাইতির কাছে। তিনি সর্ষেতে মন্ত্র পড়ে দিয়েছেন। এই দেখুন না' — বলে সুতোয় বাঁধা সর্ষের একটা ছোট্ট পুঁটলি দেখাল। বলল, 'এই পুঁটলিটা এই ঘরের দরজায় তিনবার রাম নাম জপ করে বেঁধে দেব, আর ভূত আসবে না।'

শঙ্কর খুবই জেদি। 'আর সহ্য হয় না। আজই সর্ষে ঝুলিয়ে দেব।' জেদ ধরল শঙ্কর।

শেষ কথাটা শঙ্করকে বলতে গাড়িতে তুলে আমরা নিয়ে গেলাম একটা মিষ্টির দোকানে। ওরই পছন্দমত অনেক মিষ্টির অর্ডার গেল। খেলাম চারজনেই। খেতে খেতেই কথাটা বললাম, 'আজ রাতে বারোটার আগেই আমরা আবার আসছি। আজ তুমি কিছুতেই সর্ষে ঝোলাবে না। সর্ষে ঝোলান হলে ভুত আসবে না, তাই তো? তুমি যদি ঝোলাও, আমরা ধরে নিতে বাধ্য হব, ভুতুড়ে কাণ্ড তুমিই ঘটাতে। আমাদের কাছে ধরা পড়ার ভয়ে একটা অজুহাত তৈরি করে ভূতুড়ে কাণ্ড বন্ধ করতে চাইছ।

রাত বারোটার আগেই আমরা ফের ওই হানাবাড়িতে হাজির হলাম। আমি, রাহুল, ভাস্কর ছাড়াও বাড়তি একজন চিত্রসাংবাদিক সঙ্গী — অলককুমার মিত্র। শ'খানেক পাড়ার ছেলে বাড়ির বাইরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই বাড়িতে ঢুকে ভূত ধরা দেখতে চান। কিন্তু এমনটা হলে সত্যানুসন্ধান চালান যায় না। থানায় একটা খবর দিয়ে এলাম। বাড়ির ঢোকার মুখে পুলিশ বসে উৎসাহীদের হাত থেকে আমাদের বাঁচালেন।

গোটা বারান্দায় পাউডার ছড়িয়ে আমরা বসলাম শঙ্করের বন্ধুর ঘরে — যে ঘরের দরজা ভূতের পদাঘাতে ভেঙেছে অন্য ভাড়াটেদের ও বাড়িওয়ালাকে বললাম, আমাদের জানান না দিয়ে যেন এক তলার বারান্দায় না আসেন। পাউডার ছড়াবার কারণ, কেউ ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটাতে চাইলে আঁকা থাকবে তার পদচিহ্ন ও গতিপথ।

গল্প করে সময় কাটাচ্ছিলাম। সঙ্গীরা চিলতে বারান্দাটায় নজর রাখছিলেন। আমাদের নিজেদের মধ্যে আড্ডা জমে উঠেছে। আড্ডার বিষয় হিসেবে ফুটবল, ক্রিকেট, সিনেমা, ব্লু-ফিল্ম, রেড লাইট এরিয়া সবই ঘুরে-ফিরে আসছে। শঙ্কর ও বন্ধু সমর দু-জনকে ইনভলভ করে নিয়েছি। ওরা একটু একটু করে আমাদের সঙ্গে সহজ হয়ে গেছে। নিজেদের অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাচ্ছে। এক সময় এলো যখন দেখলাম আলোচনার বিষয় বৈচিত্র্যকে আমরা গুটিয়ে নিয়ে মদ আর মেয়েমানুষে এনে ফেলেছি। আমাদের কথার পীঠে পীঠে শঙ্কর শুনিয়েছে একাধিক মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কথা। কিন্তু সেখানেও অনেক লুকোচুরি। সুস্থ প্রেমের জায়গা কলকাতায় বা মফস্বলে শূন্য। পার্কে একটু বসলেই পুলিশ ও তাদের চামচাদের তোলা আদায়। এই মেয়েগুলো কেউ ধর্ষিত হয়ে চেঁচালে পুলিশের দেখা মিলবে না। কিন্তু আমরা অ্যাডাল্ট ছেলে ও মেয়ে পার্কে বসলে পুলিশের চুলকোয়! শঙ্কর এও জানিয়েছে, বিয়ে করতে ইচ্ছেতো করে, অনেক বছর ধরেই করে, কিন্তু বিয়ে করা সম্ভব হয়নি। সামান্য অনিশ্চিত আয়। কোথায় বাড়ি ভাড়া নেবে, কি করেই বা সংসার চালাবে? দুধের সাধ ঘোলে মেটায় অন্যভাবে। এইসব খোলা-মেলা কথা কখনই জেরায় আদায় করতে পারতাম না। অথচ খোলা-মেলা ভাবে কথাগুলো না জানলে ভৌতিক ঘটনা ঘটাবার উদ্দেশ্যই খুঁজে পেতাম না। অধরা থেকে যেত অপরাধী। মুখ খোলাতেই তাই ব্লু-ফিল্ম থেকে রেডলাইট এরিয়া এসেছে আমাদের আলোচনায়।

রাত দুটো বাজল। ভুতের দেখা নেই। তবে থানার মেজবাবু পুলিশ-জিপ নিয়ে

দেখা করে গেলেন। মেজবাবু চলে যাওয়ার পর শঙ্করকে বললাম, 'তাইতেই মীরা আর বেলাকে উত্ত্যক্ত করতে ওদের দরজায় আঁচড়াতে, লাথি মারতে।'

শঙ্কর আমার বক্তব্যকে সোজাসুজি নস্যাৎ করে দিয়ে বলল, 'কি যে উল্টো-পাল্টা বলছেন।'

সহানুভূতির সঙ্গে বললাম, 'শঙ্কর এটা তোমার একটা মানসিক রোগ। তোমার প্রতি আমাদের প্রত্যেকরই সহানুভূতি আছে। বিয়ে করার বয়েস পেরিয়ে যাচ্ছে। সামনে কোনও অশার আলো নেই। নারী-সঙ্গ চাইছ। আন্তরিকভাবে চাইছ কিন্তু পাচ্ছ না। এমন অবস্থার প্রেক্ষিতে তোমার যে ধরনের যৌন-বিকার দেখা দিয়েছে, তা অনেকেরই দেখা দেয়। তুমি যদি বল, আমি তোমার মনো-চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পারি। তুমি তোমার মাসতুতো বোনেদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে। কারণ তারা তোমার নাগালের কাছের যুবতী।



শঙ্করের সঙ্গে কথা বলছেন লেখক।

হাজারটা কথা হল। ঘড়ির ছোট কাঁটা তিনটের দিকে এগুচ্ছে। আমার অনেক চেষ্টার পরও শঙ্কর কিছু স্বীকার করল না। অতএব বাধ্য হয়েই আমাকে সহানুভূতির রাস্তা ছাড়তে হল। কড়া গলায় সমর ও শঙ্করকে বললাম, 'এ বাড়িতে ৩১ অক্টোবর থেকে প্রতিটি দিন ভূতের উপদ্রব হয়েছে। কিন্তু আজ ভূত আসবে না। সর্ষে বাঁধা হয়নি, তবুও ভূত আসবে না। কারণ ভূত কোনও দিনই এ-বাড়িতে আসেনি। সন্দেহের হাত থেকে বাঁচতে আপনারা নিজেরাই এ-ঘরের দরজা লাথি মেরে ভেঙেছেন। দরজা বন্ধ করে ভিতর থেকে লাথি মেরেছিলেন বলেই ভাঙা কাঠের তক্তা ছিটকে পড়েছিল বারান্দায়। ভূত বলে কিছুই নেই। এ বাড়িতেও যা হয়েছে তা কোনটাই ভূতের করা নয়। সেদিন যখন দরজা ভেঙেছিল তখন আপনি নিশ্চয়ই এই ঘরে ছিলেন?' সমরকে জিজ্ঞেস করলাম আঙুল তুলে।

সমর প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেলেন আমার কথা শুনে। প্রায় তোতলাতে তোতলাতে বললেন, 'শঙ্করও ঘরে ছিল।'

'লাথিটা কে মেরেছে? আপনি?' আবারও সমরকে কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

শঙ্কর হঠাৎ কেঁদে ফেলে পা জড়িয়ে ধরতে এলো, 'দাদা স্বীকার করছি, আমিই ভূত। আমিই লাথিটা মেরেছিলাম।'

'সমর সব জানতো। তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমিই বোনেদের দরজায় আঁচড় কাটতে স্বীকার করছ?'

'করছি।'

'সেই তো স্বীকার করতে বাধ্য হলেই বাবা। তাহলে এতক্ষণ আমাদের খেলালে কেন? ভেবেছিলে অস্বীকার করেই পার পেয়ে যাবে?'

রাত তিনটে বাজে। পারুলবালার দরজার কড়া নাড়লাম। পারুলবালা দরজা খুললেন। বললাম, 'চলি ভূত আর আপনাদের বিরক্ত করতে আসবে না। তবে এটুকু জেনে রাখুন — ওই ভূতটি ছিল মানুষ ভূত।'

'সবই শুনেছি বাবা। আমারই লজ্জা করছে। আপনার জন্য শঙ্কর, সমর এদের নতুন করে চিনলাম।' পারুলবালা ধীরে ধীরে কথাগুলো বললেন।

আমরা যখন বাইরে এলাম তখন শুধু সারিসারি মাথা। ভূত ধরা পড়ল কি না জানতে অধীর আগ্রহে তাঁরা অপেক্ষা করছেন। দু-আঙুলে ভি দেখিয়ে গাড়িতে উঠলাম পুলিশের সহযোগিতায়।

সে-দিনই দুপুরে আজকাল দপ্তর থেকে খবর পেলাম, আমরা চলে আসার পর প্রতিবেশীদের কাছে শঙ্কর ও সমরের কীর্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে। শুরু হয় গণপ্রহার। পুলিশ শঙ্করকে জনরোষ থেকে উদ্ধার করে গ্রেপ্তার করে। ভূতের দোসর সমর ফেরার।

এফিডেভিট করে ডাক্তারের প্রশংসাপত্র নিয়ে ওঝাগিরি!

ওপরের শিরোনামে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল 'আজকাল' পত্রিকায় ৮ ডিসেম্বর '৯৩-তে।

এমন ওঝার ওজনদার খর পেয়ে 'আজকাল' পত্রিকার তরফ থেকে ছুটে গিয়েছিলাম। সঙ্গী ছিলেন্ চিত্রসাংবাদিক শিখর কর্মকার।

সত্যচরণ তরফদার। বয়স ৫৫। রানাঘাটের পালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় ওঝা। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দস্তুরমত এফিডেভিট করেই ওঝাগিরি করেন। ৩০ বছর ধরে চুটিয়ে ব্যবসা করছেন। হাবিবপুর স্টেশন থেকে মিনিট দশ হাঁটলেই তাঁর বিশাল একতলা বাড়ি। বাড়িতে ঢোকার মুখে, ডানদিকে মনসা মন্দির। দোরগোড়ায় দুধসাদা অ্যাম্বাসাডার মার্ক ফোর। সম্প্রতি কিনেছেন। কিনেছেন রাঘব বাজারের কাছে ১০ কাঠা জমিও। চার ছেলে। তিন মেয়ে। ওঝাগিরির আয়ে চকচক করছে তাঁর সংসার। দুই মেয়েকে ধূমধাম করে বিয়ে দিয়েছেন। বাবার পিঠে হেলান দিয়ে তিন ছেলেও দাঁড়িয়ে গেছে। ছোট মেয়ে এবার উচ্চমাধ্যমিক দেবে। ছোট ছেলেও নাইনের ছাত্র। বাড়িতে উপচে পড়ছে নানাজনের প্রশংসাপত্র। তাঁদের কেউ ডাক্তার, কেউ মোক্তার, কেউ বা পার্টির নেতা। সত্যচরণের উচ্চতা মাঝারি। চেহারাও সাধারণ। কিন্তু এলাকায় কেউকেটা। গত পাঁচ বছর রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। বরাবর সি পি এম করেন। তন্ত্রসাধনায় হাতে খড়ি ৩০ বছর আগে। গুরুর নাম কাফরি দাস। সত্যচরণ মন্দিরেই তন্ত্রসাধনা করেন। তাঁর মানুষ-প্রমাণ মনসামূর্তির পায়ের কাছে সাজানো আছে খুলি, শুয়োরের চোয়াল ও পাঁচটি শকুনের হাড়। মন্দির চত্বরে বসেই সত্যচরণ জানালেন, 'গত তিরিশ বছরে সাপে-কাটা মানুষ বাঁচানোর হিসেব পাচ্ছি ৫ হাজার ৬ শো-র মত। বাকিদের হিসেব নেই। ঠিক মত রাখতে পারিনি।' আমার হাতে একটাও সাপে-কাটা রোগী মরেনি।

তাঁর দাবি উড়িয়ে দিলেন এক পড়শী। বললেন, 'বিষাক্ত সাপে কাটা রোগী এলেই সত্যচরণ রোগীকে হাসপাতালে পাঠাতে বলেন।' একই অভিযোগ

সত্যচরণের বহু পড়শীর, কিন্তু কিছুতেই তাঁরা নাম প্রকাশে রাজি হলেন না, সত্যচরণের রাজনৈতিক প্রভাবের কথা ভেবে। পড়শীদের অভিযোগটি সত্যচরণের কাছে হাজির করতেই বললেন, 'হ্যাঁ, ওরা ঠিকই বলেছে। সেই সব রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলি, যাদের ঢোঁকটুকুও গেলার অবস্থা নেই। আমি মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে নাগদময়ন্তী গাছের শিকড় বেটেও খাওয়াই। দুয়ে মিলে রোগী সারে।'

আমার অনুরোধে মন্ত্রটা পাঠ করলেন। মন্ত্র টেপবন্দী করলাম। সত্যচরণ জানালেন, সাপে-কাটা রোগীকে নাগদয়মন্তী গাছের শিকড় বেটে খাওয়াবার পাশাপাশি মন্ত্রের টেপটা একবার বাজালেও, রোগী বাঁচবে। উর্দু, হিন্দি ও বাংলা মেশানো চল্লিশ সেকেন্ডের মন্ত্র। শুধু মানুষ নয়, একইভাবে পশুকেও বাঁচানো যায়। সম্প্রতি একটি গরুকেও নাকি এভাবে বাঁচিয়েছেন। বললাম, 'এ বাংলার শতকরা ৮৫ ভাগ সাপই তো নির্বিষ। সুতরাং নির্বিষ সাপে-কাটা রোগীই তো আপনার কাছে বেশি আসতে বাধ্য। আর তাঁরা বাঁচবেনই, আপনি, কিছু করুন বা না করুন। বিষাক্ত সাপে কাটলেই রোগীকে আপনি হাসপাতালে পাঠান। বাঁচানোর ক্ষমতা আপনার নেই, এটা জানেন বলে — এই অভিযোগ যদি আপনার বিরুদ্ধে আনি, কী বলবেন?'

'আপনার কথার উত্তর দেবে দু'জন রেজিস্টার্ড ডাক্তারের সার্টিফিকেট।' দুটি বাঁধানো প্রশংসাপত্র তুলে দিলেন আমার হাতে। একটি দিয়েছেন ডাঃ আশিসকুমার মজুমদার, এম বি বি এস, ডি টি এম অ্যান্ড এইচ (ক্যাল), এফ আর এস টি এম অ্যান্ড এইচ (লন্ডন) রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২৭৮৬৪। ডাঃ মজুমদারের ইংরেজি প্রশংসাপত্রের বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, সত্যচরণ তরফদার 'সাপে-কাটা রোগীর ক্ষেত্রে একজন বিখ্যাত ওঝা। ...' কিছু বিষাক্ত সাপে-কাটা রোগী তাঁর হতে আরোগ্যলাভ করেছেন। তাঁর সঙ্গে, সকলকে সহযোগিতা, করতে আহ্বান জানাচ্ছি।' দ্বিতীয় প্রশংসাপত্রটি ডাঃ সলিল মুখার্জি, এম বি বি এস, ডি পি এইচ (ক্যাল) দিয়েছেন। রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২৩৮২২। তিনি শুধু লিখেছেন, ওঝা সত্যচরণ বাতব্যাধি ও সাপে-কাটা রোগীর চিকিৎসা করেন।

রামনগর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে নিয়ে গেলেন সত্যচরণবাবু। পঞ্চায়েত প্রধান দীনেশচন্দ্র ঘোষ সত্যবাবুর ওঝাগিরির প্রচুর প্রশংসা করলেন। দীনেশবাবু পঞ্চায়েত প্রধানের রাইটিং প্যাডে সত্যচরণ সম্পর্কে লিখেছিলেন. '....দূর-দূরান্ত হইতে সাপের কাটা রুগীগণ সুচিকিৎসার জন্য এখানে আসিয়া থাকেন এবং প্রতিটি রুগীই সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া বাড়িতে ফিরিয়া যান।'

হবিবপুরের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ পরমার্থ চ্যাটার্জি জানালেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিষাক্ত সাপে-কাটা রোগীর একমাত্র জীবনদায়ী ওষুধ অ্যান্টি ভেনম সিরাম নেই। দীর্ঘ দিন ধরেই নেই। তাই বোধহয় সাধারণের শেষ ভরসা ওঝাই।

ডাঃ সলিল মুখার্জির সঙ্গে তাঁর রাণাঘাটের বাড়িতে দেখা করি। স্মার্ট মানুষ। সরাসরি অস্বীকার করলেন, 'ওঝাকে আমি কোনও সার্টিফিকেট দিইনি।' সার্টিফিকেট দেখাতে বয়ান বদলে বললেন, হ্যাঁ সত্যচরণ বলেছিল, তাই এ সব লিখে দিয়েছি।

এবার ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ডাঃ জ্যোতির্ময় মজুমদারের দারস্থ হলাম। বললাম, ওঝাকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন দুই ডাক্তার। এটা সম্পূর্ণ বে-আইনি কাজ। তাঁদের এমন দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাজ দৈব-চিকিৎসার পক্ষে প্রচারের কাজ সম্পূর্ণ বে-আইনি। তাঁদের এই সার্টিফিকেটে বিশ্বাস করে কোনও বিষাক্ত সাপে কাটা রোগী গেলে মৃত্যু অনিবার্য। এই মৃত্যুর দায় অবশ্যই এই দায়িত্ব জ্ঞানহীন চিকিৎসকের।

জ্যোতির্ময়বাবু জানালেন, খোঁজ-খবর না করে এ রকম সার্টিফিকেট দেওয়া ঠিক নয়। কেউ দিয়ে থাকলে তাঁদের শাস্তি হবে। রেজিস্ট্রেশনও বাতিল হতে পারে। সত্যি কি দুই ডাক্তারের শাস্তি হবে? দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি? আমাদের সমিতির তরফ থেকে দুই ডাক্তারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলাম।

৭ জানুয়ারি ১৯৯৪ আজকাল পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল। খবরটি এই :

পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিলের অস্থায়ী রেজিস্ট্রার ডি কে ঘোষ শোকজ করেছেন ডাঃ আশিস মজুমদার এবং ডাঃ সলিল মুখার্জিকে। নদীয়ার হবিবপুরের এক ওঝা সাপে-কাটা রোগীদের বাঁচিয়ে দিয়েছে — এই সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্যই শোকজ। যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষ জানিয়েছেন, শোকজের খবর ডি কে ঘোষ চিঠি মারফত তাঁকে জানিয়েছেন। এই ওঝার সম্পর্কে প্রতিবেদন তিনিই পেশ করেছিলেন আজকালে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক্তার দু-জন অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে পার পেয়েছেন। এটা একটা ঘটনা। একটা ইতিহাস।

‘গ্যারান্টি চিকিৎসা’র নামে হত্যাকারীর ভূমিকায় সর্পবিদ হীরেন রায়

হীরেন্দ্রকুমার রায় ওরফে হীরেন রায় সর্পবিদ হিসেবে সম্প্রতি যথেষ্ট প্রচার পেয়েছেন। সাপ সম্বন্ধে বাস্তবিকই অনেক কিছুই জানেন। আর জানেন বলেই দেশ জুড়ে মেলায় মেলায় ঘুরে সাপের প্রদর্শনী করেন। অনেক সাপের সঙ্গে একই খাঁচায় থাকছেন, খাচ্ছেন, শুচ্ছেন। সাপেদের মধ্যে গোখরো, কেউটে, শাঁখামুখে, কালাজ, চন্দ্রবোড়ার মত মারাত্মক বিষাক্ত সব সাপও থাকে। এক একটা সাপ তুলে নিয়ে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেন। সাপ নিয়ে যে-সব কুসংস্কার ও ভুল ধারণা সাধারণের মধ্যে আছে, তা ভাঙিয়ে দেন ঝক্‌ঝকে বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। এতদূর পর্যন্ত সব ঠিকঠাক। গোলমালটা হীরেন রায়ের একান্ত নিজস্ব সাপে কাটার চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে। চিকিৎসা পদ্ধতি খুবই সরল। বিষাক্ত সাপে কাটা রোগীকে আদার রস খাইয়ে দিন। রসে জল বা নুন মেশাবেন না। আসলে শুধু নির্ভেজাল আদার রসই খাওয়াবেন। তাহলেই নিশ্চিন্ত। হীরেনবাবু হেঁকে-ডেকে এ-কথাও বলেছেন, ‘হাসপাতাল যে সাপে কাটা রোগী বাঁচাতে পারবে না বলে ফেরত দেবে, তাকেও গ্যারান্টি দিয়ে বাঁচিয়ে দেব।’ মুশকিল হ’ল তাঁর এই সহজ-সরল পদ্ধতি কতটা কার্যকর, সে নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আরও মুশকিল কী জানেন, হীরেনবাবুর আবিষ্কৃত এই চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর হীরেনবাবুর নিজেরই গভীর সন্দেহ আছে। হীরেনবাবু নিজে সাপের ছোবল খেলে আদার ওপর ভরসা না হাসপাতালে দৌড়োন — এ খবরও পেয়েছি।

হীরেনবাবু বিভিন্ন শিক্ষামূলক (?) সাপের প্রদর্শনীতে আদা চিকিৎসা নিয়ে বুক ঠুকে বলছেন। বলছেন, বিভিন্ন পত্রিকার সাক্ষাৎকারে। ফলে তিনি শুধু একটা অপরীক্ষিত হাতুড়ে চিকিৎসার কথা বলে বিজ্ঞানের বিরোধিতাই করছেন না, মানুষের জীবন নিয়েও ছিনিমিনি খেলছেন।

এমনই এক ছিনিমিনি খেলায় হীরেন রায়ের হাতে প্রাণ দিয়েছেন চাকদহের ঈশাননগরের পঁচিশ বছরের তরতাজা তরুণ দীপক রায়। গত বছর জুলাইতে সন্ধে

সাড়ে ছ’টা নাগাদ সাপে কাটে দীপককে। চাকদার লাগোয়া পায়রাডাঙ্গার প্রীতিনগরে থাকেন হীরেনবাবু। সন্ধে সাতটার মধ্যেই দীপককে হীরেন রায়ের কাছে হাজির করা হয়। তার পরের ঘটনা, দীপকের বিধবা পত্নী জয়ন্তীর লেখা চিঠি থেকে তুলে দিচ্ছি : ‘সন্ধে ৭টার থেকে আদার রস খাইয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করে। কিন্তু মারা যায়। এই ঠগের জন্য আমি স্বামী হারিয়েছি। আর কেউ যাতে আমার মত স্বামী না হারায় তার ব্যবস্থা করবেন।’



কল্কি সংঘের ময়দানে হীরেন্দ্রকুমার রায়ের প্রচার পোস্টার।

২০মার্চ ৯৪ দীপকের স্ত্রী চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন। সেদিনই হীরেনবাবুকে কোথায় পাওয়া যাবে? খোঁজ করতে জানতে পারলাম, তাঁর ‘শিক্ষামূলক’ প্রদর্শনী চলছে উত্তর চন্দননগরে। আয়োজক কল্কি সঙ্ঘ।

বিকেলেই হাজির হলাম। সঙ্গী ‘আজকাল’ পত্রিকার চিত্র সাংবাদিক শিখর কর্মকার।

রাজরাজেশ্বরী পুজো উপলক্ষে ১৮ মার্চ থেকে ২১ মার্চ কল্কি সংঘের ময়দানে হীরেনবাবুর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'প্রেস' লেখা গাড়ি দেখে কিছু উৎসাহী হাজির হলেন। তাঁদের কাছে খবর পেলাম, এখানেও হীরেনবাবু আদার রসের গপ্পো বলে চলেছেন।

কল্কি সংঘের ময়দানে যখন হাজির হলাম তখন প্রদর্শনী শুরু হয়নি। ক্লাব ঘরে হীরেনবাবুর দেখা পেলাম।

সর্ট হাইট। স্বাস্থ্যবান। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। আমাকে দেখে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে মেপে সৌজন্যের হাসি হাসলেন। 'এদিকে কোথায় এসেছিলেন?' জিজ্ঞেস করলেন হীরেনবাবু।

দীপকের বিধবা পত্নী জয়ন্তীর চিঠিটা হীরেনের হাতে তুলে দিয়ে বললাম, 'পড়ুন'।

পড়তে পড়তে বার কয়েক পড়া বন্ধ করে আমাকে দেখছিলেন। ঝট্‌পট্ কথা বলেন। চিঠিটা আমার হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, 'এ বিষয়ে আমি কিছু বলব না।'

'বলতে তো আপনাকে হবেই হীরেনবাবু। কেন আপনি আদার রস খাইয়ে দীপকের ওপর আপনার হাতুড়ে বিদ্যে প্রয়োগ করতে গেলেন?'

ইতিমধ্যে আমাদের আসার খবর পেয়ে কল্কি সংঘের কয়েকজন কর্তা হাজির হয়েছেন। তাঁদেরই একজন আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনারা প্রশ্ন করার কে মশাই? কোন্ পত্রিকা থেকে আসছেন?' বললেন, 'আপনাদের প্রেস কার্ড দেখি।' শিখর তাও দেখালেন। 'তা আপনাদের আসার উদ্দেশ্যটা কী?' চিঠিটা এবার প্রশ্নকর্তার হাতে তুলে দিলাম। উনি পড়লেন। ফেরত দিলেন। বললাম, 'হীরেনবাবুর গ্যারান্টি চিকিৎসায় দীপক প্রাণ দিয়েছেন। তাঁর এমন অপরীক্ষিত চিকিৎসায় আরও প্রাণ যাতে না যায়, তার জন্য দীপকের বিধবা পত্নী আবেদন জানিয়েছেন। এ আবেদন শুধু আমাকে নয়। আপনাকেও। আপনার সমাজের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা নিশ্চয়ই আছে। আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না, গ্যারান্টি চিকিৎসার নামে বিজ্ঞান-বিরোধী চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচার। আপনার এখানেও হীরেনবাবু বিজ্ঞান বিরোধী বক্তব্য রাখছেন খবর পেয়েছি। তিনি বাস্তবিকই প্রমাণ করতে পারবেন তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতির কার্যকারিতা? এই নিয়েই হীরেনবাবুর সঙ্গে কিছু কথা বলতেই এখানে আমাদের আসা।'

কল্কি সংঘের কর্তাটি দেখলেন আমার টেপ রেকর্ডারটির দিকে। তারপর প্রচণ্ড রকম ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'আপনার টেপ রেকর্ডার বন্ধ করুন। হীরেনবাবু আপনাদের ইন্টারভিউ দেবেন না। আরে মশাই আদার রস খেয়ে সত্যিই বিষাক্ত সাপে কাটা রোগী বাঁচে কি না — জানি না, জানতেও চাই না। হীরেনবাবু তাঁর মত প্রচার

করছেন। যে কোনও মত যে কোনও লোকের প্রচার করার স্বাধীনতা আছে। কেউ সেই মত গ্রহণ করবে কি করবে না, সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। আপনারা মশাই হীরেনবাবুর ব্যক্তি স্বাধীনতায় হাত দেবার কে? 'আজকাল'কেও চিনি, আপনাকেও চিনি। যা পারেন করুন গে, যা ইচ্ছে লিখুন গে। এখন এখান থেকে বিদায় হোন।'

'এতক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বললাম, আপনার নামটাই জানা হল না। তা মশাইয়ের নাম?' জিজ্ঞেস করলাম।

'বলব না।'

'ভয় পেয়েছেন?'

'আপনাদের? কেন ভয় পাব মশাই?'

'ওই, আপনার নাম জানলে যদি লেখাতে আপনাকে নিয়ে টানাটানি করি।'

দুই শিশু নিয়ে বিধবা জয়ন্তী রায়ের চিঠির প্রসঙ্গ আবার টেনে আনলাম। চাইলাম নব্য কল্কে অবতারটিকে নরম করে কার্যোদ্ধার করতে। উল্টে কল্কে সঙ্ঘের অবতারটি আবার ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'কত লোক তো সার্টিফিকেওয়ালা ডাক্তারদের দেওয়া ওষুধ খেয়ে মরছে, কী হচ্ছে মশাই?' নয়া কল্কি অবতার হীরেনবাবুর বেআইনি চিকিৎসাকে যুক্তিগ্রাহ্য করার চেষ্টা করলেন।

তাঁর কথার তোড়ের মধ্যেই হীরেনবাবুর দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম, '৯১-এর এপ্রিলে কৃষ্ণনগরে বারদোলের মেলায় আপনাকে চন্দ্রবোড়া কামড়ে ছিল। আপনি তখন শক্তিনগর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, নিজের চিকিৎসা করাতে। কেন নিজের চিকিৎসা নিজে করলেন না হীরেনবাবু?'

বেঁটে-খাটো, শক্ত-পোক্ত, ফ্রেঞ্চকাটে শোভিত হীরেনবাবু সাপের মতই ফোঁস করে উঠলেন, 'ওখানে আদা পাইনি, তাই ....' আমার সঙ্গী চিত্র-সাংবাদিক শিখর কর্মকার ক্যামেরার সাটার টিপতেই হীরেনবাবু রাগে উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠলেন, 'আপনার ফিল্ম খুলে নেব।' শান্ত গলায় বললাম, 'নি-ন'। হীরেনবাবু দাঁত কড়মড় করলেন। বললাম, 'এটুকু জেনে অবাক হলাম কৃষ্ণনগরে আদা পাওয়া যায় না। কিন্তু যে-সব স্থানীয় যুবক আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন, তাঁরা দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছেন, আপনি প্রচুর আদার রস খেয়েছিলেন।

হীরেনবাবু আমার কথার জবাব দেননি।

হীরেনবাবুকে বলেছি, 'আপনি যে আদার রস খাইয়ে সাপে কাটা রোগী সারাবার দাবি করে চলেছেন, সেই দাবিকে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। আপনি কোনও পশুকে বিষাক্ত সাপে কাটার পর বাঁচাতে

পারলে যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে আপনাকে দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা। চ্যালেঞ্জের ব্যবস্থার সব খরচও আমাদের সমিতি বহন করবে। হারলে আপনাকে একটি টাকাও দিতে হবে না। কিন্তু বন্ধ করতে হবে আপনার আদার বুজরুকি। বন্ধ করতে হবে আপনার ভয়ংকর এই জনজীবন নিয়ে খেলা।'



হীরেন্দ্রকুমার রায় ও সাপ-গলায় লেখক।

না হীরেনবাবু আমাদের সমিতির চ্যালেঞ্জ নেননি।

আজকাল পত্রিকায় ৩০ মার্চ হীরেনবাবুর অদ্ভুতুড়ে চিকিৎসা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল 'গ্যারান্টি চিকিৎসা'র নামে একটি হত্যা। প্রতিবেদনটির শেষ বাক্য ছিল এই — আমরা এ-দেশের নাগরিক হওয়ার সুবাদে, হীরেন রায়ের বেআইনি চিকিৎসায় দীপক রায়ের মৃত্যুর জন্য হীরেন রায়ের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর ব্যবস্থা নিতে সরকারের কাছে দাবি রাখছি।

কিন্তু গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে দাবিটি আজও উপেক্ষিত রয়ে গেছে। তারপরও এই সরকার যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আহ্বান জানান, তখন তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা ছাড়া আর কিছু বেরিয়ে আসা কি সম্ভব — প্রিয় পাঠক-পাঠিকা?

'চলো যাই ফকিরবাড়ি'

শুনেছিলাম 'ফকিরবাড়ি' কল্যাণীর কাছে। কিন্তু বারাসত পার হওয়ার পরই রাস্তার দু'ধারে চোখে পড়তে লাগল, স্লোগান-লেখা রঙিন পোস্টার — 'চলো যাই ফকিরবাড়ি'। এই পোস্টার কলকাতার রাস্তায় আর লোকাল ট্রেনের কামরায় প্রায়ই চোখে পড়ে আজকাল। কলকাতা থেকে ৫০ কিলোমিটারের পথ গাদামারা হাট। হাট পেরলেই ডাইনে খোয়ার রাস্তা। ও রাস্তা ধরে এগোলে পথ হারাবার উপায় নেই। প্রতিটি ল্যাম্প-পোস্টে পথ-নির্দেশ : 'ফকিরবাড়ি এই পথে'।

হাইওয়ে ছেড়ে ২ কিলোমিটারের পথ গাজিপীরের মাজার। মাজারের কোল ঘেঁষে বাংলো প্যাটার্নের একতলা 'ফকিরবাড়ি'। অঞ্চলটার নাম 'পশরডাঙা'। ফকির এস পি আলি ওরফে শেখ পাঞ্জাব আলির বয়স ৫৮ চলছে। দেখলে অবশ্য ৪০-এর ধারে কাছে বলেই মনে হবে। কথাবার্তায় ভীষণ রকম ঝকঝকে। শৈশব থেকেই কবিরাজি ওষুধ, মলম, মাজন ইত্যাদি বানিয়ে বিক্রি করছেন বাংলা, বিহার আসাম, ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশের হাটেবাজারে। ফকিরসাহেব জানালেন, ওঁর বাপ-ঠাকুর্দারা ছিলেন এ গাঁয়ের জমিদার। বংশপরম্পরায় পীর ওঁরা। পীরের বংশধর হিসেবে শৈশব থেকেই টুকটাক অলৌকিক ক্ষমতা পেয়েছিলেন ফকির এস পি আলি। চূড়ান্ত অধিকারী হন ১৯৮৭-র সবে বরাত-এর রাতে। বন্ধ ঘরে একা বসেছিলেন ফকির সাহেব। হঠাৎই তাঁর সামনে হাজির হলেন মাজারের পীর মানিকপীর। মানিকপীরকে মানুষ শেষ দেখেছিল, তা প্রায় ৫০০ বছর আগে। মানিকপীর দুয়া-কলাম করে তিনবার ফুঁ দিলেন ফকির সাহেবের শরীরে। বললেন, 'তোরে দিয়েই আমি মানুষের উপকার করব।' মানিকপীর মিলিয়ে গেলেন। কিন্তু মেলাল না মানিক পীরের কথার সত্যতা। তারপর থেকে নিশ্চিন্ত প্রতিকারের জন্য শনি, মঙ্গল, অমাবস্যা, পূর্ণিমায় হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসেন। কঠিন রোগ, বিবাহে বাধা, প্রেমে বিরোধ, চাকরিতে বাধা, বাণমারা রোগী, ভূতে পাওয়া, জিনে পাওয়া, এমনি সাত-সতের সব সমস্যারই গ্যারান্টি দিয়ে সমাধান করেন। গ্রহের

বিরূপতারও প্রতিকার করেন। ভাগ্য জানতে হাত দেখার ছক দেখার প্রয়োজন হয় না। মানিকপীরের কৃপায় মানুষ দেখলেই ভূত-ভবিষ্যৎ জানা হয়ে যায় তাঁর। এ-সব ফকির সাহেবই বললেন। আমি শুধু কথাগুলি ক্যাসেটে বন্দী করলাম।

এটা ছিল প্রথম সাক্ষাৎকার ১০ নভেম্বর '৯৩, শনিবারের বিকেলে। সেদিন কথার মাঝখানে হঠাৎই উত্তেজিতভাবে ফকির সাহেব বললেন, 'যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষকে ৫০ হাজার টাকা চ্যালেঞ্জ চানাচ্ছি : উনি প্রমাণ করুন, আমি বুজরুক।' আমাকে চিনতে পারলেন না। দাবি মত যদিও মানুষ দেখলেই মানুষটির নাড়ি-নক্ষত্রের খবর জানার কথা তাঁর। তবু, আর একটু মজা করার লোভ সামলাতে পারলাম না। গলার স্বরে আকুতি মিশিয়ে বললাম, 'বয়স হল ৫০। বিয়ে হয়নি আজও। মা মারা গেছেন। বাবা হাঁপানি রোগী। যাকে ভালবাসতাম, তার ব্লাড-ক্যানসার ধরা পড়ল। আমার সঙ্গে বিয়ের তারিখ ঠিক হওয়ার পর, হপ্তা ঘোরার আগেই ওর মৃত্যু। সেই শোক, স্মৃতি আজও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তবু, এখন বিয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। কিন্তু দ্বিধা-সঙ্কোচ আজ বিয়ের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার বিয়ে কি সত্যিই হবে।'

ফকিরবাবা ধ্যানস্থ হলেন। একটু পরেই বললেন, 'আপনার বিয়েতে বাধা দিয়েছে আপনার প্রেমিকার মৃত্যু। সে মৃত্যু-শোক আজও ভুলতে পারেননি। দেখতে পাচ্ছি, আপনার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সে-শোক আপনি সহ্য করেছেন। আমি একটা তদ্বির করে তাবিজ দিচ্ছি। আমি মানিকপীরের নামে বলছি, এটা ডান হাতে ধারণ করলে, কায়েক মাসের মধ্যে আপনার কুমার-জীবনের অবসান ঘটবে।' বেরিয়ে আসছি, ফকির সাহেব বললেন, 'অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় আসুন। নিজের চোখেই দেখতে পাবেন আমার ক্ষমতা।' ফকির সাহেবের কিছু আপনজন ধারালো দা দিয়ে বাখারি চাঁচতে চাঁচতে আমাদের দেখলেন আড়চোখে।

২৮ ডিসেম্বর, '৯৩, মঙ্গলবার। ভরা পূর্ণিমা। বিকেল হয় হয়। ফকির সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতা ক্যামেরায় বন্দী করতে ভিডিও ক্যামেরাও সঙ্গে নিয়েছি। ফকিরবাড়ির ১০ কিলোমিটার দূরে ওই অঞ্চলের থানা আমডাঙা। থানায় আমাদের পরিকল্পনা বুঝিয়ে সঙ্গে নিলাম দুই তরুণ পুলিস অফিসার সুপ্রিয় দাস ও গৌতম ঘোষকে। আজ বেজায় ভিড়। শুনলাম, সকাল থেকে ভিড় পাতলা হতে হতে এখন পড়ে আছে শুধু তলানি। কালো লুঙ্গি, কালো আলখাল্লা, মাথায় কালো রুমাল, চোখে চশমা — ফকিরবাবা বাড়ির লাগোয়া খোলা মাঠে বসেছেন। মাটির তৈরি তিনটি প্রদীপ জ্বলছে। ফকিরের বাঁ পাশে একরাশ পাকানো কাপড়ের মোটা

পলতে। ডান পাশে সাজানো রয়েছে ধুনো আর কর্পূর গুঁড়ো। ফকির সাহেবকে ঘিরে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে মেটে সিঁদুরের আলপনার গণ্ডি। ভক্তদের বেশিরভাগই দরিদ্র। তবে মধ্যবিত্ত এবং অর্থ-স্বাচ্ছল্যে ঝলমলে চেহারার নারী-পুরুষের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। যে কেউ, যে সমস্যা নিয়েই আসুন, নিদান একটাই। সমস্যাক্লিষ্ট মানুষটি এসে বসছেন গণ্ডির ভেতর ফকিরের মুখোমুখি। ফকির সাহেব একটা কাপড়ের পলতে প্রদীপের তেলে ভিজিয়ে, প্রদীপের আগুনে জ্বালিয়ে নিয়ে যতক্ষণ বাঁ হাত নাড়তে নাড়তে দুয়া-কলাম করছেন, ততক্ষণে ফকিরের কোন এক সহযোগী সমস্যাপীড়িত মানুষটির আপাদমস্তক ঢেকে দিচ্ছেন ভিজে কাপড়ে। আর এক সহযোগী এই সময় ফকিরের প্রসারিত ডান হাতের তালু ভর্তি করে দিচ্ছেন ধুনো আর কর্পূরের মিহি গুঁড়োয়। তার ওপর চাপাচ্ছেন মেটে সিঁদুর আর ফুল। হঠাৎ এক বিকট চিৎকার ছাড়ছেন ফকির, 'মা-লি-ক'! ছুড়ে দিচ্ছেন মুঠোবন্দি হাত। 'বু-উ-ম' — একটা গম্ভীর আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হচ্ছে একটা আগুনের গোলক। কাপড় জড়ানো মানুষটির গায়ে ধাক্কা খেয়ে অগ্নিগোলক মুহূর্তে লাফিয়ে উঠছে ১০/১২ ফুট। সে এক দারুণ উত্তেজক দৃশ্য। এমনই তিনবার অগ্নিগোলক সৃষ্টির পরই তাকে উঠিয়ে নিয়ে এসে পাশে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে স্নান করানো হচ্ছে এক হাঁড়ি জল মাথায় ঢেলে। স্নান শেষ হতেই ফকির সাহেবের এক সহকারী হাতে বেঁধে দিচ্ছেন তিন ফেন্তা দেওয়া মোটা সাদা সুতো। সহকারীটির শুকনো চেহারা। কাঁচা-পাকা চুল। কাঁচা-পাকা ছাগল দাড়ি। পরনে লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি। মাথায় সাদা টুপি।

গণ্ডি থেকে একজন উঠছে, আর একজন বসছে। যে উঠছে, সে স্নান করছে, হাতে সুতো বাঁধছে, প্রণামী দিচ্ছে ফকির সাহেবের বউয়ের হাতে। মেনটাই চলছিল। হঠাৎই দেখা গেল ফকিরের ছুড়ে দেওয়া ধুনো-কর্পূর-সিঁদুর-ফুল আগুনের গোলা হয়ে লাফিয়ে উঠল না! ফকির আবারও 'মা-লি-ক' হুংকার ছুড়লেন। ধুনো ইত্যাদি এ-বারও আগুনের গোলা তৈরি হল না ভিজে কাপড় জড়ানো মানুষটিকে ঘিরে।

ফকির হুংকার ছাড়লেন, 'কেউ নিশ্চয়ই, দু-হাত একসঙ্গে ধরে আছেন। হাত ছাড়ুন এক্ষুনি, হাতে হাত ধরে রেখেছেন বলেই আগুনের গোলা তৈরি হচ্ছে না।'

দর্শক ও ভক্তদের মধ্যে একটা গুঞ্জন, নড়াচড়া। ফকির আবার ধুনো-টুনো নিয়ে ছুড়লেন, এ-বার আবার আগুনের গোলা লাফিয়ে উঠল। ভক্তেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। একটা বড় ধরনের অঘটনের হাত থেকে যেন বাঁচলেন!



ফকিরবাবা আগুনের গোলা তৈরি করছেন।

ছবি তোলার বিরতি নেই। আজকাল পত্রিকার চিত্র-সাংবাদিক শান্তি সেনের ক্যামেরার পাশাপাশি ভিডিও ক্যামেরাতেও ছবি তুলছি। সব কিছু মিলিয়ে ফকির সাহেব আজ খুব ফর্মে আছেন বুঝলাম। আমাকে উদ্দেশ করে কিন্তু সকলকে শোনাতে বাজখাই গলায় চেঁচালেন, 'বিজ্ঞানের যত বড় ডিগ্রি নিয়ে কেউ আসুন না কেন, এমনটা ঘটাতে পারবেন? এ-সবই মানিকপীরের ক্ষমতার চমৎকার! আনুন না যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষকে। ও তো বলে যুক্তিবাদী, সত্যানুসন্ধানী। সত্যানুসন্ধান করে বলুক — আমি বুজরুক, নাকি এটা অলৌকিক ক্ষমতা? আপনাদের পত্রিকায় লিখুন প্রবীর ঘোষকে পঞ্চাশ হাজার টাকা চ্যালেঞ্জ করছি। ও এসে করুক এ-রকম আগুনের গোলা তৈরি। প্রবীর ঘোষ সৎ হলে এখানে আসবে, আমার অলৌকিক ক্ষমতাকে মানবে, আমার হয়ে প্রচার করবে।'

আমি জুতো খুলে গণ্ডির ভিতর ঢুকলাম। জুতো খোলার কারণ — তৈরি হয়ে থাকা পাবলিক সেন্টিমেন্টকে মর্যাদা দেওয়া। সমস্ত মানুষের দৃষ্টি আমাদের দু-জনকে ঘিরে। সকলেরই কান খাড়া।

সকলকে শোনাবার মত গলা চড়িয়ে বললাম, 'গত ২০ নভেম্বর আপনার

এখানে এসেছিলাম। আপনি আপনার অলৌকিক শক্তির সাহায্যে আমার জীবনের অনেক অতীত ও ভবিষ্যতের কথা শুনিয়েছিলেন।'

আমার কথার মাঝখানে ফকির সাহেব বললেন, 'আমার আর অলৌকিক ক্ষমতা কোথায়? আপনি যা দেখছেন, সে-সবই মানিকপীরের কৃপা।'

বললাম, 'আপনি সেদিন বলেছিলেন, আমার বিয়ে হয়নি প্রেমিকার শোকে। ভুল বলেছিলেন। আমি বিয়ে করেছি ২৫ বছর আগে। স্ত্রী জীবিত। বলেছিলেন, আমার মা মারা গেছেন। তাও ভুল। বলেছিলেন, বাবা বেঁচে — সেখানেও ভুল করেছিলেন। আপনার মত একজন অলৌকিক ক্ষমতাবান ফকির আমার সম্বন্ধে যা বললেন, সব ভুল বললেন! এ ব্যাপারে কী বলবেন?'

ফকিরবাবা এত মানুষের সামনে এমন অতর্কিত আক্রমণের মুখে বলতে গেলেন, 'আমি ঠিক অমন কথা...।' কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, 'আমাদের কথাবার্তা ক্যাসেট করেছিলাম, মনে আছে? আপনি বললে, এখনই বাজিয়ে শোনাচ্ছি।' ফকিরবাবা বললেন, 'ভুল নিশ্চয়ই বলেছি, না-হলে আপনি এ-সব কথা বলবেন কেন? আমিও তো একটা মানুষ। সব সময় কি জানতে চাইলেই বলা যায়? তার জন্য একটা সময় চাই। এই যেমন এখন, এই আসনে বসার পর মানিকপীরের কৃপায় এখন যে কোনও লোক আমার সামনে এলেই তার সব কিছু জানা হয়ে যায়। একেবারে এক্স-রে আই। যাক্ গে, অলৌকিক ক্ষমতা কি ব্যাপার নিজের চোখেই তো দেখলেন, এবার যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের কাছে আমার চ্যালেঞ্জটা পৌঁছে দিন।'

'না না। এখনও আপনি কিছুই ঠিক-ঠাক বলতে পারছেন না। আগে বুঝবেন, তবে তো বলবেন। আপনি কি বুঝতে পেরেছেন — আমিই যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষ?'

'বাজে কথা। মিথ্যা কথা। আপনি প্রবীর ঘোষ নন। আমার ভক্তদের সামনে আমাকে অপ্রস্তুত করতে মিথ্যে কথা বলছেন।' ফকির আবার ফর্মে ফিরলেন। হারানো জমি ফিরে পেতে গলা চড়ালেন।

কাঁধের ব্যাগ থেকে বের করলাম 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটি। বইয়ে যত ছবি আছে, তাতে আমি যে প্রবীর ঘোষ, ভক্তদের সামনে প্রমাণ করা গেল খুব দ্রুত।

ফকিরবাবার অবস্থা 'মরিয়া না মরে রাম'। ফকিরবাবা, তার দ্বিতীয় পক্ষের দজ্জাল বউ, ছেলে ও সাকরেদরা বেজায় চেঁচামেচি শুরু করলেন। পুলিশ অফিসার

সুপ্রিয় দাস ও গৌতম ঘোষ আমার দু-পাশে দাঁড়ালেন। আগে থেকেই ভক্ত সেজে হাজির হওয়া যুক্তিবাদী সমিতির ছেলেরা। এখন তারা আমার পাশে পাশে।

ফকির সুপ্রিয় ও গৌতমকে বললেন, 'ও আপনারা তবে প্রবীর ঘোষকে প্রোটেকশন দিতে এসেছেন। প্রবীর ঘোষের কথায় আর যাই হোক আমার আগুনে গোলা তৈরির অলৌকিক ক্ষমতা মিথ্যে হয়ে যাবে না। কেউ পারবে? তারপর আমার মুখের কাছে তর্জনি নেড়ে বললেন, 'আপনি পারবেন এমন করতে? পারবেন না, এর জন্য প্রচুর সাধনা চাই।'

ফকিরবাবাকে বললাম, 'আপনার জিনিসগুলি আমাকে ব্যবহার করতে দিন। একই ঘটনা ঘটিয়ে প্রমাণ করে দিচ্ছি আপনি বুজরুক।' ব্যবহার করতে তো দিলেনই না, বরং প্রচণ্ড চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন ফকিরবাবা ও তাঁর সাকরেদরা। ঘুরলাম জনতার দিকে। বললাম, 'এই আগুনের গোলা তৈরির পেছনে কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই। আপনারা প্রত্যেকেই এমনটা ঘটাতে পারবেন। জ্বলন্ত পলতে-ধরা হাতটা টানটান করে মেলে ধরে, আর এক হাতে ধুনো ও কর্পূরের গুঁড়ো এমনভাবে ছুড়ে দিন যাতে ওই গুঁড়ো পলতের আগুন ছুঁয়ে যায়। তারপর তাই ঘটবে, যা ঘটাচ্ছেন ফকিরবাবা।'

ফকিরবাবা ও তাঁর সাকরেদদের সাধ্য ছিল না গণজাগরণের মোকাবিলা করেন। সুতরাং গণ্ডির ভেতর আবারও আমি। আমার সামনে সমিতির একটি ছেলেকে ভেজা কাপড় জড়িয়ে বসালাম। বাঁ মুঠোয় ধরলাম জ্বলন্ত পলতে। ডান মুঠোয় কর্পূর ও ধুনো। তারপর 'জয় যুক্তিবাদ' বলে ছুঁড়লাম কর্পূর-ধুনো। জ্বলন্ত পলতে স্পর্শ করে বসে থাকা ছেলেটির গায়ে আছড়ে পড়ল বিশাল এক আগুনের গোলা।

উত্তেজিত ও অবাক জনতাকে বললাম, 'এবার আপনারা হাতে হাত রেখে দিন, তাও আগুনের গোলা তৈরি হবে দেখুন।'

জনতার প্রায় সকলেই একটা হাত দিয়ে আর একটা হাত ধরে দাঁড়ালেন। তাতেও আগুন-গোলা তৈরি হল। বললাম, 'আপনাদের বিভ্রান্ত করতে, মুগ্ধ করতে ফকিরবাবা পলতের আগুনের স্পর্শ বাঁচিয়ে দু-বার মুঠো ভর্তি ধুনো-কর্পূর ছুড়েছেন। তাই দু-বার আগুন-গোলা তৈরি হয়নি।'

জনতার উল্লাসের মধ্যে আমরা গাড়িতে উঠলাম।

প্রতিবেদনটি আজকাল পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলম জুড়ে প্রকাশিত হয়েছিল সে সময়।

১৯৯৪-এর ডিসেম্বরে আর একবার গিয়েছিলাম ফকিরবাড়ি। আমার ঘণ্টা কয়েক আগে গিয়েছিলেন লন্ডনের চ্যানেল ফোর-এর ডিরেক্টর-প্রডিউসর রবার্ট ঈগল সদলবলে। তাঁরা আগাম খবর দিয়ে গিয়েছিলেন। অতি সতর্কতার সঙ্গে সব কিছু দেখেশুনে ফকিরবাবাকে গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছিলেন তাঁর এক ভক্ত ইঞ্জিনিয়ার-প্রমোটার।

আমরা আমডাঙা থানায় অপেক্ষা করছিলাম আহ্বানের। আহ্বান এলো। একটা মারুতি ভ্যানে রওনা হলাম। ভ্যানের গায়ে লেখা 'চ্যালেঞ্জ'। সঙ্গী দু-জন পুলিশ অফিসার ও সমিতির কয়েকজন।

আমরা যখন পৌঁছলাম, ফকিরবাবা তখন গণ্ডিতে মানুষ বসিয়ে আগুনের গোলা তৈরি করছিলেন। রবার্টের টিম ছবি তুলছেন। দোভাষীর কাজ করে চলেছেন সুমিত্রা। বড় একটা ডাইরিতে সুমিত্রার কথা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ নোট করে নিচ্ছিলেন রবার্টের পি. এ. অ্যানা। ফকিরবাবা এদিনও দু-বার ধুনো-কর্পূর ছুঁড়ে আগুনের গোলা তৈরি করতে পারলেন না। নাটকীয়ভাবে আবার সেই দর্শকদের উদ্দেশে চিৎকার — 'কে হাত বেঁধে রেখেছেন?' সেই জনতার উসকুস। আবার গোলা তৈরি।

ফকিরবাবার বউ ও ছেলে সুমিত্রাকে তখন বলছেন, তাড়াতাড়ি ক্যামেরা গুটোতে। বলছেন, ওই যে ওরা মারুতি ভ্যানে এলো, সব গুণ্ডা। তাড়াতাড়ি চলে যান, নয় তো ওরা আপনাদের ক্যামেরা লুটে নেবে।

ইতিমধ্যে উজ্জ্বল নেমে পড়েছে গণ্ডিতে। আবার সেই অভিনয়। এবার আমার বদলে উজ্জ্বল। ম্যালকম ক্যামেরা বন্দি করে রাখলেন সব। উজ্জ্বল তখন গোলা তৈরি করছে, আগুনের গোলা।

আমরা ফিরে এলাম আমডাঙা থানায়। সেখানে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলো। ফকিরবাবার প্রতারণা ও 'ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশনেবল অ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪' লঙ্ঘনের জন্য। অভিযোগপত্রে স্বাক্ষর করলেন 'ভারতের মানবতাবাদী সমিতি'র পক্ষে সাধারণ সম্পাদক সুমিত্রা পদ্মনাভন ও 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র পক্ষে আমি।

অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হলেন ফকিরবাবা। এই গ্রেপ্তারের খবরও প্রকাশিত হল অনেক পত্রিকাতেই। আর ঈগলের ছবি 'গুরু ব্যাস্টার্স' তো এখন পৃথিবীর এক অতি জনপ্রিয় ডকু-ফিল্ম। তাতেও ধরা আছে ফকিরবাবার বুজরুকি ফাঁসের ইতিহাস।

সাঁইবাবার চ্যালেঞ্জ : পেটে হবে মোহর!

এক অদ্ভুত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লাম। এমন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার বিচিত্র অভিজ্ঞতা এই প্রথম। রেজেস্ট্রি ডাকে চিঠিটি পাঠিয়েছেন শ্রীসত্যসাইবাবার চরণাশ্রিত 'শিক্ষা আশ্রম ইন্টারন্যাশানাল'-এর ভাইসচেন্সেলারের সেক্রেটারী অগ্নিকা বসাক। প্যাডের কোনায় লেখা Ref.No. 710/88. 10th April 1988. চিঠিটি এখানে তুলে দিলাম : —

মহাশয়

৩০শে মার্চ ৫ই এপ্রিল ১৯৮৮-এর সংখ্যায় 'পরিবর্তন'-এ আপনার (অ)লৌকিক অভিজ্ঞতার কথা পড়ে আমাদেরও অভিজ্ঞতা হোল।

আমাদের আশ্রমের উপাচার্য শ্রী বিভাস বসাকের নির্দেশক্রমে এক (অ) সত্য ঘটনা আপনাকে জানানো যাইতেছে. ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা করা আপনার ইচ্ছাধীন।

উনার কাছে শ্রীসত্যসাঁইবাবার সৃষ্টি করা কিছু বিভূতি (ছাই) আছে. যে কেউ রবিবার সকাল ৯টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত আসতে পারে পরীক্ষা করার জন্য। সম্পূর্ণ খালি পেটে আসতে হবে — সঙ্গে একজন মাত্র দর্শক বা সাক্ষী থাকতে পারে।

বিভূতি জলে গুলে খাইয়ে দেওয়া হবে। সন্দেহ নিবারণের জন্য গোলা বিভূতির খানিকটা অংশ উনি নিজেই খেয়ে নেবেন। খাবার তিন দিন পরে কম করে ৬টি, বেশী ১১টি স্বর্ণমুদ্রা পাকস্থলী বা অন্ননালীর কোন অংশে নিজেই সৃষ্টি হবে। চতুর্থ দিনে কোন সুযোগ্য *Surgen* কে দিয়ে *operation* করে বের করা যাবে, বা প্রত্যেকদিন পায়খানা পরীক্ষা করতে হবে ৩০ দিন পর্যন্ত। ঐ সময়ের মধ্যেই ২৫ নঃ পঃ আকৃতিতে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যাবে।

দক্ষিণা — ৫০০৲ পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে স্বেচ্ছাদান করে রসিদ সঙ্গে আনতে হবে। বিভূতি খাওয়ানো উপাচার্যের ইচ্ছাধীন। পত্রে আলাপ করে পরীক্ষার দিন ধার্য করতে পারেন। আপনি নিজে পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলেই প্রচার করবেন, নতুবা নয়।'

চিঠিটা আমাদের সমিতির অনেকেই পড়ে সাইবাবার নামের সঙ্গে জড়িত এমন একটা প্রতিষ্ঠানকে কোণঠাসা করার সুযোগ পেয়ে উত্তেজিত হলেন। তাঁরা চাইলেন আমি বিভূতি খেয়ে ওঁদের বুজরুকির ভাণ্ডাফোড় করি। কিন্তু আমার মনে হল — আপাতদৃষ্টিতে উপাচার্যের চ্যালেঞ্জটা যতটা বোকাবোকা ও নিরীহ মনে হচ্ছে, বাস্তব চিত্র ঠিক তার বিপরীত। এই নিরীহ চ্যালেঞ্জের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর রকমের বিপদ্‌জনক হয়ে ওঠার সমস্ত রকম সম্ভাবনা।

'শিক্ষা আশ্রম ইন্টারন্যাশনাল'-এর উপাচার্যকে আগস্টের শেষ সপ্তাহে চিঠি পাঠিয়ে জানালাম —

আপনি যে অলৌকিক একটি বিষয় নিয়ে আমাকে সত্যানুসন্ধানের সুযোগ দিচ্ছেন তার জন্য ধন্যবাদ। এই অলৌকিক ঘটনা প্রমাণিত হলে সাঁইবাবার অলৌকিক ক্ষমতাও প্রমাণিত হবে। কিন্তু পাশাপাশি এও সত্যি — আপনি ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার দায় বর্তাবে কেবলমাত্র আপনার উপর। আপনি কৃতকার্য হলে সাফল্যের ক্রিমটুকু খাবেন সাঁইবাবা। এই ব্যাপারটা আমাদের পছন্দ নয়। আপনার ব্যর্থতার দায় সাঁইবাবা নেবেন কি না, জানতে উৎসুক হয়ে রইলাম। সাঁইবাবার নির্দেশমত বা জ্ঞাতসারেই এই চ্যালেঞ্জ আপনি করেছেন — এটা ধরে নিতেই পারি। কারণ তাঁকে না জানিয়ে তাঁর সম্মান নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানানোর দুঃসাহস নিশ্চয়ই আপনার হত না। এমন অবস্থায় পরবর্তী পর্বে লিখিতভাবে জানিয়ে দেবেন, এই চ্যালেঞ্জ সাঁইবাবার নির্দেশ অনুসারে/জ্ঞাতসারে হচ্ছে।

বিভূতিতে বিষ নেই — নিশ্চিত করতে খানিকটা বিভূতি খাবেন জানিয়েছেন। সন্দেহ নিরসনের জন্য আপনরা এই সৎ চেষ্টাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। কিন্তু তারপরও যুক্তির খাতিরে বলতেই হচ্ছে — এতে সন্দেহ নিরসন হয় না। কারণ প্রায় সমস্ত বিষেরই প্রতিষেধক বিজ্ঞানের জানা। যুক্তির খাতিরে আমরা যদি ধরে নিই, আপনি বিভূতিতে বিষ মেশাবেন, তবে বিষটির প্রতিষেধক আপনার জানার সুযোগ থাকছে। এই অবস্থায় আপনি বিষক্রিয়া বন্ধ করতে প্রতিষেধক ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন। আমি অজানা বিষ খেয়ে ফেললে মৃত্যুই অনিবার্য হয়ে উঠবে। তিন দিনের মধ্যে আমি মারা গেলে পেটে সোনার টাকা তৈরি হওয়ার প্রশ্নই থাকবে না।

এই মৃত্যুর জন্য আপনাকে দায়ী বলে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ আমি যে বিভূতি খেয়েই মারা গেছি — তার প্রমাণ কি? আমি

যে মৃত্যুর আগে অন্য কিছু খাওয়ার সময় বিষ গ্রহণ করিনি, তার প্রমাণ কি? খাবারে বিষ মিশে যেতে পারে, কেউ শত্রুতা করে বিষ খাওয়াতে পারে, এমনকি নিজেই কোনও কারণে বিষ খেতে পারি।

এই অবস্থায় আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখছি : —

১) যে কোন প্রাণীকে বিভূতি খাইয়েই যদি তিন দিন পরে পেটে সোনার টাকা তৈরি করে অলৌকিকত্ব প্রমাণ করা যায়, তবে আমাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন? পরীক্ষার জন্য ছাগল টাগল কিছুকে বেছে নেওয়া যেতে পারে।

২) ছাগলটিকে আগের রাতেই আপনার আশ্রমে নিয়ে আসবো আমরা। উদ্দেশ্য বিভূতি খাওয়ার আগে পর্যন্ত ছাগলটি যে সম্পূর্ণ খালি পেটে আছে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত করা।

৩) সঙ্গে নিয়ে আসবো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জমা দেওয়া ৫০০ টাকার রসিদ।

৪) ছাগলটিকে বিভূতি খাওয়াবার পর ছাগলটি আমাদের, আপনাদের ও ইচ্ছুক সাংবাদিকদের পাহারায় থাকবে। উদ্দেশ্য — আপনারা যাতে কোনওভাবে ছাগলটিকে স্বর্ণমুদ্রা খাওয়াতে না পারেন।

৫) ছাগলটিকে বটপাতা, কাঁঠালপাতা জাতীয় খাবার খাওয়ানো হবে। খাবারের যোগান দেবেন আপনারা। উদ্দেশ্য যাতে খাদ্যে বিষক্রিয়ায় মারা গেলে আপনাদেরকে দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

৬) তিন দিন পর ছাগলটির পেটে এক্স-রে দেখা হবে সোনার টাকা তৈরি হয়েছে কি না।

৭) টাকা তৈরি হলে সাঁইবিভূতির অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণিত হবে। আমি পরাজয় মেনে নিয়ে আপনার হাতে প্রণামী হিসেবে তুলে দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা।

৮) ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এই অলৌকিকত্ব দেখার পর সঙ্গত কারণেই আর অলৌকিকত্বের বিরোধিতা না করে সত্য-প্রচার করবে এবং আমাদের সমিতির সদস্যরা প্রত্যেকে সাঁইবাবার কাছে দীক্ষা নেবে।

আপনার তরফ থেকে পেটে টাকা তৈরির বিষয়ে অন্য কোনও গভীর পরিকল্পনা না থাকলে, এবং বাস্তবিকই বিভূতির অলৌকিক ক্ষমতায় আপনি

প্রত্যয়ী হলে আমার এই প্রস্তাবগুলো নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর আমরা ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি প্রেস কনফারেন্স করে বিষয়টা সাংবাদিকদের জানাবো। তারপর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আমরা পরীক্ষার দিন ধার্য করে সাংবাদিকদেরও এই সত্যানুসন্ধানে অংশ নিতে আহ্বান জানাবো।

এই পরীক্ষায় আপনি কৃতকার্য হলে তা আমার পরাজয় হবে না; হবে সত্যকে খুঁজে পাওয়া।

আপনার ইতিবাচক চিঠির প্রত্যাশায় রইলাম।

উত্তর পেলাম সেপ্টেম্বরে। অগ্নিকা উপাচার্যের পক্ষে আমাকে জানালেন — আপনার অমানবিক চিঠিটা পেয়েছি। আপনি শুধু অমানবিকই নন, ভীতু। আপনি নিজে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে মৃত্যুর ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিতে চাইছেন অবলা, নিরীহ একটি প্রাণীকে। একটি ছাগল বা মুরগির প্রাণ কি প্রাণ নয়? তাদের প্রাণ কি মানুষের প্রাণের চেয়ে কম মূল্যবান? আপনার ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা আমাদের ব্যথিত করেছে।

অলৌকিকতার প্রমাণ চাইতে হলে এর আপনাকেই বিভূতি খেতে হবে। আপনার কোনও পরিবর্ত চলবে না। আপনি এতে রাজি থাকলে প্রেস কনফারেন্স হাজির থাকতে আমরা রাজি।

The Telegraph

CALCUTTA SUNDAY

Calcuttan to take on Satya Sai Baba



১১ ডিসেম্বর ১৯৮৮ রবিবার প্রেস কনফারেন্স করবো ঠিক হলো। প্রেস কনফারেন্স প্রেস ক্লাবে না করে ময়দান টেন্টে করবো ঠিক করলাম। ময়দান টেন্টটা ডাঃ অরুণকুমার শীলের। উনি কিছু দিন ধরে আমাদের সমিতিকে ব্যবহারের জন্য তাঁবুটা দিতে চাইছিলেন। ঠিক হল, সেদিন-ই তাঁবুর একটি প্রতীক চাবি ডাঃ শীল আমাদের সমিতিকে তুলে দেবেন।

প্রেস কনফারেন্সকে নিরপেক্ষ ও সার্থক করে তুলতে প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন পদার্থ-বিজ্ঞানী, রসায়ন-বিজ্ঞানী ও শল্যচিকিৎসকের সহযোগিতা প্রার্থনা করলাম। প্রত্যেকেই প্রেস কনফারেন্সে হাজির থেকে সহযোগিতা করবেন, কথা দিলেন। স্পটেই বিভূতি পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হল। এ-বার উপাচার্যকে চিঠি দিয়ে জানালাম, নিরপেক্ষভাবে বিভূতির অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থার প্রথম ধাপ হিসেবে কি কি করেছি। আরও জানালাম, (১) প্রেস কনফারেন্সের দিন বিভূতি খাওয়ার শর্ত মেনে সকাল থেকেই খালি পেটে থাকবো। সত্যি খালি পেটে আছি কি না যাচাই করতে উপাচার্য প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন। (২) যে বিভূতি আমাকে খেতে হবে, তা তুলে দেওয়া হবে পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষার ব্যবস্থা স্পটেই থাকবে। পরীক্ষায় যদি নিশ্চিত হওয়া যায় বিষ নেই বা এমন কিছু বিভূতিতে নেই যা খেলে শরীরে বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, তবে প্রকাশ্যেই তা খাবো। (৩) সেদিন থেকে তিন দিন আমি আপনার প্রতিনিধিদের নজরের সামনেই থাকবো, যাতে শরীরে তৈরি একটি টাকাও কোনওভাবেই শরীর থেকে বের করে পাচার না করতে পারি। মাত্র তিনটে দিন পরেই সত্য প্রকাশিত হবে। অতএব আপনার শর্ত মেনে নিয়ে কোনও পরিবর্ত হাজির না করে হাজির থাকবো। আপনি? এরপর সাংবাদিক সম্মেলনে যে কোনও একপক্ষের অনুপস্থিতি পরাজয় হিসেবেই গণ্য হবে; অজুহাত যাই হোক না কেন।

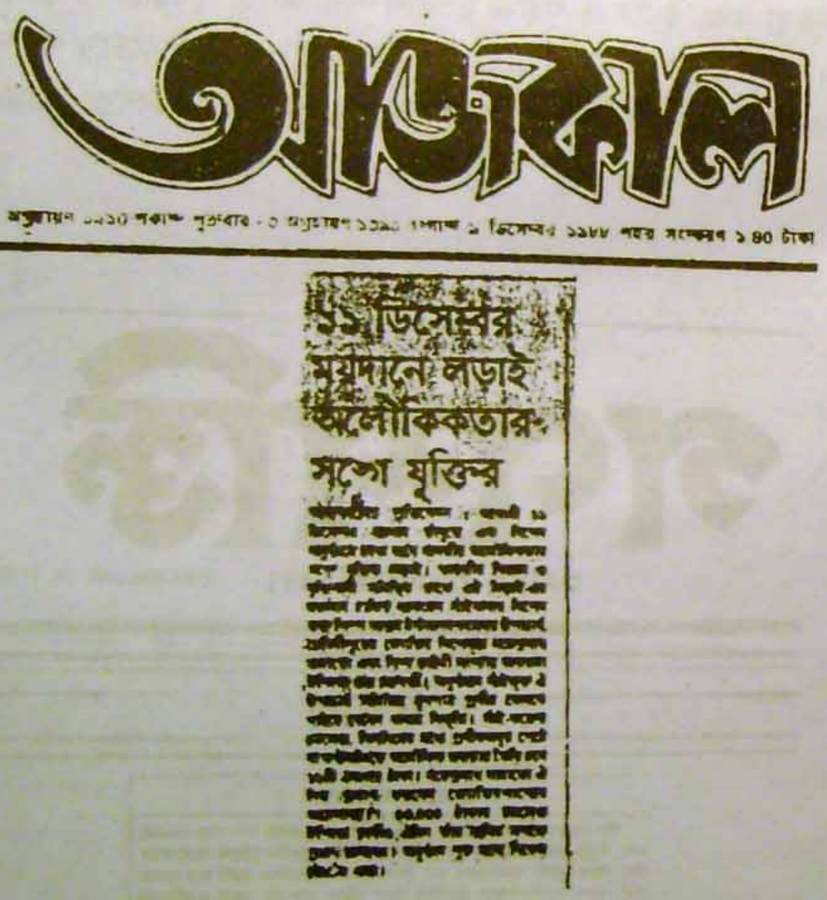
৯ ডিসেম্বর 'আজকাল'-এ এবং ১০ ডিসেম্বর 'গণশক্তি'-তে প্রকাশিত হল ১১ ডিসেম্বর ময়দানে হতে যাওয়া লড়াইয়ের খবর।

এসে গেল ১১ ডিসেম্বর। The Telegraph পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় তলায় চার কলম জুড়ে (প্রত্রিকার পরিভাষায় একে বলে anchor story, যা অতি গুরুত্বপূর্ণ) আমার ছবি ও প্রেস কনফারেন্সের খবরটি ছাপা হলো। খবরটি শিরোনাম ছিল 'Calcuttan to take on Satya Sai Baba'।

১১ ডিসেম্বর এসে গেল। সকাল হওয়ার আগেই তাঁবুতে জায়গা নিয়েছি। দুপুর থেকে তাঁবুর লনে পড়েছে কয়েকশ চেয়ার। বিকেলে প্রেস কনফারেন্স শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই হাজির কয়েকশ উৎসাহী জনতা। প্রেস কনফারেন্স শুরু হওয়ার অনেক আগেই প্রতিটি পত্র-পত্রিকা ও প্রচার-মাধ্যমের প্রতিনিধিরা টেন্ট ভরিয়েছেন। খবর শুনে এসেছেন দিল্লি, বম্বে, মাদ্রাজের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক। চারটেতে প্রেস কনফারেন্স শুরু করার কথা। তাই শুরু হলো। তবে তখনও উপাচার্য, তাঁর সচিব বা কোনও প্রতিনিধির দেখা নেই। মাইকে বার কয়েক আহ্বান জানান হল, তাঁরা থাকলে যেন এগিয়ে আসেন। এগিয়ে এলেন না। সাঁই বাবার বিভূতি লীলার মতই এও এক লীলা। নিজের বিভূতির গপ্পো প্রচার, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া এবং চ্যালেঞ্জ গৃহীত হওয়ার পর আপন খেয়ালে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া। পুরাণের কূর্ম অবতার চরিত্রটি সাঁইবাবার সম্ভবত সবচেয়ে পছন্দসই। তাই সাঁই অবতারের মধ্যেও বিপদে খোলোসে মুখ লুকোবার প্রবণতা আমরা দেখতে পাচ্ছি।


গণশক্তি
DAILY GANASHAKTI DECEMBER 10, 1988
দৃষ্টিপাত

সাংবাদিক ও দর্শকদের অবশ্য একঘেয়েমির কোনও অবকাশ ছিল না। ভাইস চ্যান্সেলারের সঙ্গে আমার পত্র-বিনিময়ের প্রতিলিপি তুলে দেওয়া হল সাংবাদিকদের হাতে। পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল বিভূতি বিশ্লেষণের দায়িত্বে থাকা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ও আমার পেটে অপারেশনের দায়িত্ব নেওয়া চিকিৎসকদের সঙ্গে। তারপরই চ্যালেঞ্জের বিষয়টা দর্শকদের উদ্দেশে জানিয়ে ভাইস চ্যান্সেলারের প্রতিক্ষায় চুপচাপ বসে না থেকে আমরা দেখতে শুরু করলাম নানা অলৌকিক ঘটনা; তবে লৌকিক উপায়ে। সাঁইবাবার শূন্য থেকে বিভূতি আনা, ছবি থেকে মধু ও বিভূতি ঝড়ানো, শূন্য থেকে লাড্ডু, প্যাঁড়া, শিবলিঙ্গ আনা — এমনি নানা ঘটনা।


আজকাল

১৮ অগ্রহায়ণ ১৪১০ শকাব্দ বুধবার ৩ জমাদিয়াল ১৩৯৯ হিজরা ৯ ডিসেম্বর ১৯৮৮ শহর সংস্করণ ১.৪০ টাকা

১১ ডিসেম্বর ময়দানে লড়াই অলৌকিকতার সঙ্গে যুক্তির

উত্তেজনা হল, হাততালি হল, হল অনেক কিছুই; কিন্তু যা হল না তা হল সাঁই-বিভূতির অক্ষমতা হাতে-নাতে প্রমাণ করা। তবে সেদিন প্রকাশ্যে ঘোষণা রেখেছিলাম — সাঁইভক্ত উপাচার্য আমার কাছে যে চ্যালেঞ্জ হাজির করেছিলেন,

তা ছিল শাঁখের করাত। চ্যালেঞ্জ নিলে মৃত্যু। না নিলে পরাজয়। বিভূতি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতেই সাঁইভক্তদের পিছিয়ে যাওয়া এই ধারণাকেই দৃঢ়বদ্ধ করে। এঁদের আড়ালের অবতারটিকে অর্থাৎ স্বয়ং সাঁইবাবাকে এবার পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি আমরা। প্রকাশ্যে নিরপেক্ষ স্থানে আপনার যে কোনও তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতা দেখাবার চেষ্টা করুন, আমরা প্রমাণ করে দেবই — যা দেখালেন তা অলৌকিক ক্ষমতা নয়, বুজরুকি।

১৯৮৪-র মার্চ-এপ্রিল-মে মাসে পরপর তিনটে চিঠি দিয়েছিলাম সাঁইবাবাকে। তাঁর বিভূতি সৃষ্টির ক্ষমতা বিষয়ে সত্যানুসন্ধান চালাবার অনুমতি ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলাম। তিনি পরিবর্তে যে চ্যালেঞ্জ শিক্ষা আশ্রম ইন্টারন্যাশনাল-এর উপাচার্যের মাধ্যমে ছুঁড়েছিলেন — তাই আজ বুমেরাং হয়ে ফিরে গেছে।



প্রেস কনফারেন্সে লেখক ও যুক্তিবাদী সমিতির সভারা।

পরের দিন শুধু কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোতে নয়, তামাম ভারতের বহু পত্রিকাতেই বিশাল গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক পত্রিকাতেই খবরের সঙ্গে ছিল ছবি। সঙ্গে আরও দুটি চ্যালেঞ্জের খবরও প্রকাশিত হয়েছিল। সেই দুটিও ওই প্রেস কনফারেন্সেই হওয়ার কথা ছিল হয়নি। উপাচার্যের মতই আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এক জ্যোতিষী নরেন্দ্র মাহাতো এবং আমরা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ছিলাম সেই সময়কার বিশাল আলোড়ন সৃষ্টিকারী ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতা রায়চক্রবর্তীকে। দু-জনেই বে-হাজির ছিলেন। সরাসরি পরাজয় থেকে বে-হাজির থাকা অনেক বুদ্ধিমানের কাজ বিবেচনায় বে-হাজির ছিলেন. কি না, এটা অবশ্য জেনে ওঠা হয়নি। তবে এমন সম্ভাবনাই প্রবল।

নরেন্দ্র ও ঈপ্সিতার মত দুই কীর্তিমান ও কীর্তিমতির কথা এই বইতে টানলাম না, 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থে এই বিষয়ে লেখা হয়েছে বলে।



বর্তমান

সোমবার ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৮৮ ।। ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩৯৫

ডাইনি এলেন না, কোন 'বাবা'-ও না, ময়দান-টেন্টে বুজরুকি ম্যাজিক

কথা ছিলো আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে প্রবীর ঘোষ প্রকাশ্যে ঘোষণা করবেন, সত্যসাঁই বাবার অলৌকিক ক্ষমতা বলে কিছু নেই। তিনি একজন ভণ্ড। তাঁর ভণ্ডামি ধরে ফেলেছেন তিনি। সত্যসাঁই বাবা যদি সত্যিই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন তবে তিনি যেন প্রবীর ঘোষের মুখোমুখি হন। প্রবীর ঘোষ তাঁর সঙ্গে বিতর্কে বসতে রাজি আছেন। এই ঘোষণা করবেন তিনি। ...

গণশক্তি

DAILY GANASHAKTI

দৃষ্টিপাত



The Telegraph



Prabir Ghosh

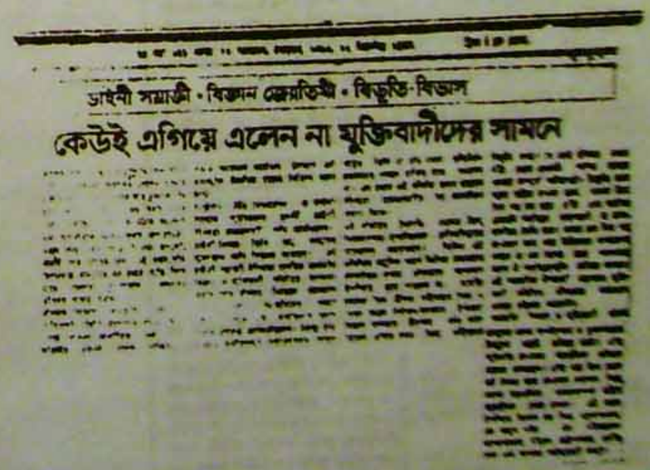
Round one to city rationalist

By Partha Guha

Calcutta, Dec. 11: City rationalist Prabir Ghosh has won the first round. Devotees of Sri Satya Sai Baba who had challenged him a week ago to perform miracles failed to turn up at the venue, Boys Scouts Tent at the Maidan.

Prabir Ghosh, a bank employee, is an amateur magician heading the Science and Rationalists' Association of India. He had openly challenged Sri Satya Sai Baba, even terming him a hoax. Members of Siksha Asram International, all devout Sai Baba fans, took up the challenge. Ghosh had suggested that the Sai Baba's miracles be tested on animals before him. Ghosh's terms were...

দৈনিক বসুমতী



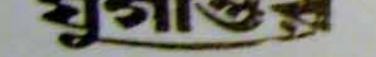
ডাইনী সম্রাজ্ঞী • বিজ্ঞান জ্যোতিষী • বিভূতি-বিভ্রাট

কেউই এগিয়ে এলেন না যুক্তিবাদীদের সামনে


দিনকাল

যুক্তিবাদী প্রবীরের চ্যালেঞ্জে

ঈপ্সিতা, অগ্নিতা, নরেন্দ্রনাথ কেউ এলেন না!


যুগান্তর

অলৌকিক নয় লৌকিক

হুজুর সাইদাবাদী : মন্তরে সন্তান লাভ!

হুজুর সাইদাবাদী বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় সুফী সাধক। বছর চল্লিশের এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীর দাবিদারের পিছনে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা যত নিউজ প্রিন্ট খরচ করেছেন, তার ভগ্নাংশও অন্য কোনও পীর বা সাধকদের পিছনে হয়নি। হুজুর মাঝে মাঝেই ভক্তদের টানে কলকাতায় আসতেন। সবাইকে তো আর চিঠি দিয়ে তাঁর আগমনবাণী পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়, তাই হুজুর নিজের ছবিসহ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দিতেন কবে থেকে কবে কলকাতায় থাকবেন, কোথায় থাকবেন, কখন দর্শন দেবেন। সাধারণভাবে তিনি উঠতেন এসপ্ল্যানেডের গ্রান্ট স্ট্রিটের হীরা হোটেলে।

হীরা হোটেল এমন একটা এলাকায়, যে এলাকা শাসন করে কলকাতার অপরাধী জগতের কিছু নামী-দামীরা।

হুজুর সাইদাবাদীর পুরো নামটা বেশ বড় — আলহাজ্ব হুজুর দেওয়ান মোহাম্মদ সাইদুর রহমান চিশ্‌তি সাইদাবাদী। সংক্ষেপে হুজুর সাইদাবাদী। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার জনপ্রিয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে কলকাতায় এলেন। জানালেন, থাকবেন ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি।

ঠিক করে ফেললাম, হুজুর সাইদাবাদীর মুখোমুখি হবো। মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা একটিই — পেশাদার গুণ্ডা ও খুনে। খবর পেয়েছি, কলকাতা ভ্রমণকে নিরুপদ্রব রাখতে আধ্যাত্মিক জগতের হুজুর রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা অপরাধ জগতের এক নবাবের সাহায্য নিয়েছেন। পেশাদার গুণ্ডা ও খুনেরা হুজুরকে ঘিরে গড়ে তুলেছে এক বলয়। প্রতিরক্ষার বলয়। কলকাতার যুক্তিবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করার বলয়।

হুজুর সাইদাবাদীর সম্বন্ধে ইতিমধ্যে অনেক খবর সংগ্রহ করেছি। বাংলাদেশের সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও যুক্তিবাদী বন্ধুরা ইতিমধ্যে পাঠিয়েছেন সেখানে হুজুর সাইদাবাদী বিষয়ে প্রকাশিত কিছু পত্র-পত্রিকা। পড়েছি 'বর্তমান দিনকাল', 'সাপ্তাহিক সাংবাদিক', 'সাপ্তাহিক নিপুন', 'বঙ্গবাসী', 'পাক্ষিক শেষ

সংবাদ' ইত্যাদি। পত্রিকাগুলো হুজুরের দোয়া আর দাওয়ার কীর্তিতে ঠাসা। গাদা গুচ্ছের দম্পতির ছবি, যারা হুজুরের দয়ায় সন্তান পেয়েছে। ছবি আছে সে-সময়কার রাষ্ট্রপতি হুসেন মহম্মদ এরশাদের সঙ্গে হুজুরের। ভক্তদের দাবি বেগম জিয়া থেকে শেখ হাসিনা — প্রত্যেকেই হুজুরের দরবার শরীফে শ্রদ্ধা জানাতে অসেন। দুষ্টেরা বলবেন — একজন সমাজ বিরোধীরা হাতে কয়েক লক্ষ ভোটার থাকলে দেশের রাষ্ট্রপতি সমাজ বিরোধীকে সেলাম ঠুকবেন — এ যুগের রাজনীতিতে এটাই নীতি। হুজুরের ভক্ত সংখ্যা তো আরও বেশি। এরশাদ রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন এক টাকার বিনিময়ে হুজুরকে ঢাকায় সাড়ে চার বিঘা জমি দিয়েছিলেন। সাড়ে চার বিঘা জমি জুড়ে হুজুরের বিশাল পাঁচতলা বাসভবন। ইসলামি স্থাপত্য শিল্পের এক নিদর্শন। দরবারা শরীফ ঘিরে মাদ্রাসা ও মসজিদ সহ একটা কমপ্লেক্স গড়ে তোলার কাজ চলছে। বহু কোটি টাকার প্রকল্প। এখন যতখানি গড়ে উঠেছে তা কলকাতার পাঁচতারা হোটেল গ্র্যান্ড, পার্ক বা তাজ-বেঙ্গলকে টেক্কা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। হুজুর এতটা বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও কোলকাতার কোনও পাঁচতারা হোটেলে না উঠে আস্তানা গাড়েন হোটেল হীরায় — এতে অনেকে অবাক হতে পারেন। আমি হই না। এখানে হুজুর গুণ্ডারাজের প্রোটেকশন পান। পান যুক্তিবাদীদের হাত থেকে বাঁচার নিশ্চিত আশ্বাস। পুরো হোটেলটাই বুক করার সুবিধা।

হুজুরের মাদ্রাসা ইতিমধ্যেই বিশাল আকার নিয়েছে। ১৯৯১-তে মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা দু হাজারের বেশি। প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ হাজার নারী-পুরুষের ভিড় হয়। এঁরা আসেন সন্তান কামনায়, রোগমুক্তি ও সমস্যা মুক্তির বাসনায়। হুজুর দোয়া আর দাওয়া দেন। দশনী দশ টাকা, দাওয়ার দাম আলাদা। কমপ্লেক্স গড়ার কাজে কেউ কিছু দিলে নেওয়া হয়। ভক্তদের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক নেতা, শিল্পপতি, সাহিত্যিক, অভিনেতা, পেশায় সফল বিখ্যাত মানুষের অভাব নেই।

১৬ ফেব্রুয়ারি সকালে হাজির হলাম হীরা হোটেলে। বাইরে তখনই কোয়ার্টার কিলোমিটার লম্বা ভক্তের লাইন পড়ে গেছে। লাইনের লোকেদের টোকন দিচ্ছে ও লাইন দেখভাল করছে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবক। স্বেচ্ছাসেবকদের চেহারা সত্যিই সন্দেহজনক। দেখলাম পরিকল্পনা মত লাইনে আমাদের সমিতির অনেকেই হাজির। 'আজকাল' থেকে আসছি, হুজুর সাইদাবাদীর একটা ইন্টারভিউ নিতে চাই' — রিশেপসন কাউন্টারে জানাবার পর জনা তিনেক মাতব্বর গোছের লোকের হাতে

হোটেল ম্যানেজার আমাদের তুলে দিলেন। তিনজনের একজন আবার কলকাতার একটি উর্দু পত্রিকার সাংবাদিক। তিনজনই অমীর মানুষ — বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। প্রায় এক ঘণ্টার মত আমাকে ও চিত্র-সাংবাদিক কুমার রায়কে পুলিশি জেরা করলেন। কুমারের পত্নী শ্যামলী, দশ বছরের মিতালি ও হাঁপানিক্লিষ্ট ননী আমাদের সঙ্গী। বোঝালাম, হুজুরের ইন্টারভিউয়ের পাশাপাশি আমার ও কুমারের এই তিন আত্মীয়ের জন্য হুজুরের কৃপা চাইতে এসেছি। একই সঙ্গে 'রথ দেখা ও কলা বেচা' সারতে চাইছি। কুমারকে ওর পরিচয়পত্র দেখাতে হল। আমাকে দেখে উর্দু সাংবাদিকের মনে হল চেনা-চেনা। কিঞ্চিত মেকাপে একদম ধে ধরা পড়িনি এই যথেষ্ট। শেষ পর্যন্ত বাধা টপকে দোতলায় গেলাম আমরা।

বড় ঘর। ঘর জুড়ে পুরু গদির ওপর দুধ সাদা চাদর পাতা। হুজুর হাসিমুখে আমাদের আহ্বান জানালেন। হুজুরের পরনে ধবধবে সালোয়ার ও সূক্ষ্ম কাজ করা ধবধবে পাঞ্জাবি। একটা সাদা ওড়নায় মাথা-কান-গলা ঢাকা। মুখে চাপ দাড়ি ও গোঁফ। স্বাস্থ্যবান। হুজুরের সামনে একটা জলচৌকি পাতা। জলচৌকিও সাদা কাপড়ে ঢাকা। হুজুরের পাশে আমাদের জেরা করা তিনজনেরই দেখা পেলাম। হোটেলের সবগুলো ঘর হুজুর তাঁর বাংলাদেশী শিষ্যদের জন্য বুক করেছেন। এঁদের নিয়ে গিয়েছিলেন খাজা মাইনুদ্দিন চিশতী-তে। ফেরার পথে কলকাতায়। হোটেল জুড়েই হুজুরের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচণ্ড দাপট দেখে সন্দেহ হল হোটেলের মালিকের সঙ্গে হুজুরের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রশ্নটা করতে উত্তর না দিয়ে হুজুর মোনালিসা মার্কা হাসি ফটিয়ে তুললেন মুখে।

হুজুরের মুখোমুখি বসলাম। কুমার ছবি তুলতে লাগলেন। আমাদের সঙ্গে আনা রোগীদের এই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশাধিকার দেননি হুজুর। ওরা এক তলায় সোফায় বসে। ঠিক সময়ে নাকি ওদের ডেকে নেওয়া হবে। হুজুরের একপাশে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত কিছু পত্র-পত্রিকা। আর একপাশে সুন্দর একটি পাত্রে সাজানো আতা, খেজুর, আপেল, আঙুর, কলা। আর একটি পাত্রে আখরোট, খেজুর, কাঠবাদাম, পেস্তা, কাজু ইত্যাদি শুকনো ফল। একটা বেতের ধামায় ডিমের খোসা।

হুজুরের দাবি, আধুনিক চিকিৎসা যে রোগীদের রোগমুক্ত করতে পারেনি, যে মহিলাদের মা হওয়ার অধিকার দিতে পারেনি, হুজুরের দোয়ায় তাঁরাই রোগমুক্ত হয়েছেন, কোল ভরে সন্তান এসেছে। দাবির সমর্থনে একগাদা পত্র-পত্রিকা আমার ও কুমারের সামনে হাজির করলেন। গাদা গাদা দম্পতি ও শিশুসহ দম্পতির ছবি। এ-সবই নিঃসন্তানের সন্তান লাভের প্রমাণ-পত্র। বর্তমান দিনকাল-এর ২৮

জানুয়ারি -২৬ ফেব্রুয়ারি '৯১ সংখ্যাটি তুলে দিলেন। প্রচ্ছদ জুড়ে হুজুরের ছবি। ইনসেটে কলকাতার সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড়ের রঙিন ছবি। বইরের ভেতর বহু পাতাই শুধু কলকাতার ভক্তদের ভিড়ের নানা ছবিতে ঠাসা।

প্রশ্ন রাখলাম, 'স্বামী জন্মদানে অক্ষম, সেক্ষেত্রেও স্ত্রীর পক্ষে মা হওয়া সম্ভব। কিন্তু যে মহিলার সন্তান-ধারণ ক্ষমতাই নেই তিনিও আপনার দোয়ায় মা হয়েছেন — এমনটা কি ঘটেছে?'

মিষ্টি বাঙাল ভাষায় হুজুর বললেন, 'আল্লার রহমতে, দোয়ায় সবই সম্ভব। তিনি চাইলে পুরুষ মানুষেরও বাচ্চা হইবো। মেয়েরা হইল গিয়া মায়ের জাত। মা হওনের মধ্যেই তাগো জীবনের সার্থকতা, পূর্ণতা। তাই কেউ যখন মা হওনের বাসনায় আমার কাছে আসে, তারে ফিরাইতে পারি না।'

'সে-ক্ষেত্রে আপনি কি করেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'নিঃসন্তান দম্পতিকে আনতে হয় একটা কাঁচা ডিম ও একটা পাকা কলা। ডিম ধইরা থাকেন বউ। আমি দোয়া পইড়া ডিমে তিনবার টোকা দেই। আল্লার রহমত হইলে কাঁচা ডিম মুহূর্তে সিদ্ধ হয়। ডিমের কুসুম খাইতে বলি মা'রে। কলায় দোয়া পইড়া খাইতে বলি মা'রে।'

'আর রোগের ক্ষেত্রে?'

'কাগজে লেখা দোয়া দেই। রোগ বিশেষে দোয়ার কাগজ পানীতে ডুবাইয়া রাইখ্যা, সেই পানী দিনে একবার খাইতে কই। এই পানী সাত দিন থিক্যা আরও বেশি দিন পর্যন্ত খাইতে হইতে পারে। আবার কোনও ক্ষেত্রে দোয়ার কাগজ তেলে ডুবাইয়া রাইখ্যা সেই তেল মালিশ করতে কই। এই মালিশও সাত দিন থিক্যা বেশি দিন পর্যন্ত নির্দেশ দেই।'

তিন টোকায় ডিম সেদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা দেখে একবার আমার চোখকে সার্থক করতে চাইলাম। দেখলাম পাঁচটি দম্পতি আমাদের সামনে একে একে এলেন। একটি করে দম্পতি ঘরে ঢুকছিলেন। হুজুর প্রতিটি মহিলাকেই 'মা' সম্বোধন করে তার মুখোমুখি বসাচ্ছিলেন। দুজনের মাঝে জলচৌকি। আমি পাশে বসে দেখছিলাম। কুমার ছবি তুলছিলেন। দম্পতির কাছে হুজুর সমস্যা জানতে চাইছিলেন। পাঁচ দম্পতিই এসেছেন সন্তান কামনায়। 'ডাক্তার দেখিয়েছিলেন? কতকদিন ধরে চিকিৎসা করাচ্ছেন? ডাক্তার কি বলেছেন?' ইত্যাদি প্রশ্নগুলো পরম মমতায় জিজ্ঞেস করছিলেন হুজুর। তারপর পাঁচজনকেই জিজ্ঞেস করলেন — 'কাঁচা ডিম আর পাকা কলা আনছেন?' প্রত্যেকেই এনেছিলেন। মহিলার হাত

থেকে ডিমটা নিয়ে হুজুর জলে ডিমটা ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে জলটুকু মুছে ডিমটা তুলে দিচ্ছিলেন মহিলাটির হাতে। তারপর কয়েক সেকেন্ড দোয়া পড়ে ডিমে আঘাত করছিলেন প্রতিটি ক্ষেত্রে। ডিমের খোলা ফেটে যাচ্ছিল। পাঁচটার মধ্যে তিনটি ক্ষেত্রে ডিম কাঁচাই রয়ে গেল। দুটি ক্ষেত্রে অবাক হয়ে দেখলাম ডিম সেদ্ধ হয়ে গেছে! যাদের ক্ষেত্রে সেদ্ধ হয়নি, তাঁরা যে আল্লার রহমত পাননি, সে কথা অত্যন্ত দুঃখ ও বিনয় মিশিয়ে দম্পতিকে জানিয়ে দিচ্ছিলেন হুজুর। যে দু-জনের ডিম সেদ্ধ হল, তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন কলা এনেছেন কি? কলার দুয়া পড়ে দিয়ে হুজুর সামান্য ইশারা করতেই হাজির দরজার গোড়ায় অপেক্ষমান কোনও শিষ্য। হুজুর আদেশ দিচ্ছেন — 'এনারে সব নিয়ম-কানুন ভাল কইরা বুঝাইয়া দাও।' দম্পতিদের নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন শিষ্যরা। একটা বিষয় লক্ষণীয় — সে দু-জনেরই ডিম সিদ্ধ হয়েছে, যাদের সন্তান না হওয়ার কারণ স্বামীর অক্ষমতা। যে তিনজনের ডিম কাঁচা ছিল, সেই তিনজনই জানিয়ে ছিলেন সন্তান না হওয়ার কারণ স্ত্রী'র অক্ষমতা।



হুজুর সাইদাবাদী ও লেখক।

হুজুর আমাদের ফল খাওয়ালেন। এবং জানালেন, 'আজ আর নয়। কাল আসেন রোগীগো নিয়া।' তারপর অমাকে বললেন, 'কাল রিক্সায় বল বেয়ারিংয়ের একটা লোহার বল অবশ্যই আনবেন।'

কেন লোহার বল বেয়ারিং? এই প্রশ্নটা ভাবতে ভাবতে বারান্দায় পা বাড়াতেই দেখলাম শেষ দম্পতির মহিলা দুই শিষ্যের সঙ্গে একটা ঘরে ঢুকছেন। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। সিঁড়ির গোড়ায় তখন দম্পতির পুরুষটি। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার স্ত্রী'কে দেখতে পাচ্ছি না তো?'

'ও নিয়ম-টিয়মগুলো বুঝে আসছে।' বললেন, সরল মানুষটি।



মিতালি মুখার্জির সঙ্গে লেখক।

আজ ভিড় আরও বেশি। আমরা অবশ্য চট্‌পট্‌ ওপরে যাওয়ার সুযোগ পেলাম। আমাদের প্রথম রোগী শ্যামলী নাথ। ঠিকানা : ১১/৫ যোগীপাড়া রোড, কলকাতা - ২৮। থ্যালাসেমিয়া রোগী। হুজুর বললেন, 'তোমার তো মা টিবি হইছে।' হুজুরের রোগ নির্ণয়ে এমন জব্বর ভুল দেখে শ্যামলী হুজুরের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল। আমি সামাল দিলাম। হুজুরের দু-পাশেই দু-সারিতে সবুজ ও লাল কালিতে ছাপানো দোয়ার কাগজ রয়েছে। সবুজ কাগজটা দিয়ে বললেন, 'এটা জলে ডুবিয়ে সকালে রাতে দুবেলা খাবেন এক মাস। লাল কাগজটা তেলে ডুবিয়ে সেই তেল বুকে পিঠে মালিশ করবেন এক মাস। সাড়ে দশ বছরের মিতালি মুখার্জি থাকে ১২৬এ সুকান্ত সরণি, কলকাতা ৮৫তে। নেফ্রাটিসে ভুগছে। রোগের কথা বলায় হুজুর বললেন, 'বয়স কত?' বয়স শুনে জানালেন বারো বছরের নিচে কারও জন্য দোয়া করেন না। ননী ভৌমিক ২০/১বি জে এন ব্যানার্জি লেন, কলকাতা ৩৬-এর বাসিন্দা। হাঁপানিতে ভুগছেন কুড়ি বছর ধরে। তাঁকেও সবুজ

ও লাল দোয়া দিলেন। জলে ভিজিয়ে পান করতে ও তেল মালিশ করতে বললেন। বেলেঘাটার কোলে ব্যারাকের তিমিরবরণ ঘোষদস্তিদার ও জয়া ঘোষদস্তিদার হাজির হলেন সন্তান কামনায়। জয়ার হাতের ডিমটা হুজুর নিয়ে একটা স্টিলের বাটিতে রেখে একটা বোতল থেকে জল ঢাললেন বাটিতে। ডিমটা একটু ধুয়ে তোয়ালেতে মুছে জয়ার হাতে ধরিয়ে দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড দোয়া পড়ে একটা স্টিলের চামচ দিয়ে আঘাত করলেন ডিমে। খোলা ভেঙে যেতেই দেখা গেল ডিমটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। আরও অবাক কাণ্ড, কাঁচা ডিমে ভট পেনে দেওয়া চিহ্ন নেই এই ডিমে। জয়া, তিমির, কুমার এবং আমি ডিম পরীক্ষা করে স্পষ্টতই বুঝলাম ডিমটা পাল্টে দেওয়া হয়েছে তোয়ালে দিয়ে মোছার সময়ে। হুজুর একজন বড় দরের জাদুকর মাত্র। হাতটা সত্যিই ভালো। হুজুরের বিশাল ভাড়াটে সৈন্য-সামন্তের সামনে এই মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হঠকারিতা বিবেচনায় আমরা চুপ করে থাকতে বাধ্য হলাম। এরপরই ঢুকলেন আর এক হিন্দিভাষী দম্পতি। অমাকে ও কুমারকে হুজুর থাকতে বললেন। মহিলা ডিম বের করলেন, ডিমের গায়ে নীলাভ আভা দেখে হুজুর বললেন, 'এই ডিমে হবে না, সাদা ডিম নিয়ে আসতে হবে।' বুঝলাম, নীলাভ সিদ্ধ ডিম না থাকতেই হুজুর তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখানো থেকে বিরত থাকলেন।

এবার আমার হাত থেকে লোহার গুলিটা চেয়ে নিয়ে একটা লাল দোয়া লেখা কাগজে রেখে কাগজটা মুড়িয়ে একটা উর্দু লেখা কবচে ঢুকিয়ে মোম দিয়ে কবচের মুখ বন্ধ করে কালো সুতো দিয়ে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখন দশটা পঁচিশ। ঠিক একটা পঁচিশের পর কবচটা খুলে যদি দেখেন আল্লার রহমতে লোহা সোনা হয়ে গেছে, তবে আপনি এখানে সোজা চলে আসবেন। তিন ঘন্টার আগে খুলবেন না। তবে কিন্তু আল্লার রহমত পাবেন না, লোঁহা লোহাই থেকে যাবে।

রিসেপশন কাউন্টারে দেখা পেলাম উর্দু পত্রিকার সাংবাদিকটির। তাঁর হাতেই খাম বন্দি একটা চিঠি দিয়ে বললাম, 'এটা হুজুর সাহেবকে দেওয়ার কথা ছিল। আর উঠব না। আপনি প্লিজ এটা হুজুর সাহেবের হাতে দিয়ে দেবেন।'

'কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি।'

হোটেল থেকে বেরুতেই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সমিতির অনেকেই টুক-টাক খসে পড়লেন লাইন থেকে। আমরা সকলে মিলে একটু হেঁটে ঢুকলাম একটা চায়ের দোকানে। কবচটা খুললাম। বেরিয়ে এল সোনার গুলি। তিন ঘন্টা নয়, পনের মিনিট পরেই।

ফ্ল্যাটে ফিরে আমরা কয়েকজন পরবর্তী পদক্ষেপের কথা আলোচনা করছি এমনি সময় হুজুরের ফোন পেলাম। তিনি নরম মিষ্টি গলায় জানালেন, আমার চ্যালেঞ্জ জানানো চিঠি পেয়েছেন। কিন্তু আমি কি পেয়েছি কবচটা খুলে? লোহা কি সোনা হয়নি? হলে এখনও হাজির হয়নি কেন?

জানালাম হোটেল থেকে বেরিয়েই তাবিজ খুলেছি। তখনই তাবিজে লোহার বদলে সোনার গুলি। হাত সাফাই করে গুলি বদলে সোনার গুলি আপনি পুরে দিয়ে থাকলে তিন ঘণ্টা আর তিন মিনিট সবই একই ব্যাপার। খুললে সোনাই পাব।

এ-সব শোনার পরও হুজুর আকাশের মত উদার গলায় জানালেন — আমার সহযোগিতা চান। সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক থাকলে যেন আগামী কাল সকালে হীরা হোটেলে দেখা করি। দেখা করার পক্ষে জায়গাটা আমার পছন্দ না হলে এয়ারপোর্টেও দেখা করতে পারি। প্লেনের সময় জানিয়ে দিলেন। এও জানাতে ভুললেন না — সহযোগিতা করলে সোনার গুলি গোলা হয়ে যাবে, এক সেরি গোলা। হুজুর দরাজ গলায় হাসলেন।

না। দেখা করিনি। পরিবর্তে দেখা করেছিলাম কলকাতাস্থিত বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনারের সঙ্গে। তবে তা এপ্রিলের ২৪ তারিখে। ইতিমধ্যে হুজুর সাইবাদীকে নিয়ে আমার একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়ে গেছে। ডেপুটি হাইকমিশনারের হাতে যুক্তিবাদী সমিতির প্যাডে লেখা একটি চিঠি তুলে দিই। চিঠির সঙ্গে আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের কপি, হুজুর সাইদাবাদীর দেওয়া বিজ্ঞাপনের কপি ও যুক্তিবাদী সমিতির তরফ থেকে হুজুরের হাতে তুলে দেওয়া চিঠির কপি যুক্ত করে দেওয়া হয়।

ডেপুটি হাইকমিশনারকে লেখা চিঠির কপি এখানে তুলে দেওয়া হল —

শ্রদ্ধেয়

বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনার

৯, সার্কাস এভিনিউ

কলকাতা - ৭০০ ০১৭

সম্প্রতি আমরা গভীর দুঃখ, শঙ্কা ও তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, আপনার দেশের নাগরিক 'হুজুর দেওয়ান মোহাম্মদ সাইদুর রহমান চিশ্‌তি সাইদাবাদী' নামধারী জনৈক ব্যক্তি মাঝে-মাঝেই আমাদের দেশে আসছেন এবং এ-দেশের পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন — তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার

দ্বারা নিঃসন্তান রমণীকে মা করে দেবেন, রোগীদের রোগমুক্ত করবেন এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

এই মিথ্যা বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ করে হুজুর সাইদাবাদী আমাদের দেশের অসহায়, বঞ্চিত, অজ্ঞ ও অন্ধবিশ্বাসী মানুষদের প্রতারিত করছেন। হুজুরের আসল আকর্ষণী ক্ষমতা — দুয়া পড়ে কাঁচা ডিমকে সিদ্ধ করে দেওয়া।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি হুজুর কলকাতায় ছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির আমি প্রধান সম্পাদক আমি গত ১৬ ফেব্রুয়ারি হুজুরের সঙ্গে দেখা করি। সে সময় হুজুর দাবি করেন, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় যে কোনও রোগীকে রোগমুক্ত করতে সক্ষম এবং মা হতে ইচ্ছুক মহিলার আনা কাঁচা ডিম 'দুয়া' পড়ে তিনি সিদ্ধ করে দেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি হুজুরের কাছে আমরা তিনজন রোগীকে হাজির করি। তিনি রোগীদের 'দুয়া' দেন। তা সত্ত্বেও রোগীদের অবস্থা গত দু'মাসে ভালো হয়নি।

এক দম্পতিকে হাজির করেছিলাম। মহিলাটির হাতে ছিল ছিল একটি কাঁচা ডিম। হুজুর দুয়ায় ডিম সিদ্ধ না করে কাঁচা ডিমটি একটি সিদ্ধ ডিমের সঙ্গে পাল্টে দিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্তে আসার কারণ — কাঁচা ডিমে ডট্ পেন দিয়ে যে চিহ্ন করে দেওয়া ছিল, সিদ্ধ ডিমে তা ছিল না।

১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখেই আমাদের সমিতির তরফ থেকে হুজুরকে একটি চিঠি দেওয়া হয়। চিঠিতে হুজুরকে প্রকাশ্যে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ রাখতে আহ্বান জানান হয়েছিল। হুজুর তাঁর দাবিমত আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে হাজির করা তিন রোগীকে রোগমুক্ত করতে পারলে আমরা অবশ্যই ধরে নেব তাঁর দাবিগুলো চূড়ান্ত মিথ্যা এবং তিনি একজন প্রতারক মাত্র।

আমরা গভীরভাবে আশা রাখি এবং সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি — আপনারা একজন প্রতারককে আমাদের দেশে আসার 'পাশপোর্ট দিয়ে আমাদের দেশে তাঁর প্রতারণা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা করবেন না।

আমাদের হাজির করা তিন রোগীকে দম্পতির বিষয়ে আপনাকে অবগত করতে ৭এপ্রিল ১৯৯১ তারিখের আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত এই সম্বন্ধীয় একটি লেখার জেরক্স কপি ও ১৮.৪. ৯১ 'বর্তমান' পত্রিকায় প্রকাশিত হুজুর সাইদাবাদীর বিজ্ঞাপনের একটি জেরক্স কপি পাঠালাম।

হুজুরের সঙ্গে কথা বলে এবং তাঁর সম্বন্ধে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রতিবেদন পড়ে জেনেছি, তিনি প্রতি দু'মাস অন্তর ভারতে জনসেবার নাম করে জনগণকে স্রেফ প্রতারিত করতে আসবেন।

আমরা আশা রাখি, আপনাদের দেশ এমন একজনকে আমাদের দেশে আসার অনুমতি দেবেন না, যিনি আমাদের দেশের জনগণের বিশ্বাস ও সরলতার সুযোগ নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁদের স্রেফ প্রতারিত করে যাবেন।

আবারও এই আশা রেখে শেষ করছি, আপনি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধাসহ

প্রবীর ঘোষ

প্রধান সম্পাদক

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

যাঁদের চিঠির প্রতিলিপি পাঠান হচ্ছে :

এক : স্বরাষ্ট্র সচিব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মহাকরণ

কলকাতা

দুই : পুলিশ কমিশনার

লালবাজার

কলকাতা

হুজুর সাইদাবাদীকে যে চিঠি সমিতির প্যাডে দেওয়া হয়েছিল, তা হল:—

হুজুর সাইদাবাদী,

হীরা হোটেল,

কলকাতা।

ইতিপূর্বে আপনি বাংলাদেশ থেকে কলকাতা এসেছিলেন এবং বিপুল সাড়া জানিয়েছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আপনার খবর ও বিজ্ঞাপন পড়েছি। আপনি নিঃসন্তান দম্পতিকে ডিম ও কলার কিছু অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ করে সন্তান দেন ও অন্যান্য রোগীকে রোগ মুক্ত করেন এবং

বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে থাকেন বলে পত্র-পত্রিকা পাঠে মনে হয়েছে।

আমাদের সমিতি অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় জানতে অত্যন্ত আগ্রহী। কোন অলৌকিক ঘটনা বা কোনও ব্যক্তির অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে শুনলে আমরা যথাসাধ্য সত্যানুসন্ধান চালিয়ে থাকি। আশা রাখি আমাদের এই ধরনের সত্যানুসন্ধানের প্রয়াসকে প্রতিটি সৎ মানুষের মতই আপনিও স্বাগত জানাবেন এবং সেই সঙ্গে আপনার অলৌকিক ক্ষমতার সত্যানুসন্ধানে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

আপনার সামনে আমরা হাজির করতে চাই পাঁচজন রোগী ও দুটি নিঃসন্তান দম্পতি। আপনি আপনার অলৌকিক ক্ষমতায় রোগীদের এক বছরের মধ্যে রোগ মুক্ত করতে পারলে এবং দুটি দম্পতিকে সন্তান দিতে পারলে আপনার অলৌকিক ক্ষমতা স্বীকার করে নেব এবং প্রণামী হিসেবে আপনাকে ভারতীয় অর্থে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবো, সমিতি ভেঙে দেব। আপনি আমাদের সত্যানুসন্ধানে সহযোগিতা না করলে অবশ্যই ধরে নেব এবং আপনি একজন প্রতারক মাত্র।

নমস্কারান্তে —

প্রবীর ঘোষ

সাধারণ সম্পাদক

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

আমাদের এই সমস্ত কাজ-কর্মের ফলশ্রুতি হিসেবে এইটুকু হল যে, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেণ্ট-এর 'চিটিং অ্যান্ড ফ্রড' শেকসনের অফিসার ইনচার্জ আমাকে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে চিঠি দিয়ে জানালেন, হুজুর সাইদাবাদীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আপনারা বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনারের কাছে করেছেন এবং সেই চিঠির যে প্রতিলিপি অন্যদের দিয়েছেন, সেই প্রেক্ষিতে আমি উচ্চতর মহল থেকে তদন্ত করার আদেশ পেয়েছি। এখন এই তদন্তের জন্য আপনার পরীক্ষা ও মতামত জানা এই তদন্তের পক্ষে খুবই জরুরী। আপনাকে ভবানী ভবন, কলকাতা - ২৭-এ ১৩.৫.৯১ দুপুর ১২টায় নিম্ন সাক্ষরকারীর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

এরপর অফিসার ইনচার্জের সঙ্গে আমাদের সমিতির কয়েকজন গিয়ে দেখা করেছি। বিস্তৃতভাবে সব জানিয়েছি। উনি আমাদের বলেছেন শ্যামলী, মিতালী,

ননী, তিমিরবরণ ও জয়াকে তাঁদের কাছে হাজির করতে। শ্যামলী ছাড়া অন্যান্যদের হাজির করেছি। অনুরোধ রেখেছি শ্যামলীর ঠিকানায় গিয়ে তদন্তের প্রয়োজনীয় কাজ করতে।

এরপর পুলিশের তরফ থেকে কোনও সাড়া পেলাম না। কিন্তু হুজুর আবার এলেন। বিজ্ঞাপন দিয়েই এলেন। তবে একটু দেরি করে। সেই হীরা হোটেলেই উঠলেন। এ-বার সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও জোরালো। আমাদের ছেলেরা তারই মধ্যে প্রচুর পোস্টারে ভরিয়ে দিল হীরা হোটেল ও তার সংলগ্ন স্থান। দেওয়ালে দেওয়ালে সাঁটা হল আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি। পোস্টারে দাবি জানানো হল হুজুরের গ্রেপ্তারের। হুজুরের ভাড়াটে সেনারা আমাদের দৃঢ়তা দেখে পিছু হটল। হুজুরের ব্যবসাটা সেবার জমল না।

হুজুর আবার এলেন। তবে আরও বড় একটা গ্যাপ দিয়ে। স্থান পাল্টে গেলেন পার্কসার্কাসের হীরা ইন্টারন্যাশন্যাল হোটেলে। আমাদের ছেলেরা পিছু ছাড়ল না। কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিকের এক মহিলা সাংবাদিক পার্কসার্কাসে হুজুরের ডেরায় যাবেন ঠিক করে আমার সঙ্গে দেখা করলেন, আমার অনেক দুষ্প্রাপ্য ছবি নিলেন তাঁর পত্রিকাটিতে ছাপার জন্য। বললেন, কপি করে ফেরত দেবেন। আমাদের ছেলেরা এখানেও পোস্টারিং করেছে। হোটেল হীরা ইন্টারন্যাশনালে সাংবাদিক গেলেন। হুজুরের সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে হুজুরের চামচাদের সাক্ষাৎকার দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত তিনি পালাতে বাধ্য হলেন। পত্রিকা দপ্তরে ফিরে তিনি আমাকে ফোন করে গায়ের ঝাল মেটালেন, ভয়ংকর এক বিপদের মুখে তাঁকে ঠেলে দেওয়ার জন্যে। আমি নাকি বাস্তব ভয়ংকর চিত্রটা ঠিক মত তুলে না ধরায় তাঁর জীবন বিপন্ন পর্যন্ত হতে পারে। হুজুরের লোক নাকি গাড়ি ফলো করে তাঁর পত্রিকার অফিসটিও দেখে গেছে। এখন তাঁকে নাকি এসকর্ট নিয়ে কিছু দিন চলতে হবে। আর এইসব মুশকিলের কারণ নাকি আমি। শুধু ওই মহিলাই নন, তাঁর সহকর্মী এক সাংবাদিক বন্ধুও ফোনে অভিযোগ করলেন, হুজুরের ভয়ংকর চরিত্রটা আমি তাঁর সহকর্মীকে নাকি জানাইনি। এটা নাকি আমার পক্ষে গর্হিত অন্যায় হয়েছে। ফল — পত্রিকায় আমাকে নিয়ে লেখার পরিকল্পনা বিসর্জন এবং আমার কোনও ছবি ফেরত না দেওয়া।

যাই হোক, এতো গেল একটা সাইড স্টোরি। কিন্তু আসল স্টোরি সব সময়ই তারচেয়ে অনেক বেশি রোমাঞ্চকর হয়ই। আমরা আমাদের কাজ করে গেছি। লাগাতার ভাবে ঘটনাটা কলকাতা পুলিশের নজরে এনেছি। অবশ্য কলকাতা

পুলিশের নজর আমাদের কাজ-কর্মে এমনিতেই আকর্ষিত হচ্ছিল। কারণ হুজুর সাইদাবাদীর বিরুদ্ধে আমাদের পোস্টার অভিযানের ছবিসহ খবর ইতিমধ্যেই আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যে কোনও সময় একটা বড় রকমের ঘটনা যে ঘটতে পারে তাও পুলিশের অজানা ছিল না। পুলিশ কমিশনার পাল্টেছেন, ডি সি ডি ডি পাল্টেছেন। আমরা আমাদের স্ট্যান্ড পাল্টাইনি। প্রত্যেকের কাছে আমরা দাবি জানিয়েছি 'ড্রাগ ও ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট' ভঙ্গকারী প্রতারক হুজুর সাইদাবাদীকে গ্রেপ্তার করার জন্য। আমরা এও জানিয়েছি — হুজুরের দৌলত কলকাতার যে সব দম্পতি সন্তান লাভ করেছেন বলে দাবি করা হয়েছে, তার সত্যতা জানতে আমরা অনুসন্ধান চালিয়েছি। ওইসব দম্পতির ঠিকানার কোনও হদিস পাইনি।

লাগাতারভাবে লেগে থাকার ফল পেলাম ২১ ফেব্রুয়ারি'৯৭। ঐতিহাসিক ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু বুজরুকি, প্রতারণা ও ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিজ অ্যাক্ট ভঙ্গ করার দায়ে গ্রেপ্তার হলেন। গ্রেপ্তার হলেন হীরা হোটেল থেকেই।



লালবাজার থেকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হুজুর।

এ-বারও আসার আগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দুটি বাংলা দৈনিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলা হয়েছিল, হুজুরের দোয়ায় নিঃসন্তান দুই দম্পতির সন্তান লাভের গপ্পো। এক দম্পতির কলকাতার ঠিকানা ছিল। গোয়েন্দা দপ্তরের অফিসাররা বিজ্ঞাপন দেওয়া দম্পতির ঠিকানার কোনও হদিস পাননি।

২২ ফেব্রুয়ারি শনিবার ছিল হুজুরকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হাজির করার দিন। সকালে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার নজরুল ইসলামের সঙ্গে কথা হল। জানালাম — আমরাও হুজুরের বিরুদ্ধে পার্টি হতে চাই। ওকে শাস্তি দেওয়ার মত অনেক তথ্য আমাদের কাছে আছে।

২২ ফেব্রুয়ারি বিচারক রায় দিলেন ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ লকআপে রাখার।

পুলিশ সূত্রে খবর পেলাম ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশ বিষয়টি জানিয়েছেন বাংলাদেশ মিশন, বিদেশ মন্ত্রক ও রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে। একজন আই পি এস এও জানালেন, আমাদের হাতে যতই তথ্য-প্রমাণ থাক সাইদাবাদীকে আমাদের ছেড়ে দিতেই হবে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়করা ফোন করবেন, আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়করা ছেড়ে দেবেন।

ধর্মীয় নেতা, সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় নেতা, বিদেশী ধর্মীয় নেতা, বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের কাছের ধর্মীয় নেতাকে শাস্তি দেওয়ার সাধ্য গদি বাঁচাতে সদা তৎপর শাসক গোষ্ঠীর নেই। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও দেশের গণতন্ত্র শক্তিমানেরা নিজের পকেটে রেখে ঘোরেন। তাই হুজুর হয়তো অবাঞ্ছিত বিদেশী হিসেবে এ-দেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে শাস্তি এড়াবেন। তবু পাল্টা স্রোতে চলে যা করা গেল, তাই বা কম কী? মহাবৃক্ষের বীজ তো পোঁতা গেল। সেরুলোর মত হুজুরকেও বড়-সড় একটা আঘাত হেনে বোঝান গেল এ-দেশে বুজরুকি চালান সম্ভব নয়। বন্ধ করা গেল এ-দেশে ভবিষ্যতে পা রাখার সম্ভাবনা।

জলাতঙ্ক ও দৈব-চিকিৎসা

তামাম ভারতের বহু গ্রামাঞ্চলে কুকুরে কামড়ালে এক ধরনের দৈব চিকিৎসার সাহায্য নেওয়া হয়। জনপ্রিয় এই দৈব চিকিৎসা পদ্ধতিটি এমনই বিচিত্র যে, চিকিৎসার গোটা প্রক্রিয়াটি দেখলে সাধারণভাবে বিশ্বাস উৎপাদন হওয়া স্বাভাবিক। চিকিৎসা পদ্ধতি এই ধরনের —

চক্‌চকে শানবাঁধানো চাতালের ওপর নতুন একটি বড়-মুখ মাটির পাত্র বসান হয়। পাত্রের মুখের ওপর বসান হয় একটি পিঁড়ি। পিঁড়ির ওপর উবু হয়ে বসে রোগী, মাটির পাত্রটি গোলাকার, তাই রোগী পিঁড়িতে বসে টলমল করে। রোগীর দু-পাশে দৈব চিকিৎসকের দু-জন লোক দাঁড়ান। তারা দুজনে রোগীর দু-হাতের আঙুল ধরে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

এবার শুরু হয় দৈব চিকিৎসার দ্বিতীয় পর্যায়। দৈব চিকিৎসক দেবী বিষহরির মন্ত্র পড়তে পড়তে একটি মাটির পাত্রে রাখা গোটা মাষকলাই ডাল মুঠো করে তুলে ছুড়ে মারতে থাকে রোগীর বসা মৃতপাত্রের গায়ে। এক সময় মৃৎপাত্রটি ঘুরতে শুরু করে। কেউ রোগীর আঙুল ছুঁয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করছে না। অথচ আশ্চর্য রোগী টলমল করছে না!

মৃৎপাত্র ঘুরছে, রোগী ঘুরছে, দৈব চিকিৎসক বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে মাষকলাই ছুড়ে চলেছে, এমনটা চলতে থাকে অনেকক্ষণ, তারপর এক সময় আপনা থেকেই মৃৎপাত্র ভেঙে পড়ে রোগীসুদ্ধ। এই ভেঙে পড়ার অর্থই নাকি রোগীর বিষ নেমে যাওয়া।

গ্রামবাসীদের মধ্যে এ-ভাবে বিষ নামানোর ব্যাপারে গভীর বিশ্বাস রয়েছে। এই বিশ্বাসের পক্ষে যে-সব যুক্তি তাঁরা বারবার খাড়া করেন, সেগুলো হল : (এক) টলমল করে বসা রোগী ঘুরন্ত পিঁড়ির ওপর কিভাবে ঠিক্‌ঠাক বসে থাকে? (দুই) মাটির পাত্র রোগীকে নিয়ে আপনা থেকে ঘুরতে শুরু করে কোন্ শক্তির প্রভাবে? (তিন) মাটির পাত্র আপনা থেকে ভাঙে কি করে? (চার) মাটির পাত্র ভাঙে বিভিন্ন

রোগীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে। কারও ক্ষেত্রে ভাঙে দশ মিনিটে, কারও ক্ষেত্রে বা কুড়ি মিনিটে। দৈব চিকিৎসক বলেন — বিষ শরীরের যত গভীরে যায়, নামতে তত সময় লাগে। তাই বিষ-প্রবেশের গভীরতা অনুসারে নামার সময়ের তারতম্য ঘটে, তাই তারতম্য ঘটে হাঁড়ি ভাঙার সময়ের। এই যুক্তিকে অস্বীকার করি কি যুক্তি দিয়ে? (পাঁচ) এই দৈব চিকিৎসার পর প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় রোগীর জলাতঙ্ক হয় না।

প্রশ্নগুলোর ব্যাখ্যা রাখছি এবার

এক এবং দুই : সাইকেল দাঁড়িয়ে থাকলে সাইকেলের আরোহীর ব্যালেন্স রাখা কঠিন হয়। ব্যালেন্স রাখতে তার মাটিতে পা রাখার বা বন্ধুর কাঁধে হাত রাখার প্রয়োজন হয়। সাইকেল চলতে থাকলে ব্যালেন্সের জন্য এই সাহায্যের আর প্রয়োজন হয় না।

সাইকেল চালাবার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন হয়, পিঁড়ির ওপর উবু হয়ে বসতে সেটুকু শিক্ষারও প্রয়োজন হয় না। রোগী আগে থেকেই শুনেছে মন্ত্রে মাটির পাত্র ঘোরে। দৈব চিকিৎসকের দুই সহকারী যারা রোগীর দু-আঙুল ধরে থাকে, তারা রোগীকে সামান্য একটু ঘুরিয়ে দেয়। তারপর রোগী ভাবতে থাকে মন্ত্রের জোরে এ-বার সে ঘুরতে থাকবে। তার এই চিন্তার কারণে নিজের অজান্তে নিজে ঘুরতে থাকে (অবচেতন মনের এই ধরনের এবং আরও নানা ধরনের বিচিত্র সব কাণ্ড কারখানা নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। তাই এই বিষয়ে আবার বিস্তৃত আলোচনায় ঢুকছি না)। সুতরাং রোগীর ঘুরন্ত পিঁড়িতে ঠিক-ঠাক বসে থাকা ও আপনা থেকে মাটির পাত্রের ঘুরতে থাকার মধ্যে কোনও দৈব বা অলৌকিকতা নেই। এমনকি দৈব চিকিৎসকের দুই সহকারী রোগীকে ঘোরার প্রথম গতি এনে দিতে সাহায্য না করলেও ঘুরতে পারে। রোগীর যদি অবচেতন মনে বিশ্বাস থাকে — মন্তরে মাটির পাত্র তাকে নিয়ে ঘুরবে, তাহলেও মাটির পাত্র ঘুরবে। একটু দেরিতে ঘুরতে শুরু করলেও ঘুরবে। রোগীর অবচেতন মনই এই ঘোরার গতি তৈরি করবে।

তিন : সিমেন্টের মেঝেতে ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে মৃতপাত্রের তলদেশ ক্রত পাতলা ও ভঙ্গুর হতে থাকে। সেই সঙ্গে মৃতপাত্রের তলায় মাষকলাইয়ের শক্ত দানা পড়ে ভাঙার ব্যাপারটা ক্রততর করে।

চার : মাটির পাত্রের পুরুত্ব বা গেজ এক নয়। সব পাত্র সমানভাবে পোড় খাওয়াও নয়। সব রোগীর ওজনও এক নয়। তাই পাত্র ভাঙার ক্ষেত্রে সময়ের

তারতম্যই স্বাভাবিক। এমন কি কোনও ক্ষেত্রে দশ মিনিট, কোনও ক্ষেত্রে পঁচিশ মিনিট সময় নিলেও তার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। এ-ছাড়াও ধরুন মাটির পাত্রের তলায় এক দানা মোটা বালি বা খুদে পাথর পাত্র তৈরির সময়তেই থাকে এবং ঘোরার সময় ওই দানার সঙ্গে মাষকলাইয়ের সংঘর্ষ ঘটে তবে ভাঙা ক্রততর হতে পারে। সংঘর্ষের সময় হাঁড়ির ঘোরার বেগ যত বেশি হবে ভাঙার সম্ভাবনাও তত বাড়বে।

সুতরাং ভাঙার সময়ের তারতম্যের ওপর শরীরে বিষ ঢোকা বা কম ঢোকার কোনও সম্পর্ক নেই।

পাঁচ : কুকুরে কামড়ালেই জলাতঙ্ক হয় না। পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক হয়। কুকুরে কামড়ালে রোগীদের মধ্যে পাগলা কুকুর কামড়ানো রোগীর সংখ্যা হাজারে একজন। সুতরাং দৈব চিকিৎসকের ব্যর্থতার সম্ভাবনাও হাজারে এক।

জলাতঙ্ক নিয়ে কিছু ভুল ধারণা

শহুরে থেকে গ্রামবাসী, অনেকেরই ধারণা, জলাতঙ্ক রোগী রোগিনীর পেটে কুকুরের বাচ্চা হয়। ধারণাটি পুরোপুরি ভুল।

জলাতঙ্ক রোগী কুকুরের মত ডাকে — এমন একটা ধারণাও প্রচলিত আছে। এই ধারণাও ভুল।

পাগলা কুকুরে কামড়ালে নানা জন নানা রকমের উপদেশ দিতে থাকেন। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের উপদেশকে অভ্রান্ত প্রমাণ করতে অনেক উদাহরণ টেনে আনেন, ফাঁদেন অনেক গল্প। এইসব উপদেশের মধ্যে চালু টোটকা হল পিঠে থালা বসান, পাকা কলার মধ্যে কেঁচো বা জোনাকী ঢুকিয়ে রোগীকে পর পর তিন দিন খাওয়ানো। কুকুরে কামড়ানো রোগীর পিঠে মন্ত্র পড়ে থালা বসান দেখে অনেকেই মন্ত্র শক্তিতে বিশ্বাস করে বসেন। থালা বসান একটা কৌশল। এ-খানে সে কৌশল নিয়ে আলোচনায় ঢুকলাম না। কারণ 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' ২য় খণ্ডে এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, মনে রাখবেন কোনও মন্ত্র-তন্ত্র বা টোটকার সাহায্যেই পাগলা কুকুরে কামড়ানো রোগীকে জলাতঙ্কের হাত থেকে বাঁচানো যায় না। আর জলাতঙ্ক মানেই অবধারিত মৃত্যু। সুতরাং মিথ্যে উপদেশে ও গল্পে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না, বা নিজে বিভ্রান্ত হবেন না। পাগলা কুকুরে কামড়ালে দ্রুত অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগের আগে প্রাথমিক চিকিৎসা যা করবেন: —

এক : যেখানে পাগলা কুকুর কামড়েছে, আঁচড়েছে বা চেটেছে সেখানটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাবান ডিটারজেন্ট বা সোডা লাগিয়ে জল দিয়ে ধুইয়ে দিন। হাতের কাছে সাবান-টাবান না পেলে জল দিয়েই জায়গাটা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করে ধুইয়ে দিন।

দুই : কামড়ানো জায়গাটা পরিষ্কার করে ধোয়ার পর কার্বোলিক অ্যাসিড দিয়ে পোড়াতে পারেন।

কার্বোলিক অ্যাসিড তুলুন একটা কাঠির মাথায় তুলো বা পরিষ্কার ন্যাকড়া জড়িয়ে তার সাহায্যে। এবার তুলোর মাথার অ্যাসিড ক্ষতস্থানে শুধু বুলিয়ে দিন। অ্যাসিডের পরিবর্তে টিঞ্চার আইডিন লাগাতে পারেন।

তিন: কার্বোলিক অ্যাসিড লাগানোর এক মিনিট পরেই অ্যাসিড মুছে দিন রেক্‌টিফাইড স্পিরিট বা অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল দিয়ে। এই স্পিরিট যে কোনও ওষুধের দোকানে পাবেন। এই মোছার কারণ — অ্যাসিড-ক্ষত যাতে না হয়।

চার : ক্ষত থেকে যাতে টিটেনাস না হয়, তাই টিটেনাস টক্সাইড ইঞ্জেকশন নিন।

র‍্যাবিড বা পাগলা কুকুর কামড়েছে কি না জানবেন কি করে ?

কুকুরে কামড়াবার পর কুকুরটা পাগলা কি না জানাটা জরুরী হয়ে পড়ে। কুকুরটি র‍্যাবিস ভাইরাস দ্বারা (যা জলাতঙ্ক রোগের কারণ) আক্রান্ত না হলে অ্যান্টি র‍্যাবিস ইনজেকশন নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ক্ষতের চিকিৎসা করালেই চলে।

পাগলা কুকুরের লক্ষণ : —

(১) ক্ষিপ্ত অবস্থা। বিনা কারণে কামড়াবার প্রবণতা।

(২) বিনা কারণে চিৎকার করা। চিৎকারের স্বর থাকে ভাঙা। অথবা চিৎকার করতে চাইছে, আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

(৩) মুখ দিয়ে লালা পড়তে থাকে।

(৪) খেতে চায় না, লুকিয়ে কুঁকড়ে শুয়ে থাকতে চায়।

কামড়ানোর পরবর্তী সমস্যা ও করণীয়

কুকুর কামড়ানোর পর বুঝতে চেষ্টা করুণ, কুকুরটি পাগলা কি না। কুকুরটি রোগাক্রান্ত না হলে তার কামড়ে, আঁচড়ে জলাতঙ্ক হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কুকুরটি পাগলা হলে সাধারণভাবে দিন দশেকের মধ্যে মরে যাওয়ার কথা। কুকুরটি কামড়ানোর দশ দিন পরে পাগল না হয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলে কামড় থেকে জলাতঙ্কের সম্ভাবনা নেই।

যেখানে আক্রান্ত কুকুরকে চিহ্নিত করা এবং তার ওপর নজর রাখা সম্ভব নয়, সেখানে ঝুঁকি না নিয়ে অ্যান্টি র‍্যাবিস চিকিৎসা শুরু করাই উচিত।

যে কুকুর কামড়েছে সেই কুকুরটি যদি কোনও কারণে মারা যায় বা তাকে মেরে ফেলা হয়, তবে রোগীর অ্যান্টি র‍্যাবিস চিকিৎসা করাতে হবে।

জলাতঙ্ক রোগ কি?

জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাসের নাম 'র‍্যাবিস'। এই ভাইরাস প্রধানত স্নায়ুকোষকে আক্রমণ করে। স্নায়ুকোষে এরা বংশবিস্তার করে এবং স্নায়ুকোষ ধরে মস্তিষ্কের কোষগুলোর দিকে চলতে থাকে ভাইরাসের অগ্রগমন। সাধারণভাবে সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে জলাতঙ্ক রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। জলাতঙ্কের পূর্বলক্ষণ হিসেবে গা ম্যাজ ম্যাজ করে, মাথা ব্যথা হয়, ক্ষুধা কমে যায়, অল্প-সল্প জ্বর হয়। কামড়ানো বা আঁচড়ানোর জায়গায় চুলকানি অথবা অসাড়তা দেখা যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা দেয় জলাতঙ্কের লক্ষণ। রোগীকে ছুঁলে চম্‌কে ওঠে। একটু শব্দেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ঠাণ্ডা বাতাস, উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে পারে না। চোখ দিয়ে জল পড়ে। শরীর ঘামতে থাকে। কোনও তরল পদার্থ গিলতে পারে না। গিলতে গেলে গলার ভেতরের মাংসপেশী প্রবলভাবে সংকুচিত হয়। ফলে প্রবল যন্ত্রণা হতে থাকে। এক সময় জল দেখলেই পিপাসা মেটাবার তীব্র ইচ্ছে এবং মাংসপেশীর সংকোচন ও সেই কারণে ভয়ংকর যন্ত্রণা হতে থাকে। এই রোগের সঙ্গে জল থেকে যন্ত্রণা সৃষ্টির ব্যাপারটা সম্পর্কিত হওয়ার সুবাদে রোগটি 'জলাতঙ্ক' নামে পরিচিত। এক সময় প্রবল খিঁচুনির মধ্য দিয়ে জলাতঙ্ক রোগীর জীবন শেষ হয়।

তবে এ-কথাও জেনে রাখা ভালো, শুধু কুকুর থেকে র‍্যাবিস ভাইরাস ছড়ায় না। শেয়াল, বেজি, বেড়াল ইত্যাদি মাংসাশী পশুদের থেকেও র‍্যাবিস ভাইরাস ছড়াতে পারে।

হ্যাঁ, সেই শেষ কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছি আর একবার— জলাতঙ্ক রোগের কোনও চিকিৎসা নেই। অর্থাৎ একবার রোগলক্ষণ প্রকাশ পেলে মৃত্যুর দিন গোনা ছাড়া উপায় নেই। তাই জলাতঙ্ক রোগ নিবারণের জন্য রোগলক্ষণ প্রকাশের আগেই রোগ হওয়ার সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করতে হবে। এবং সেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, কোনও দৈব চিকিৎসা নয়।

কারো কারো মনে হতেই পারে 'ধান ভানতে শিবের গান' গাইলুম আমি। চ্যালেঞ্জার ছেড়ে রোগ নিয়ে পড়লাম! আসলে এ-দেশে কুকুরে কামড়ের রোগীর সংখ্যা প্রতি বছর প্রায় ৩ লক্ষ। কুকুরের কামড়ে রোগীর কি কর্তব্য এই বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের বড়ই অভাব শিক্ষিত ও শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া উভয় শ্রেণীর মধ্যে। এবং সাধারণ জ্ঞানের অভাবওয়ালা মানুষরাই কুকুরে কাটা রোগীকে জ্ঞান দেওয়ার সুযোগ ছাড়তে নারাজ। ফলে রোগী ও তাঁর পরিবার নানা অযাচিত উপদেশে বিভ্রান্ত হন। এবং অনেক সময় এই বিভ্রান্তিই রোগীর মৃত্যু ডেকে আনে। বিভ্রান্তি নিরসনের জন্যেই আমার 'ধান ভানতে শিবের গান' গাওয়া।

বিশ্বাসের ব্যবসায়ীরা ও নপুংসক আইন

বিশ্বাসের কারবারিরা শিকড় গেড়েছে

দূরস্বামী জিওফ্রে স্যামুয়েল দীনাকার ছিলেন ব্যাঙ্ক কর্মী, হয়েছেন ধর্মগুরু। তা ধর্মগুরু হতে এ-দেশের সংবিধানে কোনও বাধা নেই। ছিলেন মধ্যবিত্ত, চোখের পলকে হয়েছেন উচ্চবিত্ত। তাতেও এ-দেশের সংবিধানে কোনও প্রতিবন্ধকতা নেই। 'পবিত্র কণ্ঠস্বর' ও যিশুর কাছে প্রার্থনা শুনিয়ে ভক্তদের দানে তিনি আরও দশজন ধর্মগুরুর মতোই ধনী। তাঁর ছেলে পলও 'পবিত্র কণ্ঠস্বর' শুনিয়ে জনগণকে পরম শান্তির জগতে নিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে রোগ নেই, দুঃখ নেই। চেন্নাইতে কেন্দ্রীয় অফিস খুলেছেন। সে চারতলার এক বিশাল প্রাসাদ। এখানে রয়েছে আধুনিক রেকর্ডিং স্টুডিও, ভিডিও থিয়েটর, প্রকাশনা বিভাগ এবং ভক্ত ও রোগীদের ফোনে 'পবিত্র কণ্ঠস্বর' শোনাবার সুন্দর ব্যবস্থা। দীনাকর ও তস্য পুত্র হেঁকে-ডেকে দাবি করে চলেছেন, তাঁদের পবিত্র প্রার্থনার চমৎকারে জাগতিক যে কোনও রোগ থেকে বিশ্ববাসী ভক্তরা মুক্ত হন। এমন দাবি করে স্পষ্টতই তাঁরা ভারতীয় সংবিধানের লক্ষ্মণ-গিণ্ডিকে লঙ্ঘন করলেন। এখানে আইন সাফ বলছে — মন্ত্রবলে বা কোনও চমৎকার দ্বার রোগ প্রতিকারের দাবি বা দাবির প্রচার সম্পূর্ণ বেআইনি। তবু এই বেআইনি কাজ 'চলছে, চলবে'।

INDIA TODAY-র জুন ১৪, ১৯৯৭ সংখ্যায় পৃষ্ঠা ৮৫-তে বলা হয়েছে — অতি সম্প্রতি দীনাকর ও পলের এক প্রার্থনা সভায় দশ বছরের এক শিশুপুত্রকে কোলে করে মঞ্চে নিয়ে এলেন মা। মায়ের কথা মতো ছেলেটি হামা দিতেও অক্ষম। এই শিশুই পবিত্র প্রার্থনার চমৎকারিত্বে সকলকে অবাক করে দিয়ে সোজা উঠে দাঁড়াল। এমনি করে সাজানো রোগীদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে সরল আমজনতাকে বুরবক্ বানানোর কাজ 'চলছে চলবে'।

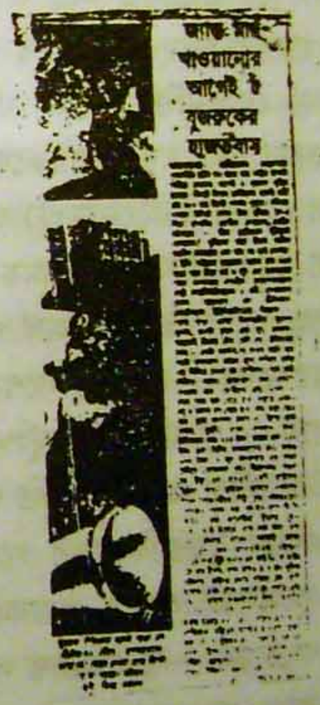
দীনাকর ও পল দেশের জনগণকে 'পবিত্র প্রার্থনা' শুনিয়ে পাপ ও রোগমুক্ত করতে দেশ জুড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের এই বেআইনি কাজে আন্তরিক সহযোগিতা পাচ্ছেন দেশের পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে।

পি পি জোব আর এক 'পবিত্র কণ্ঠস্বর'-এর ব্যাপারি। দুটি টিভি চ্যানেলের 'টাইম স্লট' কিনে ফি শুক্রবার সকালে তাঁর 'পবিত্র কণ্ঠস্বর' শোনাচ্ছেন পাপী জনগণকে। জোব-এর সোচ্চার দাবি — তাঁর এই পবিত্র প্রার্থনা পরম বিশ্বাস নিয়ে শুনলে পাপ ও রোগ দুই থেকেই মুক্ত হয় মানুষ। হায়দ্রাবাদের নিজাম কলেজ গ্রাউন্ড থেকে কোট্টায়ামের নেহরু স্টেডিয়াম পর্যন্ত যেখানেই জনগণকে রোগমুক্ত করতে প্রার্থনাসভার আয়োজন করছেন, সেখানেই পুলিশ ও প্রশাসনের পরিপূর্ণ সহযোগিতা পাচ্ছেন। বেআইনি কাজে এদেশের পুলিশ ও প্রশাসনের পরিপূর্ণ সহযোগিতার ঐতিহ্য বা পরম্পরা 'ছিল-আছে'।

প্রতিবছর ৮ জুন হায়দ্রাবাদে জ্যান্ত মাছ খাইয়ে হাঁপানি সারাবার মহামেলা বসে। বাথিনি পরিবার পাঁচ পুরুষ ধরে এই 'পবিত্র কম্মো'টি করে আসছেন। এই উপলক্ষে বাথিনি পরিবারের বাড়ির সামনের মাঠে মেলা বসে যায়। দেশের দুর-দূরান্তের হাঁপানি রোগী ও তাদের আপনজনদের অনেকেই দৈব ওষুধ পাওয়াকে নিশ্চিন্ত করতে আগের দিনই মেলাপ্রাঙ্গণে রাত কাটান মাঠে বা স্রেফ রাস্তায়। শুধু বাথিনি পরিবারের লোকজনই নাকি জানে এই দৈব চিকিৎসা।' ইঞ্চি তিন-চার লম্বা জ্যান্ত মহাশোল মাছের মুখের কাছে এক ফোঁটা তেতুল দিয়ে তৈরি চ্যবনপ্রাস বা ওই জাতীয় কিছু লাগিয়ে দেওয়া হয়। এইটা রোগীর মুখে চালান করে গিলিয়ে দেওয়ার পর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় ছাপানো নিয়ম-বিধি। তাতে বলা হয়েছে — রোগীদের রাতে গরম জল খেতে হবে। ধুলো এড়িয়ে চলতে হবে। ঠাণ্ডা খাওয়া চলবে না। সপ্তাহে একদিন মধু ও আদার রস খেতে হবে। স্টেট ফিসারিস ডিপার্টমেন্ট হাঁপানি সারাবার মহামেলায় মহাশোল বিক্রির পাঁচটি স্টল খুলেছিল ১৯৯৭-তে। ছিল রোগী ও তাদের আপনজনদের যাতায়াতের সুবিধের জন্য সরকারি সহযোগিতায় স্পেশাল বাসের ব্যবস্থা। ছিল আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা। ভি আই পি-দের অবশ্য আম-জনতার সঙ্গে লাইন দিতে হয় না। তাদের জন্য রয়েছে আলাদা কাউন্টারের ব্যবস্থা। ভি আই পি পাশ অবশ্য ব্লাকে কেনা যায়। '৯৭ সালের দর ছিল ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা। পুলিশের সামনেই ব্ল্যাকাররা খুল্লাম-খুল্লা পাশ বিক্রি করেছে। পরপর তিন বছর এই দৈব ওষুধ বিশ্বাস করে খেলে এবং নিয়ম মেনে চললে হাঁপানি ভালো হবে — গ্যারান্টি! হায়দ্রাবাদসহ কর্ণাটকের বহু মানুষই বাথিনি পরিবারের এই গ্যারান্টিতে বিশ্বাস রাখেন। ওষুধটা কী? কেন শুধু একটি পরিবার এই ওষুধের হদিশ

জানবেন? কেন তা আরও সহজলভ্য হবে না? কেন একটি বিশেষ দিনে ওষুধ খাওয়ানো হয়? এসব বেয়াড়া প্রশ্ন কেউ কেউ করেন। তাঁদের প্রশ্ন চাপা পড়ে যায় 'পুণ্য দিন', 'দৈব আশীর্বাদ' ইত্যাদি আজন্ম বিশ্বাসী মানুষের প্রবাহের নীচে।

৯ জুন '৯৭-এর কলকাতার অনেক দৈনিক পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল একটি খবর — জ্যান্ত মাছ খাইয়ে হাঁপানি সারাবার দৈব ওষুধের কারবারিরা হায়দ্রাবাদ থেকে কলকাতায় এসে গ্রেফতার হলেন। এদের গ্রেফতার করা হয় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায়, ১২০ বি ধারায় (ষড়যন্ত্র) এবং 'দ্য ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশন্যাবল অ্যাডভার্টাইসমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪' ধারা মতে। বাজেয়াপ্ত করা হয় বিভিন্ন ভাষায় ছাপা নিয়ম-বিধি ও প্রচারণাপত্র, প্রচুর চ্যবনপ্রাস জাতীয় ওষুধ ও মহাশোলমাছের চারা।


জ্যান্ত মাছ খাওয়ানোর আগেই ৭ বুজরুকের হাজতবাস

'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হাঁপানির দৈব ওষুধের খবর।

কলকাতাবাসী তথা পশ্চিমবঙ্গীবাসীরা এজন্য বাড়তি গর্ব করতেই পারেন। তাঁরা মনে করতেই পারেন — এখানে বুজরুকি করে পার পাওয়া যায় না। এবং অনেকেই মনে করেনও তা। আমাকেই কয়েক ডজন পরিচিত বলেছেন, 'এই সব বুজরুকি ও বেআইনি কারবার কর্ণাটক সরকার কি করে এত বছর ধরে চলতে দিচ্ছেন!'

৯ জানুয়ারি ১৯৯৭ রবিবার, ভারতের বিখ্যাততম ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর নাগপুর এডিসনে ছবিসহ একটি খবর বিশাল গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। খবরটির শিরোনাম ছিল 'Gang of six impostors arrested' অর্থাৎ ছয় বুজরুকের দল গ্রেফতার। স্থানীয় কাগজগুলোও খুবই গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রকাশ করে। খবরটি সারসংক্ষেপ হল এই যে — পশ্চিমবাংলা থেকে আসা ছয় বুজরুকের দল নিজেদের জ্যোতিষী ও ভাগ্য ফেরাবার ক্ষমতাধর বলে বুজরুকি চালাতে গিয়ে প্রতাপনগর পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে। এই ছয় প্রতারক হল পশ্চিমবাংলার ছয় নামী জ্যোতিষী দীপঙ্কর মিত্র, অরুণরঞ্জন ব্যানার্জি, পূর্ণেন্দু ব্যানার্জি, বাসুদেব ঘোষ, সুভাশিস শূর ও দীপঙ্কর দত্ত। এদের প্রত্যেকেই 'ভৃগু', 'অর্কজ্যোতি' ইত্যাদি জাতীয় নানা বিচিত্র সব নাম ধারণ করে নিজেদের বিজ্ঞাপিত করেন। এই ছয় প্রতারকের গ্যাঙ ইংরেজি হিন্দি ও বাংলায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জনগণকে প্রতারিত করে জানিয়েছিল — ভাগ্য গণনার দ্বার ভবিষ্যৎ জেনে সঠিক গ্রহরত্ন দিয়ে তার ভাগ্য পাল্টে দিতে পারে, মামলায় জয় এনে দিতে পারে এবং রোগমুক্তি ইত্যাদি ঘটাতে পারে। এই ধরনের প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য ছয় প্রতারককে 'দ্য ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশন্যাবেল অ্যাডভারটাইজেমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪'-এর ৪,৫ এবং ৭ ধারা মতে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় পুলিশ ওই গ্যাঙের কাছে আপত্তিজনক প্যামফ্লেটস, কিছু পাথর ও প্রচুর অর্থ পায়। এই 'জ্যোতিষী' এবং 'হস্তরেখাবিদ্' নামধারী প্রতারকদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিল স্থানীয় যুক্তিবাদী সংস্থা — অন্ধবিশ্বাস নির্মূলন সমিতি।

হায়দ্রাবাদবাসী তথা কর্ণাটকবাসীরা এজন্য বাড়তি গর্ব করতেই পারেন। তাঁরা মনে করতেই পারেন — এখানে বুজরুকি করে পার পাওয়া যায় না। এবং অনেকেই মনে করেনও তা। আমাকেই আমার কয়েকজন পরিচিত কর্ণাটকী বন্ধু প্রশ্নবাণে বাস্তবিকই জর্জরিত করেছেন —'তোমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করে এইসব বুজরুকি ও বেআইনি কাজ এত বছর ধরে চলতে দিচ্ছে?'

আইনের সন্ধানে

ছেলেবেলায় পঞ্জিকা আমাকে টানত মজার মজার বিজ্ঞাপনের জন্য। সাদামাঠা ভাষার বিজ্ঞাপন দিয়েও যে মানুষকে কি সাংঘাতির রকম আকর্ষণ করা যায়, তারই জোরালো উদাহরণ পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনমালা। এতে থাকত তন্ত্রসিদ্ধের দৈরি

'অত্যাশ্চর্য মাদুলির' নানা গুণপনার কথা। মাদুলি ধারণে মামলায় নিশ্চিত জয়, আর্থিক সমস্যার সমাধান, যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়, চাকরি লাভ, কর্মে উন্নতি, ব্যবসায় উন্নতি, লটারি প্রাপ্তি, যে কোনও নারী বা পুরুষকে বশীকরণ, পরীক্ষায় সাফল্য, এমনি হরেক সমস্যার গ্যারান্টিসহ সমাধানের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি। এইসব 'অত্যাশ্চর্য মাদুলি'র আবার ছিল নানা শ্রেণীবিন্যাস। 'সাধারণ', 'শক্তিশালী', 'দ্রুত কার্যকর' এমনি আরও কত কি। মাদুলি-তাবিজ-কবজ ছাড়াও বিজ্ঞাপনে হাজির হত নানা 'তন্ত্র সম্রাট', 'তান্ত্রিকাচার্য', 'তন্ত্রসূর্য' 'জ্যোতির্বিদ', 'জ্যোতিষ সম্রাট' ইত্যাদিদের ছবিসহ হোমহর্ষক সব অলৌকিক ক্ষমতার কথা। এঁরা প্রত্যেকেই সুপারম্যান, হি-ম্যান, শ্রীকৃষ্ণ থেকে যিশু সবার সম্মিলিত ক্ষমতার চেয়েও এগিয়ে থাকা মানুষ। সব সমস্যার সমাধান এঁদের মুঠোবন্দি।

যখন প্রাপ্তমনস্ক হলাম মনে হল, পঞ্জিকাগুলোতে ওইসব হিজিবিজি বিজ্ঞাপনদাতারা যা খুশি তাই বিজ্ঞাপন দিয়ে আদৌ কোনও নির্দোষ মজা করছে না। যা করছে তা হল — প্রতারণা। নিরীহ সরল মানুষদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর রকমের প্রতারণা। এতে শুধু যে সাধারণ মানুষদের ঠকিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে তাই নয়, বহু মানুষ যাঁরা ঠিকমতো চিকিৎসার সুযোগ নিয়ে রোগমুক্ত হতে পারতেন, তাঁদের এরা মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে দিচ্ছে। সহজ কথায়, বহু ক্ষেত্রেই এরা স্পষ্টতই হত্যাকারী। তবে কেন এইসব বুজরুক বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে আইন থাকবে না, সরকার কোনও ব্যবস্থা নেবে না?

আরও অনেক পরে শুনলাম, এমনসব বিজ্ঞাপন দেওয়া ও নেওয়া নাকি বেআইনি, অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শুনলামই শুধু, কিন্তু এমন বিজ্ঞাপন দিয়ে বা ছেপে একজনও শাস্তি পেয়েছে, এমনটা শুনলাম না। আরও পরে যুক্তিবাদী আন্দোলন করতে করতে অবাক হয়ে দেখলাম পঞ্জিকার ওইসব হাস্যকর ও ভয়ঙ্কর বিজ্ঞাপন আর শুধু পঞ্জিকায় আবদ্ধ নেই, বিশাল ব্যাপকতা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি প্রচার-মাধ্যমে। এই সময় শুনলাম, এমন সব অদ্ভুতুড়ে বেআইনি বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে যে আইন আমাদের দেশে রয়েছে তার নাম — 'দ্য ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশন্যাবেল অ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪'। কিন্তু ওই আইনে ঠিক কী বলা হয়েছে — ডিটেলে আমরা জানতাম না। ফলে যখনই কোনও 'চমৎকার' দেখানেওয়ালা বুজরুকের বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে 'ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট ...' অনুসারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছি, তখনই শুনতে হয়েছে এমন আইনের অস্তিত্ব তাঁদের

অজানা। এই আইন বিষয়ে আমরা আলোকপাত করে সাহায্য করলে তাঁরা নাকি এইসব আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। কী সুন্দর ব্যাপার বলুন তো! আইন আছে, কিন্তু আইনের দেখ-ভালের দায়িত্ব যাঁদের উপর, তাঁরা আইনটি জানেন-ই না!

শুরু হল তালাশ। সে এক আশ্চর্য তালাশ। আমরা চেনাজানা আই পি এস অফিসারদের সঙ্গে কথা বললাম। কারুরই এই আইনের হদিশ জানা নেই। জানা নেই পরিচিত কোনও আইনজীবীর। আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির আইনি-উপদেষ্টারা আন্তরিকতার সঙ্গে সক্রিয় হলেন। শেষপর্যন্ত আমাদের শ্রম ও স্বপ্ন সার্থক হল। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী আসারাফুল হক-এর ভালোবাসা ও শ্রমের ফসল হিসেবে আমরা 'দ্য ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট'কে জনসমক্ষে তুলে আনতে সক্ষম হলাম। আইনটির ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে যুক্তিবাদী সমিতির মুখপত্র 'যুক্তিবাদী'-র বিশেষ আইনি সংখ্যায় এই আইনটি একটি শব্দও বাদ না দিয়ে প্রকাশ করলাম মূল ইংরেজি ভাষায়। প্রকাশ করলাম বাংলা অনুবাদ। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম, সাংবাদিক, পুলিশের পদস্থ কর্মচারী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলোকে সংখ্যাটি উপহার হিসেবে দিলাম। সাধারণের কাছে বিক্রি করলাম। আইনটি জানতে চাওয়ার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করে আমরা 'আইন' নামের একটি আইনের সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করলাম, যার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল 'ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিজ...অ্যাক্ট'। পরিণতিতে এখন এই আইনটি বহু ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হয়ে ব্যাপ্তি পেয়েছে।

ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট কী বলছে

আলোচ্য আইনটির পুরো নাম 'The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954. পুরো আইন এই আলোচনায় তুলে ধরবো না। আনব শুধু কিছু প্রয়োজনীয় অংশ ও ধারা।

সংসদ প্রবর্তিত এই আইন ৩০ এপ্রিল ১৯৫৪ রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় এবং ১ মে ১৯৫৪ ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় দ্বিতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়ের ২৪ নং ক্রমে প্রকাশিত হয়।

ওষুধ সম্পর্কিত কিছু নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন এবং পরাবিদ্যা (গুপ্তবিদ্যা, মায়াবিদ্যা, ভেল্‌কিবাজি) বা মন্ত্রবলে রোগ প্রতিকারের উপায় হিসেবে বর্ণিত বিজ্ঞাপন ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এই আইন প্রবর্তিত।

2. সংজ্ঞা

(a) 'বিজ্ঞাপন' বলতে গ্রাহ্য হবে যে কোনও রকমের লিখিত প্রচারপত্র, লেবেল, মোড়ক বা অন্য যে কোনও রকমের প্রদর্শন এবং মৌখিক অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে প্রচারিত ঘোষণা।

(b) 'ড্রাগ' বলতে গ্রাহ্য হবে —

(i) মানুষ বা প্রাণীর বাহ্যিক বা অন্তস্থ ব্যবহার্য ওষুধ।

(ii) মানুষ বা প্রাণীর রোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা, রোগের কারণ নির্ণয়, উপশম ইত্যাদিতে ব্যবহৃত যে কোনও পদার্থ।

(iii) মানুষ বা প্রাণীর রোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা, রোগের কারণ নির্ণয়, উপশম ইত্যাদিতে ব্যবহৃত যে কোনও পদার্থ।

(c) 'ম্যাজিক রেমেডি' হিসেবে গ্রাহ্য হবে — অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বস্তু, মন্ত্র, কবচ ও কোনো ধরনের চমক যা অলৌকিক ক্ষমতা হিসেবে অভিযুক্ত হতে পারে। এবং অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা মানুষ বা প্রাণীর রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, উপশম, সমস্যার প্রতিকার ইত্যাদি হতে পারে বলে মানুষকে প্রভাবিত করার যে কোনো চেষ্টা।

(d) **"বিজ্ঞাপন প্রচারে যে কোনো প্রকার অংশগ্রহণ'** বলতে গণ্য করা হবে—

(i) বিজ্ঞাপন মুদ্রণ (Printing)

(ii) বিজ্ঞাপন প্রকাশ (Publication)

4. **'ড্রাগ' সম্পর্কিত যেসব বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ —**

(a) যদি বিজ্ঞাপনটি ড্রাগটির কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ভুল ধারণার জন্ম দেয়।

(b) যদি বিজ্ঞাপনটিতে ড্রাগটির কার্যকারিতা সম্পর্কে মিথ্যে দাবি করা হয়।

(c) যদি বিজ্ঞাপনটি অন্য কোনোভাবে মিথ্যে বা বিভ্রান্তি বহন করে।

7. **দণ্ড বা শাস্তি** — এই আইনি ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারী যে কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হবে এবং নিম্নরূপ দণ্ড পাবে —

(a) প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ছয় মাস কারাবাস অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই।

(b) পরবর্তী প্রতিবার আইনভঙ্গের ক্ষেত্রে অধিক এক বছর কারাবাস অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই।

আত্মকথন

আমাদের অযুত মুখ, আমাদের অসংখ্য মুখোশের ভিড়ে
বারবার হয়ে যায় ভুল
কোনটা মুখ, আর কোনটা মুখোশ।

মা-বাবার সঙ্গে মেয়েটি ঢুকল। বয়স বছর আঠারো। মুখের একাংশে বীভৎস পোড়া দাগ। আত্মহত্যার চেষ্টা করার সাক্ষ্য। মা বললেন, 'মাধ্যমিকে এবার নিয়ে দুবার ফেল করল। এবার ফেল করতে বাথরুমে ঢুকে গায়ে আগুন লাগিয়েছে। এই একটিই সন্তান। বলুন তো, ওর এই পাগলামো নিয়ে কী করি?'

মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে জানলাম, প্রথম ফেলের স্মৃতি মোটেই ভালো নয়। মা-বাবার কাছ থেকে প্রচুর বাজে কথা শুনতে হয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে পাশ করবার গ্যারান্টি দেওয়া এক জ্যোতিষীর কাছে যায়। জ্যোতিষীর কয়েক হাজার টাকার খাঁই মেটাতে বাড়ি থেকে টাকা চুরি করে। চুরির ব্যাপারটা ধরা পড়ে। বকুনি খায়। পাশ করার নিশ্চিত আশ্বাস চুরির গ্লানিকে সহ্য করার শক্তি দিয়েছিল। ফেল করার পর হাজারগুণ গ্লানি ওকে ঘিরে ধরেছিল। মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে গায়ে আগুন দিয়েছিল।

পরীক্ষা-পাশের তাবিজ বা পাথরের খবর বিজ্ঞানীদের জানা নেই। কিন্তু একটি সরল কিশোরী পত্রিকার ছাপার অক্ষরে বিশ্বাস করে, জ্যোতিষীর বিজ্ঞাপন দেখে প্রভাবিত হয়ে আগুনের সঙ্গে শেষ করতে চেয়েছিল নিজের জীবনকে। যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল এবং যে পত্রিকা বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেছিল, তারা কেউই এই মেয়েটির জীবনের ভয়ংকর পরিণতির দায়কে অস্বীকার করতে পারে না।

আমার ভায়রার গলায় ক্যানসার ধরা পড়ল। বিশিষ্ট শল্যচিকিৎসক সাজেস্ট করলেন — অপারেশনের। বাইপাস করালে পাঁচ-দশ বছর নিশ্চিত জীবন। ক্যানসারে অপারেশন! হই-হই করে বাধা দেওয়ার মতো শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়বন্ধুর

অভাব হল না। শেষপর্যন্ত ভায়রা চিকিৎসকের বদলে এমন একজনের স্মরণ নিলেন, যিনি গ্যারান্টি দিয়ে যে কোনো রোগ আরোগ্যের বিজ্ঞাপন দেন। পাঁচ মাস গ্যারান্টি বাঁচা বেঁচে নাবালক শিশু ও নির্ভরশীল বউকে ভাসিয়ে মারা গেলেন। রোগ আরোগ্যের তাবিজ-কবজ বা পাথরের খবর বিজ্ঞানীদের জানা নেই। কিন্তু একজন রোগী ও তাঁর পরিবার পত্রিকার বিশ্বাসের দাম গুনলেন একটি জীবন দিয়ে। বিজ্ঞাপনদাতার পাশাপাশি পত্রিকাটিও কি এই মৃত্যু নামের হত্যাটির জন্য দায়ী নয়?

আমার এক সহপাঠী এক নায়িকার প্রেমে পড়ে পড়াশুনোর পাঠ তুলে দিল। লেখাপড়ায় ভালো একটি ছেলে পাগলামো করে জীবনটা শেষ করে দিক, আমরা, বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই চাইনি। অনেকের চেষ্টার ফসল হিসেবে ওকে আবার পড়াশুনোয় ফেরানো গিয়েছিল। রেজাল্ট ভালোই করল। ঠিক তখনই পত্রিকায় বশীকরণ-এর বিজ্ঞাপন দেখে এক 'কামাখ্যা সিদ্ধ জ্যোতিষী'র সঙ্গে যোগাযোগ করে। জ্যোতিষী সব শুনে নায়িকার একটি ছবি ও হাজার টাকা আনতে বলে। তখনকার দিনের হাজার টাকা— বিশাল ব্যাপার। আমাদের মত ছাপোষা বন্ধুদের কাছে ধার চেয়ে না পেয়ে বই-পত্তর, ঘড়ি, এমনকী রক্ত পর্যন্ত বেচল। জ্যোতিষী যজ্ঞ করে কবচ বানিয়ে দিল। বন্ধু কবচ পেয়ে নায়িকার প্রেম হাতের মুঠোয় ভেবে যখন মশগুল তখনই নায়িকার বিয়ের খবর আমরা পত্রিকায় পড়লাম। তারপর বন্ধুটির জায়গা হল পাগলা গারদে। কয়েক বছর আগে ওর মৃত্যুর খবর পেয়েছি। পাগল অবস্থাতেই মারা গেছে। এই মৃত্যুর দায় তো শুধু একজন বুজরুক জ্যোতিষির নয়, একই সঙ্গে বুজরুকের প্রতারণায় সহযোগিতা করা পত্রিকারও। কোনভাবেই পত্রিকা এই দায়কে অস্বীকার করতে পারে না। তাই এই ধরনের অলৌকিক উপায়ে সমস্যা সমাধান বা ভাগ্য পাল্টাবার বিজ্ঞাপন প্রকাশের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপনটি যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তার মুদ্রক-প্রকাশকের একই শাস্তির বিধান রয়েছে এ-দেশের আইনে।

পরিবার বলতে একটি তরুণ, একটি তরুণী। দুজনেই চাকরি করেন। মোটামুটি সচ্ছল। তরুণের চোখে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন। লটারি জিতে রাতারাতি বড়লোক হতে পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখে 'ধনদা কবচ' নিলেন। শুরু হল গাদা গাদা লটারির টিকিট কেনা। লটারির টিকিট কিনতে কর্মস্থলের তহবিল তছরুপ

করলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন — লটারি জিতবেনই। তখন তহবিলের টাকা পুরণ করে দেবেন। তিনি চুরি করতে চাননি, ধার নিতে চেয়েছিলেন। ধনদা কবচ তাঁর আশা পূরণ করেনি। পরিবর্তে মিথ্যে লোভ জাগিয়ে তুলে চোর তৈরি করেছিল। মুক্তির খোঁজে শেষপর্যন্ত স্বপ্ন দেখা একটি তরুণ জীবন আত্মহত্যা করেছিলেন। একটি বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করার পরিণতিতে একটি জীবন, একটি পরিবার শেষ হয়ে গেল। পত্রিকাই এই মিথ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে তরুণটিকে মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল। পত্রিকাটির ভূমিকা কবচ বিক্রেতা বুজরুকের তুলনায় একটুও কম নয়।

টিভিতে ঠাণ্ডা পানীয়ের বিজ্ঞাপন দেখে প্রভাবিত একটি কিশোর পায়ে দড়ি বেঁধে উঁচু থেকে ঝাঁপ দিতে গিয়ে মারা যায়। ঘটনাস্থল ছিল মুম্বাই। ঠিক একইভাবে কলকাতার এক বালক ফ্যানে দড়ি বেঁধে ঝুলতে গিয়ে গলায় ফাঁস লেগে মারা যায়। শুনছি, বিজ্ঞাপনটি নাকি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

এরচেয়েও ভয়ঙ্কর বিজ্ঞাপন দিয়ে যারা মানুষ ও সমাজকে পঙ্গু করেই চলেছে, তারা কাদের বিশেষ অনুগ্রহে পার পেয়ে যাচ্ছে? জ্যোতিষী-তান্ত্রিক ও তথাকথিত অবতারদের মুখের ধর্মের মুখোশ কি আমাদের সংবিধান, আইন ও আইনের রক্ষকদের নপুংসক করে রেখেছে?

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি এ বছর। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার বাণী ভাসছে হাওয়ায়। রুখে দাঁড়াতে গিয়ে বারবার একই অভিজ্ঞতা — কোমর ভাঙতে হিলহিলিয়ে উঠেছে বাণীওয়ালাদেরই হাত। ওরা সাপের গালেও চুমু খায়, ব্যাঙের গালেও চুমু খায়। ওরা পাড়ি দিতে আহ্বান জানায়, ওরাই নোঙর কাটে। পরিণতিতে এখন — আইন ভাঙাটাই আইন।

ধর্মের মুখোশের আড়ালে সমস্ত প্রতারণা, সমস্ত বেআইনি কাজ 'চলছে চলবে'। সঙ্গে বিজ্ঞাপন গ্রহীতা প্রচারমাধ্যমগুলোর পরিপূর্ণ সহযোগিতা পেলে তো কথাই নেই। তবে কেন বাইরের থেকে আসা অলৌকিকবাবারা, ধর্মবাবারা এই বাংলার আইনের প্রহরীদের হাতে বন্দি হন? এ-প্রশ্ন অনেকেরই। ভেতরের রহস্য জানা নেই বলেও উঠে আসে প্রশ্ন।

আঁৎ-ঘাঁৎ না জেনে ব্যবসায় নামলে যা হওয়ার তাই হয়। কোনো 'হোম ওয়ার্ক' না করে বাইরে থেকে এখানে বেমক্কা এসে পড়া অলৌকিক ব্যবসায়ী বিপদে পড়েন। 'হোমওয়ার্ক' মানে পুলিশ ও রাজনৈতিক বাবাজীদের ছত্র-ছায়া পাওয়ার

প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা আসার আগেই করে নেওয়া। উদ্ধার পেতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। তাঁর অঞ্চলের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়ে এখানকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে ঘটে যাওয়া ঘটনার জট ছাড়ান। অর্থাৎ, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাবার ব্যবস্থা করে দেন।

স্থানীয় অলৌকিক ব্যবসায়ীরা অনেক ধূর্ত। আইন ভাঙতে যাদের যেমন পুজো চড়ানো দরকার, তেমনটি চড়িয়ে বুক ফুলিয়ে হেঁকে-ডেকে ব্যবসা করে।

যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটা যুগ। স্মৃতির ভি সি আর 'রিওয়াইনডিং' হতে থাকে।

২২ ফেব্রুয়ারি '৯৪। রাত তখন ন'টা। ফোনটা করেছিলেন 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার পথিক গুহ। বললেন, "দ্য অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ প্রজেক্ট' এর পেপার অ্যাড নিশ্চয়ই দেখেছেন? ওঁরা তো টোয়েন্টি সিক্সথ থেকে টোয়েন্টি এইটথ ফেব্রুয়ারি কলকাতাতেই ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন অ্যাস্ট্রোলজিকাল কনফারেন্স করতে চলেছে। ভেনু-স্টেট লেবার ওয়েলফেয়ার অডিটোরিয়াম। ওদের এক 'কি পারসন'-কে ধরেছিলাম, বললাম, 'র‍্যাশানালিস্টরা' তো আপনাদের 'ফ্রড' বলেন। জ্যোতিষ ব্যবসাকে 'ইললিগাল' বলেন। আপনাদের বোল্ডলি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন সভা-সমিতিতে, বই-পত্তরে। হাজারখানেক অ্যাস্ট্রোলজারদের নিয়ে এমন একটা বড় মাপের কনফারেন্স যখন করতে যাচ্ছেন, তখন এই কনফারেন্সেই আপনারা ওঁদের চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করে মুখের মতো জবাব দিচ্ছেন না কেন?' উত্তরে উনি সাফ জানালেন — 'শুধু বই-পত্তরে আর উল্টো-পাল্টা জায়গাঁয় চ্যালেঞ্জ না জানিয়ে কয়েকজনের জন্ম সময় বা ছক নিয়ে ওঁরা আসুন না কেন আমাদের কনফারেন্সে, সেখানেই ফয়সালা হবে। ঠিকঠাক জন্ম সময়, ছক বা হাতের রেখা পেলে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের পারফেক্ট ফোরকাস্ট করা যায়।' প্রবীর, আপনি কি ওঁদের এই চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করবেন?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই করব। প্রকাশ্যে ওঁদের বুজরুকি ফাঁসের এমন সুযোগ কখনও নষ্ট করতে পারি?'

— 'তরুণ গোস্বামীকে লাইনটা দিচ্ছি, ওঁর সঙ্গে কথা বলুন। ওই নিউজটা করছে।'

তারপর শ্রীগোস্বামীর সঙ্গে অনেক কথাই সে রাতে হয়েছিল। বলেছিলাম, ওঁদের চ্যালেঞ্জ অবশ্যই নিচ্ছি। কয়েকজনের জন্ম-সময় নিয়ে যাব। হাত দেখে

বলতে চাইলে প্রয়োজনে হাতসহ হাতের মালিককে হাজির করব। এঁদের বিষয়ে জিজ্ঞাস্য খুবই সামান্য ও সহজ — আয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্ট্যাটাস ইত্যাদি। শতকরা আশিভাগ প্রশ্নের উত্তর ঠিক হলে দেব ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এছাড়াও অর্গানাইজারদের হাতে পাঁচজন বিখ্যাত ব্যক্তির একটি তালিকা দিয়ে বলব, এঁদের মৃত্যুদিন প্রকাশ্যে আগাম ঘোষণা করুন। জ্যোতিষ শাস্ত্র বুজরুকি, না সত্যি? —সেটা আমজনতা অদূর ভবিষ্যতে অভ্রান্তভাবে বুঝে নিতে পারবে। প্রতিশ্রুতি রইল, হারলে চ্যালেঞ্জ মানি তো দেবই, সঙ্গে যুক্তিবাদী সমিতিও ভেঙে দেব। তবে এ-বিষয়ে একটা আগাম ভবিষ্যৎবাণী করে রাখছি — ওঁরা যে কোনও অজুহাতে এই চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে যাবেন। এই ভবিষ্যৎবাণী করতে আমাকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হয়নি। ওঁরা এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিজেদের বুজরুকি নিজেরাই ফাঁস করবে না, এটুকু জানি বলেই এমন ভবিষ্যৎবাণী করতে পারলাম।'


The Telegraph

Astrologers beware!

Rationalist Prabir Ghosh challenges palmists to predict the dates of demise of five famous Indians

পরের দিন ২৩ ফেব্রুয়ারি। তরুণ গোস্বামীর কলামে 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় আমার একটা ছবি ছেপে তার তলাতে বেশ বড় করেই চ্যালেঞ্জের খবরটা প্রকাশিত হল। প্রকাশিত হল পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নামও — পি ভি নরসিমা রাও,

জ্যোতি বসু, পণ্ডিত রবিশংকর, মৃণাল সেন এবং সুচিত্রা সেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি। সকালে পাঁচটি আমন্ত্রণপত্র আমাকে পাঠিয়ে দিলেন সম্মেলন কর্তৃপক্ষ।

২৬ ফেব্রুয়ারি। আমি যে সম্মেলনে যাচ্ছি, ইতিমধ্যে সব পত্রিকার সাংবাদিকদের কাছেই তা পুরনো খবর। সারাদিন ধরে ফোনে কয়েকটা উড়ো হুমকি পেলাম — সম্মেলনে গেলে আমার 'জান' নিয়ে নেবে।

খবর পেলাম, সম্মেলন কর্তৃপক্ষ গোলমালের আশঙ্কা প্রকাশ করে কোর্ট থেকে ১৪৪ ধারা জারির আদেশ বের করেছেন। লক্ষণীয়, সকল সমস্যা সমাধানের জন্য যাঁরা তাবিজ-কবজ-পাথর ধারণের 'অব্যর্থ' বিধান দিয়ে থাকেন, তাঁরা নিজেদের সমস্যা মেটাতে ওইসব অব্যর্থ অলৌকিক বিধানে আস্থা না রেখে শেষপর্যন্ত লৌকিক বিচারব্যবস্থার শরণাপন্ন হলেন! সত্যি কি বিচিত্র এই দেশ!

রাতে 'দ্য টেলিগ্রাফ' থেকে খবর পেলাম, সম্মেলনের জনৈক মুখপাত্র 'দ্য টেলিগ্রাফ' কে জানিয়েছেন, পত্রিকায় প্রকাশিত পাঁচজনের সঠিক মৃত্যুদিন আগাম ঘোষণা করা তাঁদের কাছে আদৌ কোনও বড় ব্যাপার নয়। কিন্তু আগাম মৃত্যু দিন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর এইসব দেশ বরেণ্যদের কেউ কেউ মানসিক অবদমনের শিকার হতে পারেন। এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই তাঁদের পক্ষে এমন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

যুক্তিবাদী সমিতির তরফ থেকে কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে লেখা একটি চিঠি আজই সকালে লালবাজারে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। চিঠির বক্তব্য — জ্যোতিষীরা প্রত্যেকেই 'দ্য ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশ্যনাবেল অ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪' ভঙ্গ করার দায়ে অপরাধী। কলকাতায় জ্যোতিষীরা রমরমার সঙ্গে এই আইন ভঙ্গ করে চলেছে। পাথর বিক্রি করে ভাগ্য ফেরাবার বেআইনি কারবারিরা এই শহরের গানের আসর, নাট্য উৎসব, গুণিজন সম্বর্ধনা ইতাদিকে স্পনসর করে বঙ্গ সংস্কৃতির জগৎকে যেভাবে দখল করে নিচ্ছে, তাতে আমরা গভীর শঙ্কা অনুভব করছি। আইন ভাঙার অপরাধে যাদের থাকার কথা জেলে, তাদের ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে সাংস্কৃতিক জগতের 'গডফাদার' হিসেবে। এই অবক্ষয়ের আগ্রাসন দেখার পরও আপনার কাছে অনেক প্রত্যাশা, আপনি এইসব বেআইনি কারবারিদের অসাংবিধানিক ক্ষমতার কথা জানার পরও এদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে আন্তরিক হবেন, প্রত্যাশা রাখি। প্রসঙ্গত জানাচ্ছি — 'জ্যোতিষী' নামক বেআইনি পেশার কিছু ব্যক্তি জ্যোতিষীদের নিয়ে

একটি সম্মেলন করতে চলেছেন, যা স্পষ্টতই বেআইনি। এবং এখানেও স্পনসরের ভূমিকায় রয়েছে পাথর বেচার বেআইনি ব্যবসায়ীরা। আপনার কাছে অনুরোধ এই বেআইনি সম্মেলন বন্ধে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিন।

রাতে বাড়ি ফিরে শুনলাম, এক ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ বার দুয়েক ফোন করেছিলেন। তাঁর বাড়িতে ফোন করলাম। পেলাম। জ্যোতিষ সম্মেলনকে 'বেআইনি সম্মেলন' বলে আমাদের চিঠিতে উল্লেখ করায় তিনি যথেষ্ট উষ্মা প্রকাশ করলেন। এ-বিষয়ে আইন কি বলছে, বলতে চাইলাম। কিন্তু ও-প্রান্ত শুনতে চাইলেন না। অধৈর্য চড়া সুরে বললেন —মশাই, এত বছর ধরে জ্যোতিষ চর্চা চলছে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের ওপর নির্ভর করে হাজার হাজার স্টোনের দোকান চলছে, বছর বছর জ্যোতিষ সম্মেলন হচ্ছে এবং তাতে হাজির থাকছেন বিচারপতি থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত। দেশের আর কেউ আইন বোঝেন না, আপনিই শুধু আইন বুঝে বসে আছেন? সেই সঙ্গে এও বললেন, আমরা যেন জ্যোতিষ সম্মেলনে কোনো ধরনের হুজ্জুতি পাকাতে না যাই।

বললাম, 'বহু বছর ধরে চলছে, অতএব আইনি', 'মন্ত্রীরা যা করেন তা-ই আইনি' : এমন যুক্তি আমাদের দেশের সংবিধান কিন্তু মানে না। আপনি চাইলে আপনার কাছে ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিজ অ্যাক্ট-এর একটা কপি পাঠিয়ে দিতে পারি। সেটা পড়লেই ...

— না মশাই, আমাকে আপনাদের আর আইন শেখাতে হবে না। সোজা কথা, আপনারা কাল ওদের সম্মেলনে যাবেন না। গেলে পরে তার পরিণতি মোটেই ভালো হবে না।

— আমন্ত্রণ এসেছে, অতএব যেতে তো হবেই। না গেলে ওরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পাবে। প্রচার করবে — প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মুখে যুক্তিবাদীরা পালিয়েছে। আর আপনি যেভাবে কথা বললেন, সেটা তো নেহাত হুমকি। আইনের রক্ষকের কাছে এ ধরনের কথা শুনব, প্রত্যাশা রাখি না।

২৭ ফেব্রুয়ারি। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা পাঁচজন আমন্ত্রণপত্র দেখিয়ে জ্যোতিষ সম্মেলনে ঢুকলাম। আজ একটা খবরের প্রত্যাশায় সাংবাদিকদের প্রত্যাশিত ভিড়। সভা শুরু হওয়ার আগে সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী আমাকে ডেকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, এসেছেন ভালো লাগল। আমাদের বক্তব্য শুনুন। কিন্তু আপনার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নিয়ে কোনো আলোচনাতেই আমরা যাচ্ছি না। কারণ, নীতিগত কারণেই আমরা মৃত্যুদিন আগাম ঘোষণা করব না।

বললাম, আপনাদের নীতিগত সমস্যার কথা শুনেছি। তাই নতুন প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আপনারা ওই পাঁচজনের মৃত্যুদিন পাঁচটি খামে সিল-বন্দি করে প্রধান সংবাদ-মাধ্যমগুলোর হাতে তুলে দিন। খামের উপর লেখা থাকবে নাম। যখন যার মৃত্যু ঘটবে তখন তাঁর নাম লেখা খাম খুলবে সংবাদ-মাধ্যম। তারপর প্রকাশ্যে জানিয়ে দেবে — আপনাদের ভবিষ্যদ্বাণী মিলল কি না।

সমিতির এই লিখিত প্রস্তাব রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী হাতে তুলে দিলাম। এমন একটা সর্বনাশা প্রস্তাবের জন্য বোধহয় শাস্ত্রী মশায় তৈরি ছিলেন না। কয়েকজন সাংবাদিক প্রস্তাবের কপির জন্য হাত বাড়ালেন। আমাদের কথার মাঝে সাংবাদিকরা কখন যে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, খেয়ালই করিনি। তাঁদের হাতে কপি তুলে দিতেই গোলমাল শুরু হল। শুরু করলেন শাস্ত্রী মশায়। মঞ্চের মাইক ধরে চেঁচালেন — প্রবীর ঘোষ আর ওর দালালদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দাও। অমনি ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারার কয়েকজন বাছাবাছা গালাগাল দিতে দিতে ধেয়ে এল। সাংবাদিকদের হাতে প্রস্তাবের কপি বিলি করার কাজ আমি চালাচ্ছিলাম, আর আমার উপর চলছিল কিল-চড়-ঘুষি-লাথি।



লেখক ও সাংবাদিকদের উপর চলছিল কিল-চড়-ঘুষি।

আমন্ত্রণ করে ডেকে আনার পর জ্যোতিষীদের এমন গুণ্ডামি দেখে হতচকিত সাংবাদিকরাও। প্রতিবাদ করেন 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকার সাংবাদিক অভিজিৎ দাশগুপ্ত। তাঁকে সমর্থন করেন 'আজকাল' ও 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সাংবাদিকরা। ফলে জ্যোতিষী-পোষা চামচাদের হাতে বেধড়ক মার খেলেন সাংবাদিক অভিজিৎ দাশগুপ্ত ও 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সাংবাদিক রবীন রায়। ওই এলাকার তরুণরা জ্যোতিষীদের এ-হেন বাঁদরামো দেখে প্রতিরোধে নামলেন। লোহার রডের আঘাতে আহত হলেন স্থানীয় তরুণ তপু দেবনাথ। পুলিশরা নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে জ্যোতিষীদের বেআইনি ব্যবসা ও বেআইনি গুণ্ডামি, দুটোকেই জোরালো সমর্থন জানাল।

ঘটনাস্থল মানিকতলা থানার অধীন। অভিজিৎ, তপু ও আমি জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে বেআইনি মারধর, হত্যার চেষ্টা, অশ্লীল গালাগাল ও লুটপাটের লিখিত অভিযোগ আনি। থানার অফিসার অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এরপর অভিজিৎ ও আমি পুলিশ কমিশনারকে ফোনে ঘটনাটি জানাই। পুলিশ কমিশনার জানান অপরাধীদের অবশ্যই গ্রেপ্তার করা হবে।

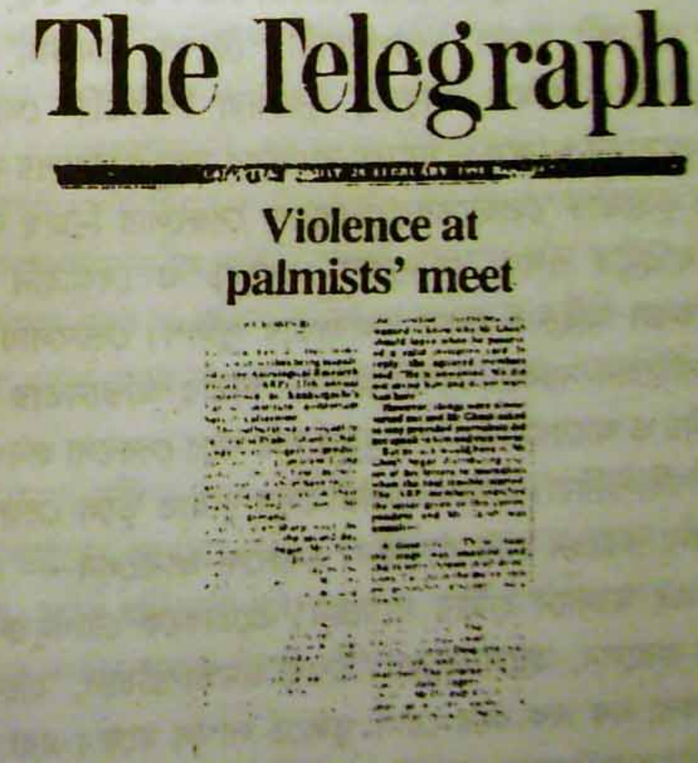

সান্ধ্য আজকাল

১৫ ফাল্গুন ১৪০০ | শনিবার ২৮ জানুয়ারি ১৯৯৪ | ২০ পয়সা

কাঁকুড়গাছিতে মারদাঙ্গাকারী জ্যোতিষীর খোঁজে পুলিস

তারপর অনেক তোলপাড়। জ্যোতিষীদের ব্যবসাটাই যখন বেআইনি তখন তাদের সম্মেলনের জন্য সরকারি প্রেক্ষাগৃহ দেওয়া হয় কী করে? কী করেই বা এমন বেআইনি কাজ পরম নিশ্চিন্তে, অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য পুলিশ সুরক্ষা দেন? বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদপত্র পাঠালাম মুখ্যমন্ত্রীসহ প্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচিত ব্যক্তিদের কাছে। প্রতিবাদের মূল বিষয় — (১) জ্যোতিষীদের কোনো সম্মেলনের জন্য সরকারি প্রেক্ষাগৃহ দেওয়া চলবে না। (২) দ্য ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট-এর প্রয়োগ কঠোরভাবে করতে হবে।

একাধিক পত্রিকায় প্রহাররত জ্যোতিষী গুণ্ডাদের ঝকঝকে ছবি প্রকাশিত হয়েছিল, তারপরও একজন অপরাধীও গ্রেফতার হননি। শক্ত খুঁটির জোরেই হননি। পুলিশ কমিশনারের আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল।


The Telegraph

Violence at palmists' meet

কর্ণাটকে জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সোজা। কারণ জ্যোতিষীরা ওই প্রদেশে শিকড় গাড়তে পারেনি। সেখানেও যদি এই বাংলার মতো হত — বিচারকরা মঞ্চে বসে সম্মেলনের শোভা বাড়াতেন, মন্ত্রীরা শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়ে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করতেন, তবে ব্যাপারটা বেআইনি জানার পরও কর্ণাটকের পুলিশকর্তাদের আইনি ব্যবস্থা নিতে পা কাঁপত।

'৯২-এর ১৫ অক্টোবরের সন্ধ্যায় কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দানে বসেছিল এক আজব প্রার্থনাসভা। সর্বরোগহর প্রার্থনাসভা। আমেরিকা থেকে উড়ে আসা 'ফেইথ হিলার' পাদ্রি সাহেব মরিস সেরুলো নাকি একটি অলৌকিক সন্ধ্যা কলকাতাকে উপহার দেবেন। সেই সন্ধ্যায় তাঁর প্রার্থনাসভায় হাজির প্রতিটি রোগীর রোগমুক্তি ঘটাবে। ১৩, ১৪, ১৫ অক্টোবর কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি পত্রিকায় যথাক্রমে সিকি পাতা, আধ পাতা ও এক পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে পাদ্রি সেরুলো তেমনটাই দাবি করেছিলেন। সেই সন্ধ্যার সাক্ষী ছিলেন হাজার চল্লিশ মানুষ। এদের শতকরা চল্লিশ ভাগই অন্ধ, মূক, বধির, খঞ্জ, মানসিক প্রতিবন্ধী অথবা মৃত্যুপথযাত্রী। টেম্পো, মোটর, বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া শিলিগুড়ি থেকেও মুমূর্ষু রোগীদের নিয়ে এসেছেন অনেকে। সেরুলো সাহেবের সভা-কন্ট্রোলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল দু-হাজার 'স্বেচ্ছাসেবক', একশো সেরুলোর নিজস্ব বডিগার্ড ও বিশাল পুলিশ বাহিনীর ওপর। সেরুলোর অদ্ভুতুড়ে ও বেআইনি দাবি ভরা লিফলেট বিলি করল আইনের রক্ষক কলকাতার পুলিশ। সেরুলোর সঙ্গে মঞ্চ আলো করে বসেছিলেন সরকারি পদাধিকারীরা। যাত্রার অভিনেতার মতো চড়া সুরের অতিনাটকীয় ও আবেগমথিত কিছু মুহূর্ত সৃষ্টি করে সেরুলো জনগণের মধ্যে তৈরি করলেন গণহিস্টিরিয়া। হাজার হাজার মানুষ দু-হাত তুলে সেরুলোর সুরে সুর মিলিয়ে প্রার্থনা করছেন আর কাঁদছেন। সেরুলো জানালেন — এই মুহূর্তে ঈশ্বরের দূতেরা এই ময়দানে হাজির রয়েছেন। প্রত্যেককে রোগমুক্ত করছেন। সেরুলো চিৎকার করলেন, 'হালে লুইয়া'। উন্মত্ত জনতা চেঁচাল, 'হালে লুইয়া'। এবার স্বেচ্ছাসেবকরা এক এক করে রোগী তুলতে লাগল মঞ্চে। এরা প্রত্যেকেই সদ্য রোগমুক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। সেদিন এই লেখক তামাম আমজনতা ও সাংবাদিকদের সামনে প্রমাণ করে দিলেন — মঞ্চের ওরা প্রত্যেকেই সাজানো রোগী। অর্থাৎ এতক্ষণ যা হয়েছে, তা সবই ভয়ংকর এক

নিষ্ঠুর খেলা। বিপন্ন মুমূর্ষু রোগীদের নিয়ে অমানবিক খেলা।

ক্ষুব্ধ সাংবাদিক ও ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে বাঁচতে পুলিশ সেরুলো ও তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের নিয়ে গেল লালবাজারে। তারপর এই লেখকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হল সেরুলোর দুই সঙ্গীকে। এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আগেই করেছি। আর সেরুলো? উনি আমেরিকার পূজ্য নাগরিক তো, তাই ওঁকে গ্রেফতার না করে ভারত থেকে বহিষ্কার করা হল। ভয়ংকর প্রতারণা করেও কি নিশ্চিন্তে পার পেয়ে গেলেন। আমেরিকার রাষ্ট্রশক্তি যেখানে সেরুলোর পৃষ্ঠপোষক, সেখানে ভারত নামক রাষ্ট্রের সাধ্য কি — ভয়ংকর অপরাধের বিরুদ্ধে কণামাত্র শাস্তি দেয়!

বাংলাদেশের পীর হুজুর সাঈদাবাদী বেশ কয়েক বছর ধরেই শহর কলকাতায় আসছিলেন। তাঁর আগমন উপলক্ষে কলকাতার কিছু কিছু পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত। বিজ্ঞাপনের মূল আকর্ষণ — অলৌকিক উপায়ে সন্তানহীন রমণীদের মাতৃত্বদান। হুজুর সাঈদাবাদীর বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী সমিতির তরফ থেকে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। তাতে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলাম — হুজুরের এই বিজ্ঞাপন দেওয়া স্পষ্টতই 'ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশ্যনাবল অ্যাডভার-টাইজ্‌মেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪' অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ। এই মিথ্যা ও বিজ্ঞাপন দিয়ে হুজুর জনগণকে প্রতারণা করছে। হুজুরের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। হুজুরের বুজরুকি ফাঁসের খবর ও পুলিশ কমিশনারের কাছে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন জানাবার খবর কলকাতার দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হল। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

এই অনুরোধ রক্ষিত হতে একাধিক বছর গড়াল। একজন উদ্যোগী ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের প্রচেষ্টায় যদিও বা হুজুর গ্রেফতার হলেন, কিন্তু আবার সেই একই নাটক। হুজুর প্রতিবেশী বাংলাদেশের পূজ্য নাগরিক তো, তাই এদেশ থেকে বহিষ্কার করে কর্তব্য সমাধা করল পুলিশ ও প্রশাসন।

৯ জুন'৯৭ মাছ খাইয়ে হাঁপানি সারাবার দৈব ওষুধের কারবারীদের কলকাতায় গ্রেফতারের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ঠিক এক মাসের মাথায় অর্থাৎ ৯ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকার ১১ পৃষ্ঠায় হাঁপানি সারাবার দৈব ওষুধের

কর্ণাটকে জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সোজা। কারণ জ্যোতিষীরা ওই প্রদেশে শিকড় গাড়তে পারেনি। সেখানেও যদি এই বাংলার মতো হত — বিচারকরা মঞ্চে বসে সম্মেলনের শোভা বাড়াতেন, মন্ত্রীরা শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়ে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করতেন, তবে ব্যাপারটা বেআইনি জানার পরও কর্ণাটকের পুলিশকর্তাদের আইনি ব্যবস্থা নিতে পা কাঁপত।

'৯২-এর ১৫ অক্টোবরের সন্ধ্যায় কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দানে বসেছিল এক আজব প্রার্থনাসভা। সর্বরোগহর প্রার্থনাসভা। আমেরিকা থেকে উড়ে আসা 'ফেইথ হিলার' পাদ্রি সাহেব মরিস সেরুলো নাকি একটি অলৌকিক সন্ধ্যা কলকাতাকে উপহার দেবেন। সেই সন্ধ্যায় তাঁর প্রার্থনাসভায় হাজির প্রতিটি রোগীর রোগমুক্তি ঘটাবে। ১৩, ১৪, ১৫ অক্টোবর কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি পত্রিকায় যথাক্রমে সিকি পাতা, আধ পাতা ও এক পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে পাদ্রি সেরুলো তেমনটাই দাবি করেছিলেন। সেই সন্ধ্যার সাক্ষী ছিলেন হাজার চল্লিশ মানুষ। এদের শতকরা চল্লিশ ভাগই অন্ধ, মূক, বধির, খঞ্জ, মানসিক প্রতিবন্ধী অথবা মৃত্যুপথযাত্রী। টেম্পো, মোটর, বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া শিলিগুড়ি থেকেও মুমূর্ষু রোগীদের নিয়ে এসেছেন অনেকে। সেরুলো সাহেবের সভা-কন্ট্রোলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল দু-হাজার 'স্বেচ্ছাসেবক', একশো সেরুলোর নিজস্ব বডিগার্ড ও বিশাল পুলিশ বাহিনীর ওপর। সেরুলোর অদ্ভুতুড়ে ও বেআইনি দাবি ভরা লিফলেট বিলি করল আইনের রক্ষক কলকাতার পুলিশ। সেরুলোর সঙ্গে মঞ্চ আলো করে বসেছিলেন সরকারি পদাধিকারীরা। যাত্রার অভিনেতার মতো চড়া সুরের অতিনাটকীয় ও আবেগমথিত কিছু মুহূর্ত সৃষ্টি করে সেরুলো জনগণের মধ্যে তৈরি করলেন গণহিস্টিরিয়া। হাজার হাজার মানুষ দু-হাত তুলে সেরুলোর সুরে সুর মিলিয়ে প্রার্থনা করছেন আর কাঁদছেন। সেরুলো জানালেন — এই মুহূর্তে ঈশ্বরের দূতেরা এই ময়দানে হাজির রয়েছেন। প্রত্যেককে রোগমুক্ত করছেন। সেরুলো চিৎকার করলেন, 'হালে লুইয়া'। উন্মত্ত জনতা চেঁচাল, 'হালে লুইয়া'। এবার স্বেচ্ছাসেবকরা এক এক করে রোগী তুলতে লাগল মঞ্চে। এরা প্রত্যেকেই সদ্য রোগমুক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। সেদিন এই লেখক তামাম আমজনতা ও সাংবাদিকদের সামনে প্রমাণ করে দিলেন — মঞ্চের ওরা প্রত্যেকেই সাজানো রোগী। অর্থাৎ এতক্ষণ যা হয়েছে, তা সবই ভয়ংকর এক

নিষ্ঠুর খেলা। বিপন্ন মুমূর্ষু রোগীদের নিয়ে অমানবিক খেলা।

ক্ষুব্ধ সাংবাদিক ও ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে বাঁচতে পুলিশ সেরুলো ও তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের নিয়ে গেল লালবাজারে। তারপর এই লেখকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হল সেরুলোর দুই সঙ্গীকে। এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আগেই করেছি। আর সেরুলো? উনি আমেরিকার পূজ্য নাগরিক তো, তাই ওঁকে গ্রেফতার না করে ভারত থেকে বহিষ্কার করা হল। ভয়ংকর প্রতারণা করেও কি নিশ্চিন্তে পার পেয়ে গেলেন। আমেরিকার রাষ্ট্রশক্তি যেখানে সেরুলোর পৃষ্ঠপোষক, সেখানে ভারত নামক রাষ্ট্রের সাধ্য কি — ভয়ংকর অপরাধের বিরুদ্ধে কণামাত্র শাস্তি দেয়!

বাংলাদেশের পীর হুজুর সাঈদাবাদী বেশ কয়েক বছর ধরেই শহর কলকাতায় আসছিলেন। তাঁর আগমন উপলক্ষে কলকাতার কিছু কিছু পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত। বিজ্ঞাপনের মূল আকর্ষণ — অলৌকিক উপায়ে সন্তানহীন রমণীদের মাতৃত্বদান। হুজুর সাঈদাবাদীর বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী সমিতির তরফ থেকে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। তাতে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলাম — হুজুরের এই বিজ্ঞাপন দেওয়া স্পষ্টতই 'ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশ্যানাবল অ্যাডভার-টাইজ্‌মেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪' অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ। এই মিথ্যা ও বিজ্ঞাপন দিয়ে হুজুর জনগণকে প্রতারণা করছে। হুজুরের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। হুজুরের বুজরুকি ফাঁসের খবর ও পুলিশ কমিশনারের কাছে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন জানাবার খবর কলকাতার দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হল। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

এই অনুরোধ রক্ষিত হতে একাধিক বছর গড়াল। একজন উদ্যোগী ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের প্রচেষ্টায় যদিও বা হুজুর গ্রেফতার হলেন, কিন্তু আবার সেই একই নাটক। হুজুর প্রতিবেশী বাংলাদেশের পূজ্য নাগরিক তো, তাই এদেশ থেকে বহিষ্কার করে কর্তব্য সমাধা করল পুলিশ ও প্রশাসন।

৯ জুন'৯৭ মাছ খাইয়ে হাঁপানি সারাবার দৈব ওষুধের কারবারীদের কলকাতায় গ্রেফতারের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ঠিক এক মাসের মাথায় অর্থাৎ ৯ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকার ১১ পৃষ্ঠায় হাঁপানি সারাবার দৈব ওষুধের

কারবারীদের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল — পরের দিন থেকে 'হোটেল কাপুর কটেজ'এ বসবেন। এই বিজ্ঞাপন দেখে কিছু বিজ্ঞান ক্লাব শিয়ালদহ চত্বরে সভা করে দৈব কারবারিদের গ্রেফতারের দাবি জানাল। না, এবার আর দৈব কারবারিরা গ্রেফতার হয়নি। তারা বহাল তবিয়তেই কর্ণাটকে ফিরে গেছে। সৎ বলে পরিচিত এক ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ সক্রিয় হওয়ায় এইটুকু হয়েছে যে, বুজরুকরা কলকাতার বুকে বুজরুকি না চালিয়েই ফিরে গেছে। এখানেও সেই গ্রেপ্তারের বদলে বহিষ্কারের মতো ব্যাপার। কারণ এরাও কর্ণাটকের প্রভাবশালী ব্যক্তি তো!

৯ জুন '৯৭-এর কলকাতার দৈনিক পত্রিকাগুলোতে জ্যান্ত মাছ খাইয়ে হাঁপানি সারাবার দৈব ওষুধের কারবারিদের গ্রেফতার হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। ওই দিনই নয়া দিল্লি থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'দ্য পাইয়োনিয়র'-এর সাংবাদিক আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং এই প্রসঙ্গে আমার মতামত জানতে চান। ১১ জুন ওই পত্রিকায় অতি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল আমার সঙ্গে পত্রিকা প্রতিনিধির কথোপকথন। এই মুহূর্তে ছাপা কথাগুলো মনে পড়ছে :

"It is great that these quacks have been arrested. But let me tell you something. They will be released, too. These people have high connections. I find it rather strange that such quacks and godmen who advertise and perform stants regularly in Calcutta are never arrested. Only when people come from outside the city do these arrests take place. That is significant." অর্থাৎ মোদ্দা কথায় — বুজরুকদের ধরা হয়েছে, নিশ্চয়ই বড় খবর। কিন্তু এও বলছি, ওরা ছাড়া পেয়ে যাবে। কারণ ওদের ভাল যোগাযোগ আছে। মজা কি জানেন কলকাতায় বুজরুক অলৌকিক ক্ষমতাধররা বিজ্ঞাপন দিয়ে লাগাতারভাবে বুজরুকি চালিয়ে যাচ্ছে। এদের কোনও দিনই গ্রেপ্তার করা হয় না। যখন বাইরে থেকে কেউ এসে বুজরুকি করতে যায়, তখন গ্রেপ্তার হয়। এটা খুবই লক্ষণীয়।

আমার বক্তব্য আরও সিগনিফিকেন্ট হয়ে ওঠে, যখন দেখি আমার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো একশোভাগ সত্যি হয়ে উঠেছে। এই 'সত্যি হয়ে ওঠা' আমাকে আদৌ আনন্দিত করে না। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বর্ষপূর্তিতে ভারতীয় গণতন্ত্রের গর্ভ থেকে উঠে আসা এমন চরম দৃষ্টান্ত আমাকে ব্যথিত করে।

বাইরের থেকে কলকাতায় এসে যখনই কোনো বিশ্বাসে অসুখ সারাবার কারবারিরা গ্রেফতার হয়েছে তখন দুটি জিনিস লক্ষ্য করেছে — এক : কলকাতায়

ওই বুজরুকদের গ্রেফতারের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে বা ওদের বুজরুকির রহস্যভেদ কাহিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে আলোড়ন তুলেছে। দুই : ভিন দেশ বা ভিন রাজ্যের প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত ওদের বিরুদ্ধে কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়নি।

এগারো বছর আগে বিদেশী অলৌকিক চিকিৎসক ফলিপিনো কেইথ হিলার রোমিও পি. গ্যালার্ডো-এর বুজরুকি ফাঁস করতে গিয়ে যে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের শুরু, তা আজও একই নিয়ম ও ছন্দে চলমান। গ্যালার্ডোর খালি হাতে ব্যথাহীন অস্ত্রোপচার ও রোগমুক্তির বুজরুকি ফাঁস হয়েছে সে সময়কার জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ সুবিমল দাশগুপ্ত হাজির ছিলেন। গ্রেপ্তার করতে আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু পারেন নি। গ্যালার্ডোর ত্রাণকর্তার ভূমিকায় কলকাতা পুলিশেরই উঁচু তলার কেউ কেউ সক্রিয় ছিলেন। এমন এক ভয়ংকর সময় আমাদের তাড়া করে ফিরেছিল যে, চম্বল দস্যুদের নিয়ে দীর্ঘ-দিন কাজ করা চিত্র সাংবাদিক সৌগত রায় বর্মন বলেছিলেন — চম্বলের দস্যুদের ভয়াবহতাও এদের কাছে জোলো। আজও আইনের রক্ষকরাই আইনভঙ্গকারীদের অন্যতম প্রধান রক্ষাকারী।

কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বুজরুকরা প্রতিদিন যেভাবে ম্যাজিক রেমেডিজ অ্যাক্ট ভঙ্গ করে, তার কাছে ভিন দেশ ও ভিন রাজ্যের বুজরুকরা নেহাতই শিশু। স্থানীয় বুজরুকদের বিরুদ্ধে যতই আন্দোলন হোক, এদের প্রতারণা যতই প্রমাণিত ও প্রকাশিত হোক, তাতে পুলিশ-প্রশাসনের কুম্ভকর্ণীয় ঘুম একটুও ব্যাহত হয় না। বরং ওদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হলে পুলিশদের আয় বাড়ে প্রায় ক্ষেত্রেই।

এই তো গত বছর জুলাইয়ের ঘটনা। আমরা গেলাম উত্তর চব্বিশ পরগনার গোবরডাঙায়। ওখানকার এক মনসা মন্দিরে এক প্রবীণ পুরুষের ওপর নাকি মনসার ভর হয়। ভরে বিষহরী মনসা নাকি সর্বরোগ ও সমস্যা সমাধানের অব্যর্থ উপায় বাৎলান। আমরা গেলাম। ভরের অভিনয় করা মানুষটি যে আসলে তার মাইনে করা ইনফরমারদের কাছ থেকে জানা খবরকে সম্বল করে লোক ঠকায়, এটা প্রকাশ্যে ফাঁস করে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে গেলাম। আমাদের অভিযোগ লেখা শেষ হওয়ার আগেই বাবা-মনসার ছেলে গাড়ি বোঝাই স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা নিয়ে হাজির। পরিণতিতে আইন রইল আইনের বইতেই বন্দি।

হাওড়ার ডোমজুড় থানার ভাণ্ডারদহ গ্রামের এক গোরাবাবা দস্তুরমত লিফলেট

ছেপে ঢালাও বিলি করে হেঁকে-ডেকে প্রচার করছিল — পগলা কুকুর বা পাগলা শেয়াল কামড়ালে মন্ত্র পড়া ড়াবের জল খাইয়ে তাদের বিপদমুক্ত করে। এমন ভয়ঙ্কর আইন ভাঙার বিরুদ্ধে পুলিশ কী করেছে? স্রেফ কিচ্ছু না। তাঁদের নীরবতার পক্ষে একটাই যুক্তি থাকতে পারে — তাঁরা ব্যাপারটা জানতেনই না। ইতিপূর্বে কেউ এ-বিষয়ে তাঁদের জানাননি। কিন্তু এই 'সবেধন নীলমণি' যুক্তিও খাটে না। কারণ আমরা '৯৬-এর জুলাইতে ডোমজুড় থানায় লিফলেটের কপিসহ গোরাবাবার বহুতর প্রতারণা ও গ্রামবাসীদের উপর গত ২০ বছর ধরে ভয়ঙ্কর অত্যাচার চালাবার ঘটনার কথা জানিয়েছিলাম। আমরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। অভিযোগ দায়ের করেছি কলকাতার তথ্য কেন্দ্রে খোলা অভিযোগ কেন্দ্রে। শ-দুয়েক স্থানীয় অধিবাসী ও তথ্যদপ্তরে গোরাবাবার বেআইনি কাজ-কর্ম ও অত্যাচারের তালিকা পেশ করেছেন। তাঁরা অভিযোগপত্রে এ-ও জানিয়েছেন, পুলিশ ও রাজনৈতিক দলের কাছে গত কুড়ি বছর ধরে বারবার জানিয়েও কোনো বিচার পাননি। বরং পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় গোরাবাবার অত্যাচারের পরিমাণ বেড়েই চলছে। অভিযোগ জানাবার বদলা হিসেবে গোরাবাবা তলোয়ার দিয়ে কারো আঙুল উড়িয়েছে, কারো গায়ে ঢেলেছে অ্যাসিড — এই কথাও স্থানীয় মানুষরা রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। এই গ্রামবাসীদের প্রায় সকলেই গরিব ও তপশিলভুক্ত। এইসব অভিযোগ জানাবার পর ফল পাওয়া গেছে। পুলিশ গ্রামে ঢুকে গ্রামবাসীদের শাসিয়েছে। এই শাসানির কথা জানিয়ে গ্রামবাসীরা আবার তথ্যকেন্দ্রে অভিযোগ জমা দিয়েছে। পরিণতি এই — পুলিশ কিছু গ্রামবাসীদের ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে ডাকাতির মামলা দায়ের করেছে।

বিচিত্র এই পুলিশদের চরিত্রের মূল স্রোত। ভালোরা ব্যতিক্রম। টাকার বিনিময়ে মিথ্যে মামলা সাজাতে ও সত্যি মামলা গুটোতে ওরা ওস্তাদ। আইনের এই রক্ষকদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক যত রকম অপরাধীদের। থানায় ওদের নিত্য আনাগোনা। বিদ্য-জনেরা প্রাত্য এখানে। '৯৮-এর জানুয়ারির একটি ঘটনা। আমি যে এলাকায় থাকি সে এলাকার থানার অফিসার ইনচার্য জানালেন — আমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এসেছে। প্রতারণার অভিযোগ। আমি যেন থানায় আসি। তারপরই থানা অফিসারের পরিচয়ে একজন যোগাযোগ করে জানালেন — আমাকে এ-বিষয়ে সাহায্য করতে চান। বিনিময়ে দিতে হবে টাকা। কোথায়, কবে, কত দিতে হবে পরে সব জানাবেন। এই বিষয়টি জানালাম রাজ্য গোয়েন্দা

দপ্তরকে, আমার জেলার এস. পি-কে। একজন সাংসদকে। তারপরও ওই ব্যক্তি আবারও যোগাযোগ করেছেন এবং ওর সাহায্য না নিতে চাওয়ায় হুমকি দিয়েছেন— আমাকে ও ছেলেকে হত্যা করার। আমাকে বলেছেন — 'গাঁটে ভাণ্ডা দিয়ে পেটাব রাস্তার মাঝখানে, কোনও বাবা তোমাকে বাঁচাতে আসবে না'— 'তোমার দেবীনিবাসে গিয়ে শালা মারতে মারতে মারতে শালা ওখানে ফেলে রেখে দেব।'

টাকা দিয়ে রফা না করে আইন আইনের পথে চলুক — এইটুকু একজন নাগরিক হিসেবে দাবি করায় এই গালাগাল আমার জুটেছে। সাধ্যমত উর্ধতন বিভিন্ন মহলকে বিষয়টি জানিয়েছি। ফল এখনও অজানা। 'সৎভাবে আর আন্দোলন করা যায় না'— এই ভেবে লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরে যেতে রাজি নই। আমার আন্দোলনের প্রেরণা প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ও লক্ষ লক্ষ মানুষ। জানি তাঁরাই একদিন কোটি কোটি হয়ে শেষ কথা বলবেন।

প্রদীপ আগরওয়াল বড়বাজার নিবাসী বড় মাপের এক ফেইথ হিলার। বছর কয়েক আগে সম্মোহন শেখাবার আসর বসিয়েছিল কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে। বিজ্ঞাপন দিয়ে শিক্ষার্থী টেনেছিল। শেখার দক্ষিণা প্রায় দু-হাজার টাকা। প্রদীপের দাবিমতো যে কোনো রোগ ওষুধ ছাড়া সম্মোহনের সাহায্যে সারানো যায়। বাড়তি দাবি ছিল — সম্মোহনের সাহায্যে নাকি আত্মা বা মনকে বিচ্ছিন্ন করে যে কোনো ডায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। নিয়ে যাওয়া যায় পূর্বজন্মেও। ইংরেজি দৈনিক 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার তরফ থেকে আমি গিয়েছিলাম প্রদীপের দাবি ও বাস্তবের মধ্যে দূরত্ব মাপতে। সঙ্গী ছিলেন ওই পত্রিকার এক সাংবাদিক ও চিত্র-সাংবাদিক। পত্রিকাটিতে প্রদীপের বুজরুকি ফাঁসের কাহিনী ছবিসহ সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছিল। সেইসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল পুলিশ কমিশনারের প্রতি আমার আবেদন। আবেদন ছিল, প্রদীপের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার। এরও পরে যুক্তিবাদী সমিতির প্যাডে পুলিশ কমিশনারকে প্রদীপের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছিলাম। এ-সবই বিস্তৃতভাবে আগেই আলোচনা করেছি। কিন্তু যে কথা বলা হয়নি, তা হল— আজ যুক্তিবাদীদের চ্যালেঞ্জাররা আর শুধু অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদাররা নয়, চ্যালেঞ্জার পুলিশ-প্রশাসন-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জগতের বুজরুকরা। সর্বগ্রাসী দুর্নীতির কারণে প্রদীপের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। পরন্তু আমার কাছে একাধিক ফোন

এসেছে — বাধা দিয়ে প্রদীপ আগরওয়ালের কিছুই করতে পারবেন না, বরং সহযোগিতা করুন, আপনার লাভের দিকটা আমরা দেখব। দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানর ফলে শুনতে হচ্ছে অপরাধীর হুমকি! স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে এ-এক পরম-প্রাপ্তি!

একটি জনপ্রিয় মহিলা পাক্ষিক পত্রিকায় এবছর মার্চের দ্বিতীয় পক্ষে 'রেইকি' চিকিৎসা নিয়ে প্রকাশিত হল প্রচ্ছদ কাহিনী। 'রেইকি' চিকিৎসা কি? ওষুধ বা অস্ত্রোপচার ছাড়া শুধু স্পর্শ দিয়ে যে কোনো ব্যাধি নিরাময়ের নতুন আশ্চর্য চিকিৎসা পদ্ধতি। তারপরই মাস ঘোরার আগে পত্রিকায় দস্তুরমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে 'রেইকি' চিকিৎসা শেখাবার আসর বসালেন প্রদীপ আগরওয়াল। দক্ষিণা মাত্র দু-হাজার টাকার কিঞ্চিৎ বেশি। আমি ফোনে কথা বলেছি। জানিয়েছি, আমার মায়ের ক্যানসার। প্রদীপ মাকে আনতে বলেছেন এবং রোগ মুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন। গোটা বিষয়টি লালবাজারের নজরে এনেছি। কিন্তু প্রদীপের কিছুই হয়নি। এখনও প্রদীপ কলকাতার বড়বাজারে বসে জোর কদমে বেআইনি বিজ্ঞাপন দিয়ে কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন।

জমিয়ে বসা বড়-মেজ মাপের প্রত্যেক অলৌকিক ব্যাবসায়ীরাই বর্তমানে পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় পালিত ও পুষ্ট হচ্ছে। বিগত দৈনিক পত্রিকাগুলোতে চোখ বুলিয়ে আমার এমন ধারণাই দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে। আগন্তুক অলৌকিক ব্যবসায়ীদের চেয়ে শতগুণ ভয়ঙ্করভাবে আইন ভেঙেই চলেছে স্থানীয় অলৌকিক ব্যবসায়ীরা। আইনকে তোয়াক্কা না করেও তারা প্রবলভাবে আছে এবং দিব্বি পুষ্ট হচ্ছে শাঁসেজলে। নিত্য-দিন প্রকাশিত এমনই বেআইনি বিজ্ঞাপনের দু-একটি নমুনা : —

শ্রীগৌতম। জ্যোতিষী এবং 'তারাপীঠ ও কামাক্ষায় সিদ্ধহস্ত'। বিশেষ ক্ষমতা— ব্যর্থপ্রেম জোড়া দিতে পারেন, ভাড়াটে তুলতে পারেন। মামলা জেতাতে পারেন। (ও-ফ্; চার্লস শোভরাজ যদি আগে জানতে পারতেন! চন্দ্রস্বামী ও সজল বারুইরা যোগাযোগ করতে পারেন! উকিলবাবুরা সব কেস তুড়ি দিয়ে জেতার জন্য ট্রাই করতে পারেন। কিন্তু বাদি ও বিবাদি উভয়পক্ষই শ্রীগৌতমের সাহায্য নিলে ব্যাপারটা কী হবে?)। শত্রু দমন করতে পারেন (ইস; সাদ্দাম হোসেনের খবরটা জানা থাকলে বুশ দমন করতে পারতেন পরম অবহেলে)। যৌনব্যাধি সহ যে কোনো রোগ সারাতে অব্যর্থ (মাননীয় স্বাস্থমন্ত্রী — শ্রীগৌতমের এই মহান

ক্ষমতাকে দেশের কাজে লাগানোর বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করুন। অথবা যদি মনে করে থাকেন, এইসব শ্রীগৌতমের প্রতারণা, তবে মাননীয় মন্ত্রী যথাযোগ্য আইনি ব্যবস্থা নিন)। শ্রীগৌতম বিজ্ঞাপন দিয়ে এইসব হিজিবিজি দাবি জানিয়ে তার ব্যবসাটা চালিয়ে যাচ্ছেন কলকাতার বুকে বসে। ঠিকানা — ১২৩ এস পি মুখার্জি রোড, কলকাতা - ২৬।

ড. রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী। ভৌতিক উপদ্রব বন্ধে বিশেষজ্ঞ। দাম্পত্য কলহ মেটাতে, প্রেমে শান্তি আনতে, চাকরি দিতে (বেকাররা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন এমনকী বেকার সমস্যা মেটাতে সরকার নথিভুক্ত বেকারদের তালিকা রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী কাছে পাঠিয়ে দেশের বেকার সমস্যার আশু সমাধানের আন্তরিক চেষ্টা করতে পারে। আর যদি এই দাবিকে নেহাতই প্রতারণা বলে মনে করে থাকে, তবে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নিক)। ড. শাস্ত্রী বশীকরণ বিশারদ। 'সানন্দা' পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, খরচ পড়ে নামমাত্র। দেড় হাজার থেকে তিন হাজার টাকা (একজন সুপার স্টার হিরোইনকে বউ করার পক্ষে ড্যাম চিপ)। শাস্ত্রীজি এইসব অদ্ভুতুড়ে দাবি গোপনে শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া গ্রামবাসীদের কাছে করেন না। তিনি এইসব বেআইনি দাবি কলকাতার নামা-দামী পত্রিকাগুলোতে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করে চলেছেন। কলকাতার বুকেই তাঁর কর্মস্থল। ঠিকানা — ৭০, কৈলাস বোস স্ট্রিট, কলকাতা - ৬।

ড. মনসারাম। ভাগ্য পাল্টাতে কবচ দেন। মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ ধারণে যে কোনো ব্যাধির নিরাময় নিশ্চিত। এছাড়া অপুত্রকের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন। বৃহৎ বগলামুখী কবচ ধারণে শত্রু বশীভূত হয়। এমন বিজ্ঞাপন বছরের পর বছর পত্র-পত্রিকায় দিয়ে কবচ বেচে চলেছেন খাস কলকাতার বুকে। ঠিকানা —১২৯, শ্রীঅরবিন্দ সরণি, কলকাতা - ৬।

মণিকার নারায়ণচন্দ্র মান্না। '৭৭ বৎসর সততার সহিত' অত্যাশ্চর্য অষ্টধাতুর মাদুলি বিক্রি করে আসছে বলে বুক বাজিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে তা প্রচার করে। ধারণে মামলায় জয় হয়। আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়। লটারিতে অর্থলাভ হয়। মানসিক রোগ, কুষ্ঠ, শ্বেতী, প্যারালিসিস, হৃদরোগ, মৃগি এবং হাঁপানিসহ যে কোনো দুরারোগ্য আরোগ্য হয় (মাছ খাইয়ে হাঁপানি সারাবার বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য গ্রেফতার করা হলে, মাদুলি পরিয়ে হাঁপানি সারাবার বিজ্ঞাপন দিলে কেন গ্রেফতার করা হবে না)। অত্যাশ্চর্য এই মাদুলির কারবার চলছে সুদূর পল্লিতে নয়, কলকাতার বুকে। ঠিকানা — ৪৩/২, কাশীপুর রোড, কলকাতা ৩৬।

কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন বিভাগের অধীন পাঁচতারা হোটেলগুলোর শপিং প্লেস ভাড়া দেওয়া হয় টেন্ডার ডেকে। কিন্তু এই প্লেসে জ্যোতিষীদের ব্যবসা চালাতে দেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট ঘর আছে। এই ঘর শুধু জ্যোতিষ ব্যবসার জন্যই। টেণ্ডার ডেকে বা নিলামে চড়িয়ে সর্বোচ্চ দর দেওয়া জ্যোতিষীর হাতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়।

ভারত সরকারের অধীন বেতার ও দূরদর্শনে জ্যোতিষীদের ঢালাও বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। এক কলকাতাবাসী অমৃতলাল তো দূরদর্শনে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাচ্ছেন — তার জ্যোতিষ সংস্থার দেওয়া সার্টিফিকেট নিয়ে নাকি ভারতের যে কোনো জায়গায় জ্যোতিষ ব্যবসা চালাতে পারবে। হায়দ্রাবাদে গিয়েও কি ওই সার্টিফিকেটের জোরে জ্যোতিষ ব্যবসা চালানো যাবে? সীমান্তে চোরকারবারিরা 'চিরকুট' দেখিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ছত্রছায়া পেয়ে থাকে। 'চিরকুট' নগদ দামে কিনতে হয় চোরাকারবারিদের। 'চিরকুট' দেওয়ার অধিকার নাকি নিলাম ডেকে সর্বোচ্চ ডাককারিকে দিয়ে দেয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। বেআইনি জ্যোতিষ ব্যবসা চালাবার জন্য 'সার্টিফিকেট' দেওয়ার অধিকার কি আন্তরাজ্য পুলিশদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ডাকে কিনে নিয়েছেন অমৃতলাল? আর একটি জিজ্ঞাস্য — সরকারই যেখানে বুক বাজিয়ে হেঁকে-ডেকে দুর্নীতি করছে, আইন ভাঙছে, সেখানে সরকারকে শাস্তি দেবে কে? বিচারপতি? এঁরাও এই 'আ কান্ট্রি অব স্ক্যাম'-এর নাগরিক, এই দুর্নীতিপরায়ণ সমাজ কাঠামোর ধারক। এঁদের অনেকেই জ্যোতিষীদের সঙ্গে জ্যোতিষ ব্যবসার পক্ষে প্রচারে নেমে আইন-টাইন ভাঙেন, তারপর এঁদের রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির বাইরে 'ধোয়া তুলসিপাতা' ভাবার তো কোনো কারণ দেখি না।

বছর কয়েক আগে মাঝে-মধ্যে পোস্টে অথবা লেটার বক্সে একটি লিফলেট পেতাম। তাতে মোদ্দা কথায় লেখা থাকত — লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রচার মাহাত্ম্য। সেইসঙ্গে লেখা থাকত — এই লিফলেটে লেখা কথাগুলো একশোটি ছাপিয়ে বা হাতে লিখে বিলি করুন। এক মাসের মধ্যে বিলি করলে আপনি বিপুল সম্পত্তি পাবেন। আর আদেশ অগ্রাহ্য করলে আপনার প্রিয়জন অপঘাতে মারা যাবে। অমুক গ্রামের অমুক লিফলেট পেয়ে আদেশ অমান্য করার পনেরো দিনের মধ্যে তার স্ত্রী ও দুই পুত্র সাপের কামড়ে মারা গেছে।

এখন প্রচারের ব্যাপকতায় 'লোকনাথ ব্রহ্মচারী' একটা ক্রেজ। বাবা

লোকনাথের মাথায় জল ঢালতে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী বাঁক কাঁধে ছুটছে। বাবা লোকনাথের রমরমায় বাবা তারকনাথের বাঁক কাঁধেদের সংখ্যায় কিছুটা ভাটার টান। লোকনাথের জন্মস্থান কচুয়া না চাকলা তা নিয়ে বিস্তর বিবাদ চলছে। 'বিচার আপনা আপনা।' তবে এই সুবাদে কচুয়া আর চাকলার লোকনাথ প্রমোটারদের পোয়া বারো। কয়েক বছরে ২০০ টাকা বিঘা জমির দাম উঠেছে ৭০০০০ টাকা কাঠা। বিজ্ঞাপনের খরচ দিয়ে-থুয়েও লাভের অঙ্ক ফি-বছরই বহু কোটি টাকাতে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। লাভের অঙ্ক যা দাঁড়াক, তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। আমাদের মাথা ব্যথার কারণ — দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এইসব ধূর্ত ব্যবসায়ীরা ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্টকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভয়ঙ্কর মিথ্যে ও বেআইনি বিজ্ঞাপন প্রচার করে চলেছে। শহর কলকাতা থেকে মফস্বল সর্বত্র বিশাল বিশাল হোর্ডিং দাঁড়িয়ে আছে বেআইনি এক বিজ্ঞাপন নিয়ে :—

"রণে, বনে, জঙ্গলে
যখনই বিপদে পড়িবে
আমাকে স্মরণ করিও —
আমি রক্ষা করিব।"

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

এই একই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হচ্ছে পত্রপত্রিকাগুলোতে। কি বেয়াড়া, অবাস্তব, উদ্ভট দাবি একবার ভাবুন তো। সরকার যদি মনে করেন দাবির পিছনে যুক্তি আছে, ভালো। সরকার তার প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় বর্জন করুক। অন্যদেশের দ্বারা আক্রান্ত হলে শ্রীশ্রীলোকনাথ বাবার স্মরণ নিলেই চলবে। আর যদি এই দাবিকে মিথ্যা মনে করে থাকে, তবে কেন প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন বন্ধে আন্তরিক হবে না? সরকার যদি মনে করে — বাস্তবিকই লোকনাথের স্মরণ নিলে যে কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, তবে বেকার সমস্যার বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে কোনও অর্থবহুল পরিকল্পনা গ্রহণের ঝামেলায় না গিয়ে লোকনাথের স্মরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করুক। অর্থ সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা, চিকিৎসা সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা, পানীয় সমস্যা, মাথার গোঁজার ঠাঁই সমস্যা, দুর্নীতি সমস্যা ইত্যাদি বহুতর সমস্যা নিয়ে দেশের গরিবগুর্বো মানুষগুলো যখন চরম বিপদগ্রস্ত, সরকার বিব্রত, তখন সরকার কেন সব বিপদের মুশকিল আসান করতে লোকনাথ

বাবার স্মরণ নিচ্ছে না? বলিহারি লক্ষ-কোটি লোকনাথ বাবার ভক্তদের, যারা বাবার অলৌকিক ক্ষমতার প্রচার করে, অথচ বাবার অলৌকিক ক্ষমতায় একটুও ভরসা করে না! তারা তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে বাবার স্মরণ যে কেন নেয় না, ভেবে অবাক হই! তাহলে তো দেশের সমস্যার অনেকটাই সমাধানের মুখ দেখত।

জাগতিক যাবতীয় বিপদ থেকে উদ্ধার করার মতো কোনো কিছুর অস্তিত্বের কথা বিজ্ঞানীরা আজও জানেন না। (তাত্ত্বিক ভাবেই এমন কোনো কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কারণ হিসেবে একটি মাত্র উদাহরণ আমরা আনছি। ধরুন, রণে দু-পক্ষই লোকনাথের শরণ নিল। লোকনাথ কীভাবে দুপক্ষকেই জয়ী করবেন?) অথচ কত সরল বিশ্বাসী মানুষ ছাপার হরফে বিশ্বাস করে বিভিন্ন বিপদে যা করণীয় ছিল, তা না করে লোকনাথের শরণ নিয়ে প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তে চরম সর্বনাশ ডেকে আনছেন।

এই অবস্থা কি আমরা চলতে দেব নীরব সমর্থন জানিয়ে? নাকি আমরা আন্তরিক দাবি তুলব — সরকার হয় আইনটিকে আইনের মর্যাদা দিক, নতুবা আইনটিকে বাতিল করুক। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে 'ড্রাগস ও ম্যাজিক রেমেডিস আইন'টিকে নপুংসক করে রাখাই হয়তো জাতিকে পুলিশ ও প্রশাসনের কলঙ্কিত উপহার। যে দেশে দুর্নীতি সর্বব্যাপী, যে দেশ ভ্রষ্টাচারে সারা বিশ্বে অগ্রগণ্য, সে দেশে আইন-রক্ষকদের জুতোর ঠোক্করে আইন গড়াগড়ি যাবে, এটাই স্বাভাবিক। আমরা প্রতিবাদে সরব না হলে এই ধরনের নপুংসক আইন ভারতীয় গণতন্ত্র আরও প্রসব করার ধৃষ্টতা দেখাবে।

বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে?

সুধী বুদ্ধিজীবী, প্রশাসক ও পুলিশের কাছে 'ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট'-এর প্রয়োগের পক্ষে আন্তরিতার সঙ্গে দাবি তোলার সমস্যা হিমালয়ের চেয়ে ভারি। এখানে আইন ভঙ্গকারী কারা? 'ম্যাজিক রেমেডি' -র প্রচারক হিসেবে আইন ভঙ্গকারী সরকারি ও বেসরকারি মিডিয়া। কাদের বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে এঁরা সরব হবেন? কাদের হাতে পরাবেন হাতকড়ি? 'সর্বশক্তিমান' মিডিয়ার বিরোধিতার অর্থ — 'সুইসাইডল স্কোয়াড' -এ নাম লেখানো। বুদ্ধিজীবীরা কলমের ডগায় বা ঠোঁটের আগায় যতখানি নীতিবাক্য আওড়ান, ততখানি জীবনে প্রয়োগ

করার মতো আহাম্মকি দেখান না। বরং তাঁরা হত্যে দিয়ে পড়েন রেডিও, টিভি, কাগজে। তাঁদের প্রয়োগ করতে হচ্ছে পাবলিক রিলেশনস ও সেলসম্যানশিপের নানা প্রকরণ। তাঁরা এই সত্যটুকু বুঝে নিয়েছেন — জোনাকিকে নক্ষত্র ও নক্ষত্রকে জোনাকি করার প্রবল ক্ষমতা মিডিয়ার আছে। প্রশাসন ও পুলিশ দিব্বি বুঝে নিয়েছে মিডিয়ার সহযোগিতা বা বিরোধিতা তাদের কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে। সেই মতো পাটিগণিত মেনে বুদ্ধিজীবী, পুলিশ, প্রশাসন ইঁদুর-চোর খেলার প্রহসনে যোগ দেয়। তাই মিডিয়া বা সরকার যখন আইন ভাঙে তখন সমস্যাটা দাঁড়ায় — বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

মলাটবন্দি আইনকে মুক্ত করা খুব সহজ, খুব কঠিন

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির মুখে এসে দেশের নাগরিক হিসেবে আসুন দেখি, পঞ্চাশ বছর আগে ন্যায় বিচারের যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, তা আজ প্রকৃত অর্থে কোথায় দাঁড়িয়ে। 'ন্যায় বিচার' মানে — আইন আছে এবং আইনের সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে। আমরা আপাতত এই বিতর্কে ঢুকছি না যে, এই পুঁজিবাদী দেশে আইনগুলোই শোষকদের স্বার্থে তৈরি হতে বাধ্য কিনা? আমরা আপাতত দেখব, যে আইন আছে তার সঠিক প্রয়োগ কতটা হচ্ছে। আমরা আমজনতা দেখেছি — 'আইন একটা তামাসা মাত্র। বড়লোকেরা পয়সা খরচ করে এই তামাসা দেখিতে পারে।' কিন্তু অর্থের সঙ্গে আইনের এই সম্পর্ক নিয়ে কূটকচালিতেও আমরা নামব না। আমরা সাদা-মাঠা দৃষ্টিতে দেখব, এমন কোনো আইন আছে কি না, প্রবলভাবে অনুপস্থিত যে আইনের প্রয়োগ। আমাদের দেশের এমনই এক (একমাত্র নয়) মলাটবন্দি আইন — 'দ্য ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশন্যাবেল অ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪। আইনটিতে বলা হয়েছে — 'ম্যাজিক রেমেডি' হিসেবে গ্রাহ্য অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তু, মন্ত্র, কবচ বা যে কোনো ধরনের চমক যা অলৌকিক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এমন কোনো কিছুর 'বিজ্ঞাপন প্রচারে যে কোনোরকম অংশগ্রহণ'-এর শাস্তি প্রথমবারে অনধিক ছয় মাস জেল অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই। পরবর্তী প্রতিবারে অনধিক এক বছরের জেল অথবা জরিমানা, অথবা উভয়ই।

অর্থাৎ এই বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য জ্যোতিষী-তান্ত্রিক-বিশ্বাসের কারবারী-অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদাররা যেমন শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী, তেমনই সম

পরিমাণ অপরাধী এই বিজ্ঞাপনের মুদ্রক, প্রকাশক, প্রচারক হিসেবে রেডিও, টিভি, কাগজ ও হোর্ডিং কোম্পানিগুলোও। কোম্পানিগুলো তো আর মানুষ নয় যে জেল খাটবে। জেল খাটবেন আইন ভঙ্গকারী সংস্থার পাবলিশার, প্রিন্টার, ডিরেক্টর ইত্যাদি পদাধিকারী।

জ্যোতিষী, বিশ্বাসের কারবারি, বুজরুকদের বিরুদ্ধে যদিও বা কখনও-সখনও পুলিশ প্রশাসন একটু-আধটু দেখনাই উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু মিডিয়ার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা চিন্তা করার মতো গাড়লি-মুর্খতা একবারের জন্যেও দেখায়নি। অবশ্য এই নীরবতার পিছনে আরও কয়েকটি কারণ জড়িয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন — আইনটির সঙ্গে পুলিশ, প্রশাসন, আইন ভঙ্গকারী ইত্যাদি অনেকের সঙ্গেই হয়তো বা প্রয়োজনীয় পরিচয়ের অভাব ছিল এবং আছে। ফলে সুদীর্ঘ সময় ধরে এই আইনটি লঙ্ঘনের কাজ মসৃণ ও গতিশীল রয়েছে। অথবা আইনটির সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করার বিষয়ে দুর্বলতার হদিশ পেয়ে ধর্মীয় মুখোশ পরে প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে — এক অদ্ভুত অবস্থা! আইন আছে, প্রকাশ্যে আইনের লঙ্ঘন হচ্ছে, অথচ আইনের রক্ষকরা বৃহন্নলার ভূমিকায় অবতীর্ণ। তার মানে এই নয় যে, মিডিয়ার এইসব বেআইনি কাজ-কর্ম বন্ধ করা অসম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে ব্যতিক্রমী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যতিক্রমী পরিকল্পনা গ্রহণ। সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে মলাট বন্দি আইনকে মুক্তি দিতে চাইলে পুলিশ ও প্রশাসনকে যা করতে হবে তার একটা খসড়া প্রস্তাব এখানে পেশ করা হল :—

১) কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাজ্যের পুলিশমন্ত্রীর লেখা নির্দেশ প্রতিটি প্রচার মাধ্যমকে পাঠাতে হবে। তাতে থাকবে :—

(ক) দ্য ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট এর পুরোটাই।

(খ) প্রচার মাধ্যমকে মনে করিয়ে দেওয়া হবে — আপনার উচিত এদেশের আইনকে মর্যাদা দেওয়া।

(গ) প্রচার মাধ্যমগুলোকে জানাতে হবে — আপনার সংস্থা সম্ভবত দ্য ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল ছিল না। ফলে হয়তো অজ্ঞতার কারণে আপনার সংস্থা ইতিপূর্বে এই আইনটি বিভিন্ন সময় লঙ্ঘন করেছে। আইনটি আপনার নজরে আনার পাশাপাশি জানাচ্ছি যে আগামী দিনে আপনার সংস্থা আইনটি লঙ্ঘন করলে সমস্ত রকম আইনি ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হব।

২) জ্যোতিষ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অলঙ্কার ব্যবসায়ীদের একই ধরনের লিখিত নির্দেশ পাঠাতে হবে।

৩) রেডিও, টিভি. পত্রিকার বিজ্ঞাপন দিয়ে জনসাধারণকে আইনটির বিষয়ে জানাতে হবে, লাগাতার প্রচারে সচেতনতাবোধ গড়ে তুলতে হবে।

৪) জেলাশাসক থেকে থানা পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যেককে আইনটি বিষয়ে ও তার প্রয়োগ বিষয়ে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিতে হবে।

এই পদক্ষেপগুলো নেওয়ার পর যারাই এই আইন অমান্য করবে, তাদের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীনভাবে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করতে হবে। আইনটির সপক্ষে জনচেতনা গড়ে তোলার চেষ্টার পাশাপাশি আইন লঙ্ঘনকারীকে আগাম নোটিশ দিয়ে, আইনি ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করলে, মলাটবন্দি আইনকে মুক্ত করা আর অসম্ভব বা কঠিন হবে না। বরং তা হবে একটি খুবই সহজ আইনি প্রক্রিয়া। অবশ্য রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি ভাববাদকে পালন ও পুষ্ট করার পলিসির অঙ্গ হিসেবে আইনটিকে নির্বিষ করে রাখতে চায়, তাহলে ভিন্ন প্রসঙ্গ। তখন রাষ্ট্র ধর্মের দোহাই দেবে, মানুষের বিশ্বাসকে আঘাত না দেওয়ার পক্ষে নানা অজুহাত খাড়া করবে। কিন্তু সে-ও একটা পর্যায় পর্যন্ত। কারণ ভাববাদকে পালন ও পুষ্ট করার আরও অনেক পথ ছেড়ে গণবোধোদয়ের বিরোধিতা করে আইন ভাঙা ভাববাদী গুরুদের স্পনসর করার মতো বোকামি নিশ্চয় করতে যাবে না।

আমাদের সমাবেশিত জনচেতনার সক্রিয় অংশগ্রহণই পারে মলাটবন্দি আইনকে মুক্তি দিতে। কারণ জনগণই শেষ কথা বলে।